কিশোর ক্লাসিক
ওয়াদারিং হাইটস
এমিলি ব্রনটি
সেবা

কিশোর ক্লাসিক

ওয়াদারিং হাইটস

এমিলি ব্রনটি

রূপান্তর:

নিয়াজ মোরশেদ

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা প্রকাশনী

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

ওয়াদারিং হাইটস

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

আঠারোশো এক সালের শীতকালে প্রথম আমি দেখি ওয়াদারিং হাইটসের সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে। এমন লোক আমি জীবনে আর একটিও দেখবো কিনা সন্দেহ। তার স্মৃতি মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমাকে তাড়া ক'রে ফিরবে।

সেবছর ইয়র্কশায়ারের বুনো জনবিরল মুর এলাকায় আমি গিয়েছিলাম কিছুদিন থাকবো বলে। উঠেছিলাম থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জ নামের চমৎকার এক পুরনো বাড়িতে। বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম পত্রালাপের মাধ্যমে, হীথক্লিফ নামক এক লোকের কাছ থেকে। ঐ জনহীন প্রান্তরে আমার একমাত্র প্রতিবেশী ছিলো লোকটা। ওখানে পৌছানোর সপ্তাহখানেকের মাথায় একদিন ভাবলাম, যাই বাড়িঅলার সাথে দেখা ক'রে আসি।

বাড়ি থেকে যখন বেরোলাম তখন বিকেল। আগেই বলেছি সময়টা শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাইরে, ঘন কুয়াশা জমে আছে গাছপালার ওপরে। দূরে দেখতে পাচ্ছি পেনিস্টোন ক্র্যাগস-এর বিবর্ণ চূড়াগুলো। লতাগুল্ম আর ঝোপঝাড়ে ছাওয়া কর্দমাক্ত প্রান্তরের ভেতর দিয়ে প্রায় চার মাইল হাঁটার পর চোখের সামনে ভেসে উঠলো হীথক্লিফের বাসস্থান, ওয়াদারিং হাইটস। ছোট একটা টিলার ওপর বাড়িটা। লম্বা, নিচু, ধূসর রঙের। সরু সরু জানালা গভীরভাবে বসানো পুরু দেয়ালে। অপুষ্ট, খর্বকায় ফার গাছের একটা চক্র ঘিরে আছে বাড়িটাকে।

উঠতে শুরু করলাম আমি টিলার ওপর। পায়ের নিচে ঠাণ্ডায় জমে কঠিন হয়ে যাওয়া কালো মাটি। কনকনে ঠাণ্ডা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিতে চাইছে। কিছুদূর উঠতে না উঠতেই শুরু হলো তুষারপাত। বাগানের ফটকে যখন পৌছুলাম তখন পালকের মতো হালকা তুষারের বৃষ্টি প্রায় অন্ধ ক'রে দিয়েছে আমাকে। হাত বাড়িয়ে দিলাম ফটকের খিলটা ধরবার জন্যে। তারপরই থেমে গেলাম চমকে উঠে।

ফটক ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক।

এমন আচমকা তাকে দেখতে পেয়েছি যে আমার শ্বাস স্রেফ বন্ধ হয়ে গেল। লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি আমি। সে-ও তাকিয়ে আমার দিকে। মোটা কালো ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠেছে। কবরের মাথায় খাড়া করা পাথরের মতো নীরব, বিষণ্ন তার অভিব্যক্তি। সোজা হলো লোকটা। কতখানি লম্বা আর ঋজু তার শরীর এবার টের পেলাম। চুল এবং চোখ কালো। চেহারা রুক্ষ, কঠোর। তা সত্ত্বেও সুদর্শন সে। ভদ্রলোকের মতো পোশাক পরে আছে, যদিও তার গায়ের রঙ জিপসীদের মতো কালো।

লোকটা কে আন্দাজ করতে পারলাম।

'মিস্টার হীথক্লিফ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

জবাবে লোকটা মাথা ঝাঁকালো শুধু।

'আমি মিস্টার লকউড—আপনার নতুন ভাড়াটে। ভাবলাম আপনার সাথে একটু দেখা ক'রে—'

'ঢুকে পড়ুন!' আমাকে শেষ করতে না দিয়ে বললো লোকটা। দাঁতে দাঁত চেপে এমন সুরে আর এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললো যে আমার মনে হলো সে অনায়াসেই বলতে পারতো 'জাহান্নামে যান'। যা হোক, গেট খুলে দিলো সে এবং গোমড়া মুখে হাঁটতে লাগলো আমার সামনে সামনে। বাগানের পথ পেরিয়ে বড়সড় এক উঠানে ঢুকলাম আমরা।

'জোসেফ, খানিকটা মদ নিয়ে এসো তো!' চিৎকার করে লোকটা ঘুরে তাকালো আমার দিকে। 'এক্ষুণি আসছি আমি, ততক্ষণ আমার চাকর আপনার দেখাশোনা করবে।'

বাড়ির ওদিকে একটা কোনা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। আমি অপেক্ষা করতে করতে মুখ তুলে দেখতে লাগলাম অদ্ভুত কারুকাজ করা দরজার ওপর দিকটা। একটু ভালো ক'রে তাকাতেই খেয়াল করলাম, কারুকাজের ভেতর খোদাই করা একটা তারিখ '১৫০০', আর একটা নাম 'হেয়ারটন আর্নশ'।

পায়ের আওয়াজ পেলাম। পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বুড়ো এক লোক। সরু মুখ তার, তোবড়ানো গাল। এ-ই সম্ভবত জোসেফ। দু'চোখ ভরা বিতৃষ্ণা নিয়ে আমার দিকে তাকালো সে।

'এখানে এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলো লোকটা। 'ভেতরে আসুন। মিসেস পার্লারে আছেন।'

পাথর বাঁধানো এক অলিপথের ভেতর দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল সে। ডান দিকে একটা দরজা দেখিয়ে ইশারা করলো ঢুকে পড়ার। ওর কথামতো কাজ করলাম আমি এবং খেয়াল করলাম ঢুকেছি বিরাট এক ঘরে। এক পাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের ওপরে ঝোলানো কয়েকটা ভয়ঙ্কর-দর্শন বন্দুক আর এক জোড়া হর্স-পিস্তল। ঘরটার মেঝে মসৃণ শাদা পাথরে তৈরি। চেয়ারগুলো উঁচু-পিঠ, সবুজ রঙ করা। কোণের দিকে ছায়ায় রাখা কয়েকটা কালো চেয়ারও দেখলাম। সবুজগুলোর চেয়ে অনেক ভারি মনে হলো ওগুলোকে। ঘরের ওপ্রান্তে বিরাট, ছাদ পর্যন্ত উঁচু এক ড্রেসার। অনেকগুলো তাক, দেরাজ আর কাবার্ড তাতে। ওটার নিচে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড এক কলিজা রঙের মাদী পয়েন্টার। এক দঙ্গল বাচ্চা তাকে ঘিরে কুঁই কুঁই করছে। আগুনের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে আরো দুটো গম্ভীরমুখো লোমশ কুকুর। আমাকে দেখেই ওরা শ্বদন্ত বের ক'রে গরগরিয়ে উঠলো। ওদের পাশে একটা টেবিলে পরিবেশন করা হয়েছে

রাতের খাবার, প্রচুর পরিমাণে। এর পর আমি লক্ষ করলাম মেয়েটাকে। টেবিলে বসে আছে সে। আমার দিকে চোখ।

এক কথায় বলা যায় মেয়েটা সুন্দরী। বছর কুড়ি বয়েস। ছিপছিপে গড়ন। মুখটা ছোট, নিখুঁত গঠন; কোমল সোনালি চুলে ঢাকা মাথা।

এক মুহূর্ত হাঁ হয়ে রইলাম আমি। তারপর বাউ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলাম মেয়েটা কিছু বলবে এই আশায়। কিন্তু বললো না সে। নড়লোও না। যেমন ছিলো তেমনি বসে রইলো শীতল, বিরক্ত দৃষ্টি আমার ওপর স্থির রেখে।

'বাজে আবহাওয়া,' মন্তব্য করলাম আমি।

মুখ খুললো না মেয়েটা। আমি তাকিয়ে আছি ওর দিকে, ও-ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এক পা এগোলাম আমি। ড্রেসারের নিচের কুকুরটা গর গর ক'রে উঠলো। ওটার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে আমি একটু সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললাম:

'চমৎকার কুকুর। বাচ্চাগুলো রাখবেন আপনি, ম্যাডাম, না দিয়ে দেবেন?'

'ওগুলো আমার না,' শান্ত শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো মেয়েটা।

আগুনের আরেকটু কাছাকাছি হলাম আমি। বললাম, 'সন্ধেটা ভীষণ হয়ে উঠতে যাচ্ছে। তুষার পড়তে শুরু করেছে।'

'বাইরে বেরোনো উচিত হয়নি আপনার,' বললো মেয়েটা। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো সে উঁচু ম্যান্টলশেল্ফ থেকে একটা রঙ করা কৌটো নামানোর জন্যে। জিনিসটা ওর প্রায় নাগালের বাইরে। নামিয়ে দেয়ার জন্যে এগোলাম আমি। সাঁ ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো সে।

'আমি নিজেই পাড়তে পারবো!' বললো না যেন আমার গালে কষে এক চড় লাগালো মেয়েটা।

'জি—কী বললেন?' কোনোমতে জবাব দিলাম আমি।

কৌটোটা পেড়ে বুকের কাছে ধরলো সে। একটা চামচ তুলে নিয়ে ওটার মুখ খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো: 'চা খেতে বলা হয়েছে আপনাকে?'

'এক কাপ পেলে খুশি হবো আমি।'

'আপনাকে বলা হয়েছে কি না?' কাটা কাটা স্বরে আবার জিজ্ঞেস করলো সে।

'না,' হাসির একটা ভঙ্গি করলাম আমি। 'আপনিই তো বলবেন।'

চামচটা ভেতরে ফেলে খটাস ক'রে মুখ আটকে কৌটোটা আবার শেলফের ওপর রেখে দিলো মেয়েটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো আমার। ও কিছু বলার আগেই আমার পেছনের দরজাটা খুলে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম হীথক্লিফ ঢুকছে। তার পেছনে দীর্ঘদেহী এক তরুণ। নোংরা মোটা কাপড় তার পরনে। ঘন কোঁকড়া বাদামী চুল মাথায়। অশান্ত দৃষ্টি চোখে। মুখে বিরক্তি।

আমার উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো হীথক্লিফ, কিন্তু মুখে কোনো ভাব ফুটলো

না। কাপড় থেকে তুষারের কণা ঝেড়ে ফেলতে লাগলো সে। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বাইরে তুমুল তুষারপাত হচ্ছে।

'যা অবস্থা,' আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে না এক-আধ ঘণ্টার ভেতর বেরোতে পারবো। তুষার না কমা পর্যন্ত যদি এখানে থাকি আপনাদের অসুবিধা হবে না তো?'

'এক আধ ঘণ্টা!' বিরক্ত কণ্ঠে বললো হীথক্লিফ। 'এই দুর্যোগের ভেতর আপনি বেরোলেন কী মনে ক'রে আমি ভেবে পাচ্ছি না। জানেন না সন্ধ্যার পর ঘুরে পথ হারাতে পারেন? এ এলাকার মানুষরাই মাঝে মাঝে পথ হারায় এমন রাতে—তাছাড়া খুব শিগগির আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আপনার ছোকরাদের কেউ আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে আশাকরি,' বিব্রত মুখে আমি বললাম। 'রাতটা গ্র্যাঞ্জে কাটিয়ে সকালে ফিরে আসবে। কাউকে পারবেন আমার সাথে দিতে?'

'না—পারবো না।'

'ও! তাহলে আর কী, একাই ফিরবো। আশা করি পথ হারাবো না।'

'হুম!'

হীথক্লিফের সঙ্গে আসা তরুণ এতক্ষণ হিংস্রচোখে দেখছিলো আমাকে। এবার মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করলো: 'কি, চা বানাবে নাকি?'

শীতল চাউনি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটা এক মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞেস করলো; 'ঐ লোকও খাবে?'

'বানাও তাড়াতাড়ি!' হীথক্লিফ গর্জে উঠলো, এমন নোংরাভঙ্গিতে যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'ঐ চেয়ারটা টেনে বসুন ওখানে,' আমার দিকে ফিরে যোগ করলো সে।

টেবিল ঘিরে বসলাম আমরা চারজন।

নিঃশব্দে খাবার পরিবেশিত হলো। নীরবে চলতে লাগলো খাওয়া। টেবিলের অন্য তিনজন খেতে খেতে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে একে অপরের দিকে। মনে হলো ভদ্রতাসূচক কিছু কথাবার্তা বলে পরিবেশটা হালকা করা আমার কর্তব্য।

'মিস্টার হীথক্লিফ,' শুরু করলাম আমি, 'আপনি আর আপনার স্ত্রী কখনো—'

'আমার স্ত্রী!' ঘেউ ক'রে উঠলো লোকটা, ক্রোধে বেঁকে গেছে তার মুখ। 'আমার স্ত্রী মারা গেছে! আপনি কি বলতে চাইছেন তার প্রেতাত্মা এখানে হাজির হয়েছে? তাই কি, মিস্টার?'

বুঝতে পারলাম সাংঘাতিক ভুল ক'রে ফেলেছি। এরপর স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে হলো, আমার কনুইয়ের ওপাশে বসে বাটিতে ক'রে চা আর বাঁ হাতে রুটি নিয়ে জংলীর মতো কামড়ে খাচ্ছে যে তরুণ নিশ্চয়ই ও মেয়েটার স্বামী। কথাটা ভাবতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক চিরে। এত সুন্দর মেয়ে

এমন এক কদর্য লোকের হাতে পড়েছে!

'মিসেস হীথক্লিফ আমার পুত্রবধূ,' আমার চিন্তা-সূত্র অনুধাবন করতে পেরেই যেন বললো হীথক্লিফ।

বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে মেয়েটার দিকে। একই সময় মেয়েটাও তাকিয়েছে তার দিকে। চোখাচোখি হওয়ামাত্র দু'জনেরই চোখে ফুটে উঠলো তীব্র ঘৃণা, নারকীয় বিদ্বেষ। আমি রীতিমতো চমকে উঠলাম সে ঘৃণার উত্তাপে।

'ও,' অস্বস্তির সাথে উচ্চারণ করলাম আমি। তাকালাম তরুণের দিকে, 'আপনিই তাহলে ভাগ্যবান স্বামী—'

আর বলতে পারলাম না আমি। লাল হয়ে উঠেছে তরুণের মুখ; মুঠো পাকিয়ে উঠেছে হাত, মনে হচ্ছে মেরেই বসবে আমাকে।

'ও আমার বউ না!' দাঁতে দাঁত চেপে বললো সে, তারপর বিড়বিড় ক'রে ভয়ঙ্কর এক গালাগাল। আমি ভাব দেখালাম যেন শুনতে পাইনি গালাগালিটা।

'আবার ভুল,' ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো হীথক্লিফ। 'আমি বলেছি ও আমার পুত্রবধূ, তার অর্থ একটাই হতে পারে, আমার ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে ওর।'

'হ্যাঁ। এই তরুণ আপনার—'

'না, ছেলে না, এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনাকে।' হাসলো আবার হীথক্লিফ, আগের মতোই বিদ্রূপের হাসি।

'আমার নাম হেয়ারটন আর্নশ,' গম্ভীরকণ্ঠে বললো তরুণ। 'নামটাকে সম্মান দেখালে আপনি ভালো করবেন।'

ওর বলার ভঙ্গিতে বেশ মজা পেলাম আমি। বললাম, 'কোনো অসম্মান তো এখনো দেখাইনি।'

আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো হেয়ারটন। তারপর আবার শুরু করলো মুখের ভেতর খাবার গোঁজা। আমি আর কিছু বললাম না। বসে বসে ভাবতে লাগলাম পরস্পরের প্রতি এত ঘৃণা কেন এবাড়ির মানুষগুলোর মনে?

খাওয়া শেষ হতেই উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার কাছে। হৃদয় দমিয়ে দেয়ার মতো এক দৃশ্য ভেসে উঠলো চোখের সামনে। সময় হওয়ার আগেই রাত নেমে আসছে তার ভয়াবহ অন্ধকার নিয়ে। আকাশ এবং দূরের পাহাড়গুলো যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে বাতাসের তাণ্ডব আর তুষারের দাপটে।

'বাড়ি যেতে হলে পথ চেনে এমন কাউকে লাগবে আমার,' চিন্তিত কণ্ঠে বললাম। 'পথ এর মধ্যেই ডুবে গেছে তুষারে।'

'হেয়ারটন, যা, ভেড়াগুলোকে গোলাঘরে ঢুকিয়ে রেখে আয়,' বললো হীথক্লিফ।

'আমি কী করবো?' জিজ্ঞেস করলাম। ভেতরে ভেতরে অপমানিত বোধ করছি

আমি।

কেউ কোনো জবাব দিলো না। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। হীথক্লিফ আর তরুণ আর্নশ বেরিয়ে গেছে কখন টের পাইনি। ঘরে আছে শুধু মিসেস হীথক্লিফ। একটা বই তুলে নিয়েছে সে। খুক ক'রে একটু কেশে মেয়েটার মনোযোগ আকর্ষণ করলাম আমি।

'পথের দু'একটা নিশানার কথা বলতে পারবেন যেগুলো দেখে বাড়ি পৌঁছুতে পারি? এই ঝড়-তুষারে কী ক'রে যে পথ চিনবো বুঝতে পারছি না।'

'যে পথে এসেছেন সে পথে চলে যান,' তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিলো মেয়েটা।

'তারপর যদি শোনেন কোনো খানা বা তুষারভরা গর্তে পড়ে মারা গেছি তাহলেও বোধহয় আপনার কিছু আসবে যাবে না, তাই না?' ঝাঁঝের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম আমি।

'কেন যাবে বা আসবে? আমি তো আর আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। পারলেও ওরা দেবে না যেতে। আর কোনো লোকও নেই বাড়িতে যে আপনাকে নিয়ে যেতে পারে।'

'তাহলে রাতটা এখানেই কাটাতে হবে আমাকে,' নিরাশ কণ্ঠে বললাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকালো ও। 'এ ব্যাপারেও আমার কিছু করবার বা বলবার নেই।'

'আশা করি এতে আপনার শিক্ষা হবে,' রান্নাঘরের দরজা থেকে শোনা গেল হীথক্লিফের রুক্ষ কণ্ঠস্বর, 'হুট ক'রে আর বেরিয়ে পড়বেন না এই সব পাহাড়ে ঘোরার জন্যে। এখানে যদি থাকতে চান হেয়ারটন বা জোসেফ—কারো সাথে শুতে হবে আপনাকে।'

'এ ঘরের কোনো একটা চেয়ারেই আমি ঘুমিয়ে নিতে পারবো,' বললাম আমি।

'নিশ্চয়ই না!' অভদ্রের মতো চেঁচিয়ে উঠলো হীথক্লিফ। 'পয়সাঅলা বা পয়সাছাড়া যে-ই হোক, অপরিচিত অপরিচিতই। তাকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি অরক্ষিত অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকবো আর সেই ফাঁকে আপনি সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াবেন ইচ্ছেমতো তা হবে না।'

এই অপমানের পর আর এখানে থাকা চলে না। বিতৃষ্ণ মুখে আমি তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে নামলাম উঠানে। তুষার ঝড়ের ঝাপটা এসে লাগলো চোখে মুখে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারদিকে। এদিক ওদিক তাকাতে উঠানের ও পাশে গোয়ালঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলাম জোসেফকে। ভেতরে বসে গরু দোয়াচ্ছে সে। পাশে রাখা একটা লণ্ঠন। রাগে তখন আমার সারা শরীর জ্বলছে। দুপদাপ পা ফেলে গিয়ে ঢুকলাম গোয়ালঘরটায়। ছোঁ মেরে তুলে নিলাম লণ্ঠনটা।

'কাল সকালে পাঠিয়ে দেবো এটা,' চিৎকার ক'রে বলে এগোলাম ফটকের দিকে।

'মালিক! স্যার! আমাদের লণ্ঠন চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠলো জোসেফ। 'এই, গৃন্যাশার! এই, উলফ! ধর্, ধর্!'

এক সেকেণ্ড পেরোনোর আগেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো দুই লোমশ দানব। আমার গলার কাছে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে শুইয়ে ফেলে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো হিংস্রভাবে। লণ্ঠনটা নিবে গেল মাটিতে পড়ে। পেছনের কোথাও থেকে তীক্ষ্ণস্বরে শিস দিলো হীথক্লিফ। কিন্তু কুকুর দুটো নড়লো না আমাকে ছেড়ে। আমার প্রায় বুকের ওপর দাঁড়িয়ে শ্বদন্ত বের ক'রে চিৎকার ক'রে চললো তারা। অবশেষে হীথক্লিফ এসে ওদের টেনে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম আমি। চিৎকার ক'রে বললাম, 'আমাকে বেরিয়ে যেতে—'

নাক থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের ধারা থামিয়ে দিলো আমাকে। এই সময় কোথা থেকে কে জানে হাজির হলো হেয়ারটন। হীথক্লিফও এসে দাঁড়ালো দরজার মুখে। দু'জন হাসতে লাগলো প্রাণ খুলে। এত হাসির কী হয়েছে দেখার জন্যে অবশেষে এক বুড়ি, যার নাম পরে জেনেছিলাম জিল্লা, বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর থেকে। অন্ধকারেও, কী ক'রে জানি না আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো সে।

'আ-হা-হা, বেচারি!' চিৎকার করলো জিল্লা। 'এ কী অবস্থা! ইস! আপনারা অমন করছেন কেন ওকে নিয়ে? আসুন, ভেতরে আসুন, পরিষ্কার ক'রে দেই ক্ষত। এই! তোরা চুপ ক'রে দাঁড়া ওখানে!'

বলতে বলতে সে হঠাৎ অন্তত এক পাইন্ট বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি ছুঁড়ে দিলো আমার গলায়। তারপর আমাকে টানতে টানতে নিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে। হীথক্লিফ এলো পেছন পেছন। আমাকে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি দেয়ার নির্দেশ দিলো বুড়িকে। রাতের মতো আমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে বলে বেরিয়ে গেল সে।

কাপড় দিয়ে আমার নাকের রক্ত মুছিয়ে দিলো জিল্লা। প্রভুর নির্দেশ মতো ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলো একটা গ্লাসে। তারপর আমার হাতে একটা মোমবাতি ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'আসুন আমার সাথে। বাতিটা আড়ালে রাখুন। আর শব্দ করবেন না একদম। আমি চাই না মালিক জানুন কোন ঘরে আপনাকে থাকতে দিচ্ছি। ও ঘরে কাউকে থাকতে দেন না উনি।'

'কেন?'

'জানি না ঠিক। আমি বেশি দিন আসিনি এবাড়িতে। শুধু এটুকু জানি ওঘরে কাউকে থাকতে দেন না উনি।'

দোতলায় উঠে আমাকে বড় একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল জিল্লা। দরজা

বন্ধ ক'রে চারপাশে তাকালাম আমি। সাধারণ আসবাব পত্রে সজ্জিত ঘরটা। সাবেকী ঢংয়ের একটা ওকের খাট পাতা জানালার নিচে। খাটের পাশে রাখা একটা চেয়ার। এক দিকে একটা পুরনো কাউচ।

কাপড় খুলে বিছানায় উঠে পড়লাম আমি। মোমটা নিভালাম না। বিছানার মাথার কাছে একটা বইয়ের শেলফ। প্রায় খালি। কয়েকটা মাত্র জীর্ণ বই পড়ে আছে একটা তাকের এক কোণে। দেয়ালে দেখলাম ছোট ছোট হরফে আঁচড় কেটে লেখা একটা নাম। বার বার নানা ভাবে, নানা ধাঁচে লেখা হয়েছে নামটা—ক্যাথরিন—ক্যাথরিন আর্নৃশ, কোথাও ক্যাথরিন হীথক্লিফ, কোথাও বা ক্যাথরিন লিনটন।

শুয়ে শুয়ে নামগুলো আওড়াতে লাগলাম মনে মনে—ক্যাথরিন—ক্যাথরিন আর্নৃশ—হীথক্লিফ—লিনটন, ক্যাথরিন—ক্যাথরিন আর্নৃশ—হীথক্লিফ—লিনটন। আস্তে আস্তে চোখ মুদে এলো আমার। তারপরেও আউড়ে চললাম নামগুলো। যতক্ষণ না শাদা অক্ষরগুলো অন্ধকার থেকে বেরিয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগলো আমার চোখের সামনে এবং বাতাস পূর্ণ হয়ে উঠলো ক্যাথরিন—ক্যাথরিন—ক্যাথরিন গুঞ্জন ধ্বনিতে ততক্ষণ আউড়েই চললাম—আউড়েই চললাম···

হঠাৎ চামড়া পোড়া গন্ধ পেয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম আমি। মোমবাতিটা রেখেছিলাম মাথার কাছে তাকে। কখন যেন ওটা কাত হয়ে পড়েছে চামড়া বাঁধানো একটা বইয়ের ওপর। তাড়াতাড়ি মোমটা সোজা ক'রে লাগিয়ে বইটা তুলে নিলাম। সামান্যই পুড়েছে মলাট। পোড়া অংশে একবার হাত বুলিয়ে বইটা খুললাম আমি। প্রথম পাতায় লেখা এই কথাগুলো: *ক্যাথরিন আর্নৃশ, অর বই*, আর একটা তারিখ প্রায় সিকি শতাব্দী আগের। বইটা বন্ধ ক'রে রেখে আরেকটা তুলে নিলাম। একে একে সবগুলো বই উল্টেপাল্টে দেখলাম। ক্যাথরিনের বইগুলো সব বাছাই করা। জীর্ণ চেহারা দেখে মনে হয় ভালোই ব্যবহার হয়েছে ওগুলো। প্রতিটা বইয়ের প্রতিটা পাতার পাশে ফাঁকা জায়গায় মন্তব্য লেখা হয়েছে খুদে খুদে হরফে। বইয়ের শুরুতে বা শেষে যে একটা বা দুটো শাদা পৃষ্ঠা থাকে সেগুলোও ভর্তি লেখায়। এ রকম একটা পৃষ্ঠা পড়লাম। কালি ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু পড়তে অসুবিধা হলো না:

'বিশ্রী এক রোববার! মনে হচ্ছে বাবা যদি আবার ফিরে আসতো। হিণ্ডলে খুবই বাজে বাড়ির কর্তা হিশেবে। হীথক্লিফের সাথে ওর ব্যবহার অসহ্য। হ. আর আমি বিদ্রোহ করবো। আজ সন্ধ্যায়ই তার সূচনা হবে।'

আরেকটা পৃষ্ঠায় লেখা:

'স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি হিণ্ডলে আমাকে এত কাঁদাবে। ভীষণ মাথা ধরেছে আমার। বালিশে রাখতে পারছি না মাথা। বেচারি হীথক্লিফ! হিণ্ডলে ওকে বদমাশ ভবঘুরে বলে: আমাদের সাথে বসতে দেয় না, খেতেও দেয় না আমাদের সাথে।

বলে, ওর সাথে আমি আর খেলতে পারবো না। ভয় দেখিয়েছে, ওর কথা না শুনলে আমাদের দু'জনকেই বের ক'রে দেবে বাড়ি থেকে। ও বলে সব দোষ নাকি বাবার (কী সাহস!)। বাবাই নাকি হ.কে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে। হিণ্ডলে প্রতিজ্ঞা করেছে হ.কে ওর যোগ্য জায়গায় নামিয়ে আনবেই—'

এখনও আমি বলতে পারবো না এর পর যা ঘটেছিলো তা ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্ন, না আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা, না সত্যি।

পড়তে পড়তে শুয়ে পড়েছি কখন যেন। আরো কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ার পর চোখ টেনে আসতে লাগলো আমার। জোর ক'রে চোখ খোলা রেখে পড়ে চললাম। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি। জানালায় তুষার পড়ার শব্দ। ফার গাছের একটা ডাল ঝড়ে দুলে দুলে ঠক ঠক ক'রে বাড়ি খাচ্ছে জানালার কপাটের সাথে।

ভীষণ বিরক্ত করছে শব্দটা। ভাবলাম, থামাতে হবে এই শব্দ—যে ক'রেই হোক থামাতে হবে। উঠে বসে আমি জানালার কপাট খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। মরিচা ধরে এঁটে গেছে ছিটকিনি।

'থামাতে হবে! থামাতেই হবে!' বিড়বিড় করলাম আমি।

ঠক ঠক শব্দটা তখন প্রায় পাগল ক'রে দিয়েছে আমাকে। যে ক'রেই হোক ওটা বন্ধ করতে হবে।

মুঠো পাকিয়ে সর্বশক্তিতে ঘুসি মারলাম কাচে। কাচ ভেঙে আমার হাত চলে গেল বাইরে। ডালটা ধরার জন্যে হাত বাড়ালাম আমি।

তারপর ঘটলো সেই ঘটনা!

বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাতের সরু সরু আঙুল ধরে বসলো আমার হাত।

দুই

দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক ভর করলো আমার ওপর। হাত টেনে নেয়ার চেষ্টা করলাম আমি। পারলাম না। বাইরের আঙুলগুলো শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে আছে আমার হাত। কান্নাভাঙা একটা নারী-কণ্ঠ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠলো, 'ঢুকতে দাও! ঢুকতে দাও আমাকে!'

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি চেষ্টা করলাম হাতটা ছাড়িয়ে আনার। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে—কে তুমি?'

'ক্যাথরিন লিনটন,' আগের মতোই ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দিলো নারীকণ্ঠ। 'বাড়ি এসেছি। ঢুকতে দাও আমাকে। পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম মুরের

ভেতর।'

শাদা একটা ধোঁয়াটে বাচ্চার মুখ দেখলাম জানালার ওপাশে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে আকুতি ভরা চোখে।

'ঢুকতে দাও! আমার ঘরে ঢুকতে দাও আমাকে!'

আতঙ্ক আমাকে নিষ্ঠুর ক'রে তুললো। আমার হাত যখন ছাড়াতে পারছি না তখন ওর হাতটাই হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এলাম ভেতরে। ভাঙা কাচের সঙ্গে ঘষতে লাগলাম হাতটা এদিক ওদিক মুচড়ে মুচড়ে। যতক্ষণ না দর দর ধারায় রক্ত বেরিয়ে বিছানা লাল হয়ে গেল ততক্ষণ ঘষে চললাম আমি উন্মাদের মতো। তখনো সে সেই ভাঙা স্বরে অনুনয় ক'রে চলেছে, বরফের মতো আঙুলগুলো দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে আমার হাত। ভয়ে পাগল হওয়ার দশা আমার।

'কী ক'রে তোমাকে ঢুকতে দেবো এভাবে আমার হাত ধরে থাকলে?' চিৎকার করলাম আমি।

অমনি ঠাণ্ডা আঙুলগুলো আলগা হয়ে গেল। সাঁ ক'রে আমি ভেতরে নিয়ে এলাম আমার হাত। তাড়াতাড়ি তাক থেকে বইগুলো নিয়ে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে বন্ধ ক'রে দিলাম কাচের ভাঙা অংশটা। দু'হাত কানে চাপা দিলাম যাতে আর্তনাদ কানে ঢুকতে না পারে।

অনেকক্ষণ অমনি দাঁড়িয়ে রইলাম কান বন্ধ ক'রে। কিন্তু যেই কান থেকে হাত সরালাম অমনি আবার শুনতে পেলাম গোঙানির মতো করুণ কান্না, 'ঢুকতে দাও! ঢুকতে দাও আমাকে!'

আমার মনে হলো আর এক মুহূর্তও আমি সইতে পারবো না এ শব্দ। চিৎকার ক'রে উঠলাম, 'চলে যাও! চলে যাও! তোমাকে আমি ঢুকতে দেবো না!'

'অস্পষ্ট আঁচড় কাটার শব্দ শুনলাম কপাটে। তারপর দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে দেখলাম বইয়ের স্তূপটা নড়ছে একটু একটু, যেন ওপাশ থেকে ঠেলা দিয়ে ওগুলোকে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে।

লাফ দিয়ে বইগুলো চেপে ধরতে চাইলাম আমি। কিন্তু প্রবল ভীতির কারণে একটুও নাড়তে পারলাম না হাত পা···

পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম ঘরের বাইরে। ঝাঁ ক'রে খুলে গেল দরজা। বাতি হাতে এক লোক ঢুকলো ভেতরে। এবার খেয়াল করলাম, আমি বিছানায় বসে আছি। কাঁপছি থর থর ক'রে। কপাল থেকে ঘাম মুছলাম আমি।

'কেউ আছে নাকি এঘরে?' ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করলো একটা কণ্ঠস্বর।

হীথক্লিফের কণ্ঠস্বর। আমি জবাব দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে দুর্বোধ্য একটা শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরোলো না। এগিয়ে এলো সে বাতি হাতে। শার্ট আর ট্রাউজার শুধু পরনে। মুখটা শাদা তার পেছনের দেয়ালের মতো। আমার কণ্ঠস্বর ভীষণভাবে চমকে দিয়েছে তাকে। মোমবাতি ধরা হাতটা কাঁপছে থর থর

ক'রে। খেয়াল করলাম তার শরীরও কাঁপছে।

'আমি—আমি আপনার অতিথি,' কোনো মতে উচ্চারণ করলাম আমি। 'ঘুমের ভেতর ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি। আমি—আমি দুঃখিত আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে।'

দাঁতে দাঁত ঘষে কটমট ক'রে তাকালো হীথক্লিফ আমার দিকে।

'আপনি!' চিৎকার করলো সে। 'কে এঘরে ঢুকতে দিয়েছে আপনাকে? কে? বলুন! তাকে এক্ষুণি বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবো আমি!'

'আপনার চাকরানী জিলা,' বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরতে পরতে আমি বললাম। 'আপনার যা খুশি ওকে করতে পারেন, মিস্টার হীথক্লিফ, ওর পাওনা সেটা। নচ্ছার বেটি আমাকে আটকে রেখে গেছে ভূত পেত্নীর আস্তানায়!'

আমার দিকে তাকিয়ে রইলো হীথক্লিফ। অদ্ভুত এক আলো ফুটে উঠেছে তার চোখে।

'জানালাটা ভেঙে ফেলেছেন আপনি!' ফিস ফিস ক'রে বললো সে। তারপর চুপ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভাঙা কাচের দিকে।

চমকে উঠলাম আমি। এই প্রথম অনুধাবন করলাম, কাচ ভাঙার ব্যাপারটা একেবারেই বাস্তব। বিড়বিড় ক'রে একবার দুঃখ প্রকাশ ক'রে কাপড় পরতে লাগলাম আমি।

'কী করছেন?' জিজ্ঞেস করলো হীথক্লিফ। 'শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, যখন ঢুকেই পড়েছেন তখন রাতটা থাকুন। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, অমন ভয়ঙ্কর চিৎকার আর করবেন না। আমি তো ভেবেছি আপনার গলা কাটছে কেউ!'

'তা-ই হতো যদি খুদে ডাইনীটা ঢুকতে পারতো ঐ ফোকর গলে।' জবাব দিলাম। 'এই ক্যাথরিন লিনটন—বা যা-ই নাম হোক না কেন—নিশ্চয়ই বাজে মেয়েলোক ছিলো। তাই তার পাপের শাস্তি পাচ্ছে; মৃত্যুর পরও হেঁটে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর ওপর দিয়ে, কোনো সন্দেহ—'

থেমে গেলাম আমি। বুনো জন্তুর মতো উন্মাদ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে হীথক্লিফের চোখে। হিংস্র পশুর মতোই বেরিয়ে পড়েছে দাঁতগুলো।

'এ-এত বড় সাহস আপনার!' গর্জে উঠলো সে। 'ওহ্ ঈশ্বর! আপনি পাগল নাকি? আমাকে—আমাকে এসব কথা বলছেন!'

তীব্র আক্রোশে কপালে করাঘাত করতে করতে সে দুর্বলভাবে বসে পড়লো বিছানার প্রান্তে। তাকিয়ে আছে সোজা সামনের দিকে। ঘন ঘন ওঠা নামা করছে বুকটা।

আমি লোকটাকে আঘাত দিয়েছি মনে ক'রে সংকুচিত বোধ করতে লাগলাম। কাপড় পরা হয়ে গেছে আমার। ঘড়ির দিকে তাকালাম। 'আ-হা, তিনটে বাজেনি এখনো!' বললাম। 'ভাবছিলাম অন্তত ছ'টা বাজে।'

'মিস্টার লকউড,' বললো হীথক্লিফ, 'আমার ঘরে গিয়ে ঘুমান আপনি। আমার আর ঘুম আসবে না আজ রাতে।'

'আমারও আসবে না। সকাল না হওয়া পর্যন্ত উঠানেই পায়চারি ক'রে কাটাবো। আলো ফুটলে চলে যাবো।'

'যেখানে খুশি যেতে পারেন আপনি,' বললো হীথক্লিফ। 'তবে আর যা-ই করুন উঠান থেকে দূরে থাকবেন—কুকুরগুলো ছাড়া রয়েছে। মোমবাতিটা নিয়ে নিচে যান—আমি আসছি দু'মিনিটের মধ্যে।'

মোমটা তুলে নিয়ে এগোলাম আমি খোলা দরজার দিকে। সরু অলিপথে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোন দিকে ঘুরবো এবার? ঘুরে দাঁড়ালাম হীথক্লিফকে জিজ্ঞেস করবো ভেবে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা দু'ঠোঁটের ফাঁকে জমে গেল যেন।

বিছানায় উঠে বসেছে ও। জানালাটা খুলে দিয়েছে পুরোপুরি।

'এসো! এসো!' চিৎকার করতে শুনলাম ওকে। কান্নাভেজা গলা। 'ক্যাথি! শোনো, এবারটির মতো শোনো! ক্যাথরিন!'

খোলা জানালা দিয়ে এক দমক তুষার মেশা বাতাস ছুটে এলো ঘরে। ফুঁপিয়ে উঠলো হীথক্লিফ। আমি আর দাঁড়ালাম না। ঘুরে এগোতে শুরু করলাম কোন দিকে যাচ্ছি কেন যাচ্ছি কিছু না ভেবে।

কিছুদূর এগোনোর পর এক সিঁড়ির মুখে পৌঁছুলাম। রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নেমে এলাম নিচে। রান্নাঘরের পেছন অংশ সেটা। চুলোয় তখনো আগুন জ্বলছে সামান্য। দুটো বেঞ্চ রাখা আগুনের খুব কাছে। একটার ওপর গিয়ে বসলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম টানটান হয়ে। ঝিমুনি লেগে এলো একটু পরেই।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে জেগে গেলাম আমি। উঠে বসে চোখ পিট পিট ক'রে দেখলাম হেয়ারটন আর্নশ ঘরের এক কোণে কী যেন খুঁজছে তন্নতন্ন ক'রে। একটু পরেই একটা বেলচা তুলে নিয়ে সোজা হলো সে। আন্দাজ করলাম দরজার মুখে জমা হওয়া তুষারের স্তূপ পরিষ্কার করতে চলেছে ছেলেটা। উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে এগোনোর ভঙ্গি করলাম। অমনি অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো হেয়ারটন। হাতের বেলচাটা ঝাঁকিয়ে ইশারা করলো ভেতর দিকের এক দরজার উদ্দেশ্যে। এই ইশারার অর্থ একটাই হতে পারে; ঐ দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ো।

তা-ই করলাম আমি, এবং পৌঁছুলাম মূল রান্নাঘরে। বাড়ির মহিলারা ইতিমধ্যে এসে গেছে সেখানে। জিল্লা চুলা জ্বালানোর পর হাপর দিয়ে বাতাস দিচ্ছে। মিসেস হীথক্লিফ হাঁটু গেড়ে বসে আছে পাশে। চুলার আগুনের আলোয় বই পড়ছে সে।

অবাক হয়ে দেখলাম হীথক্লিফও আছে সেখানে। ক্রুদ্ধস্বরে কথা বলছে। আমার দিকে পিঠ তার। জিল্লার ধোলাই পর্বের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে সে। ধোলাইটা

কেন অনুমান করতে কষ্ট হলো না—আমাকে রাতে ওপরের ঘরে থাকতে দিয়েছিলো বলে। আমি ঢোকার পরপরই জিল্লাকে ছেড়ে পুত্রবধূকে ধরলো হীথক্লিফ।

'—আর তুমি, অপদার্থ মেয়ে,' চিৎকার করলো সে, 'হাতের ঐ জঞ্জালটা ফেলে কাজের কাজ করো কিছু! কানে গেছে আমার কথা?'

'জঞ্জালটা আমি ফেলবো,' জবাব দিলো তরুণী, 'কারণ স্বেচ্ছায় না ফেললে তুমি আমাকে বাধ্য করবে ফেলতে।' বইটা বন্ধ ক'রে একটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে দিলো সে। 'কিন্তু আমি কোনো কাজ করবো না। যত গালাগালিই তুমি করো, আমি করবো না।'

সাঁ ক'রে চড় তুললো হীথক্লিফ। মেয়েটা লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল দু'পা। পর মুহূর্তে দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, যেন চুলার উত্তাপ পাওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছি। আগুনঝরা চোখে আমার দিকে তাকালো হীথক্লিফ। তবে এর বেশি আর কিছু করলো না সে। হাত দুটো পকেটে ভরে ফেললো। মিসেস হীথক্লিফ ঠোঁট উল্টে ঘরের অন্যপাশে গিয়ে বসলো। কথা রাখলো সে। ছোট একটা মূর্তি নিয়ে খেলতে লাগলো আপন মনে; কোনো কাজে হাত দিলো না।

আমি আর বেশিক্ষণ থাকলাম না ওখানে। ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠতেই বেরিয়ে এলাম বাইরে। হীথক্লিফ নাশতা করে যেতে বললো। আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। ঐ অভিশপ্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোলা বাতাসে আসতে পেরে বেঁচে গেলাম যেন আমি।

বাগানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শুনলাম হীথক্লিফের চিৎকার। আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইছে। এ প্রস্তাবটা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম না—আসলে করার সাহস পেলাম না। কারণ সামনে দেখতে পাচ্ছি যতদূর চোখ যায় কেবল শাদা আর শাদা। সমস্ত উপত্যকা, প্রান্তর ঢাকা পড়ে গেছে তুষারে। প্রতিটা গর্ত, খানা-খন্দক ভরে এক সমতল হয়ে গেছে। কাল বিকেলে যেমন দেখেছি তা থেকে একেবারে বদলে গেছে প্রকৃতির চেহারা।

সারা রাস্তা সে গম্ভীর হয়ে রইলো, একটা কথাও বললো না। থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জের ফটকের কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো:

'বাকিটুকু একাই চলে যেতে পারবেন। এখান থেকে আর পথ হারানোর কোনো সম্ভাবনা নেই।'

আমি বাউ করলাম তাকে। সে-ও করলো আমাকে। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো। আমিও এগোলাম গ্র্যাঞ্জের দিকে।

ফটক থেকে মূল গ্র্যাঞ্জের দূরত্ব দু'মাইল মতো। কিন্তু আমি গাছপালার ভেতর দিয়ে ঘুরে, বার বার গলা পর্যন্ত তুষারে ডুবে সেটাকে চারমাইল ক'রে তুলতে পারলাম অনায়াসে। অবশেষে দুপুর যখন বারোটা, বাড়িতে ঢুকলাম আমি। তখন

আমার সারা শরীর প্রায় জমে গেছে ঠাণ্ডায়।

দরজার কাছে দেখা হলো মিসেস ডীনের সঙ্গে—গোলগাল সদয় মহিলা, আমার হাউসকীপার। বাড়ি ইয়র্কশায়ারে। চেহারা দেখে মনে হলো আমি মারা গেছি ধরে নিয়েছে সে, এখন ভাবছিলো কী ক'রে বেরোবে আমার মৃতদেহের খোঁজে।

কোনোমতে শরীরটাকে টেনে টেনে দোতলায় উঠলাম আমি। শুকনো কিছু একটা গায়ে দিয়ে ফিরে এলাম নিচে। স্টাডিতে গিয়ে বসলাম। মিসেস ডীন ধূমায়িত কফি এনে রাখলো সামনে। ফায়ার প্লেসের সামনে ভেজা বেড়ালছানার মতো গুটি সুটি হয়ে বসে আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম আগুন আর কফির উষ্ণতা।

সারা বিকেল ঝিমিয়ে কাটালাম। রাতে খাওয়ার পর ডেকে পাঠালাম আমার গৃহপরিচারিকাকে। এখনো আমার মাথার ভেতর ঘুরছে হীথক্লিফ, তার অদ্ভুত বাড়ি আর সে বাড়ির আরো অদ্ভুত পরিবেশ ও মানুষগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। আমি জানি মিসেস ডীন গল্প ভালোবাসে—শুনতে নয় করতে। আশা করা যায় বুঝে প্রশ্ন করলে সে হয়তো মেটাতে পারবে আমার কৌতূহল।

'তুমি তো অনেকদিন আছো এখানে, তাই না?' মহিলাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম।

'আঠারো বছর, স্যার। আমার মনিবানির যখন বিয়ে হলো তখন প্রথম আসি এ বাড়িতে—তার সঙ্গেই, তার কাজকর্ম করার জন্যে। তার মৃত্যুর পর মনিব আর তাড়াননি আমাকে, রেখে দেন হাউসকীপার হিশেবে।'

'আচ্ছা!'

চুপ মহিলা। আমার মনে হতে লাগলো আমার সাথে আর বোধহয় কথা বলতে উৎসাহ বোধ করছে না সে। কেটে গেল নীরব কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো মিসেস ডীন, 'আহ, দিন কত বদলে গেছে তারপর!'

'হ্যাঁ,' কথাটা লুফে নিয়ে আমি বললাম। 'অনেক পরিবর্তন মনে হয় তোমার চোখের সামনেই ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, অনেক ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে আমাকে।'

'তা তো হবেই। আচ্ছা, মিসেস ডীন, মিস্টার হীথক্লিফের আর্থিক অবস্থা কি ভালো না বিশেষ যে—'

'ভালো না বলছেন কী, স্যার! ওর যে কত টাকা তা বোধ হয় ও নিজেও জানে না। প্রতিবছরই বাড়ছে সে-টাকার পরিমাণ।'

'তাহলে এই গ্র্যাঞ্জের মতো এত ভালো বাড়ি ভাড়া দিয়ে হাইটসের মতো অমন জীর্ণ বাড়িতে থাকে কেন?'

'সে তার ইচ্ছা। আমার মনে হয় টাকার লোভ। একলা মানুষ এই পৃথিবীতে,

তার পরেও কত টাকা যে তার চাই ঈশ্বরই বলতে পারেন!'

'হুঁ। ভদ্রলোকের এক ছেলে ছিলো মনে হলো।'

'হ্যাঁ। মারা গেছে।'

'মেয়েটা তাহলে তারই বিধবা স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ি কোথায় মেয়েটার?'

'কেন, স্যার! আমারই প্রয়াত মনিবের মেয়ে ও। কুমারী অবস্থায় ওর নাম ছিলো ক্যাথরিন লিনটন।'

'ক্যাথরিন লিনটন!' চমকে উঠে আমি বললাম।

'হ্যাঁ, আমিই তো কোলে পিঠে ক'রে বড় করেছি ওকে। বেচারি মা মরা মেয়েটা! হীথক্লিফ যদি এখানে এসে থাকতো খুব ভালো হতো, আমরা আবার একসাথে থাকতে পারতাম।'

একটু ভাবতেই বুঝতে পারলাম আমার অশরীরী ক্যাথরিন আর এই ক্যাথরিন এক নয়। জিজ্ঞেস করলাম:

'মানে হীথক্লিফের আগে এবাড়ির যিনি মালিক ছিলেন তাঁর নাম লিনটন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ঐ আর্নশটা কে?—হেয়ারটন আর্নশ, মিস্টার হীথক্লিফের বাড়িতে থাকে? আত্মীয় ওরা?'

'না। হেয়ারটন হচ্ছে প্রয়াত মিসেস লিনটনের ভাইপো।'

'মানে ঐ তরুণীর মামাতো ভাই?'

'হ্যাঁ। ওর স্বামীও ছিলো সম্পর্কে ভাই—ফুপাতো। হীথক্লিফ মিস্টার লিনটনের বোনকে বিয়ে করেছিলো।'

'ওয়াদারিং হাইটসের সামনের দরজায় দেখলাম *আর্নশ* নামটা খোদাই করা। খুব পুরনো নাকি পরিবারটা?'

'খুবই পুরনো, স্যার। হেয়ারটন ঐ বংশের শেষ সন্তান, আর মিস ক্যাথি আমাদের—মানে লিনটনদের বংশের। আপনি, স্যার, ওয়াদারিং হাইটসে গেছিলেন? কিছু মনে করবেন না জিজ্ঞেস করছি বলে—কেমন আছে আমার মানিক?'

'মিসেস হীথক্লিফ? চেহারা দেখে তো ভালোই মনে হলো, তবে খুব যে সুখে নেই তা বুঝতে পেরেছি।'

'থাকার কথাও না। বাড়িঅলাকে আপনার কেমন মনে হলো?'

'বাজে। রুক্ষ একেবারে। বরাবরই অমন নাকি লোকটা?'

'করাতের দাঁতের মতো কর্কশ আর যাঁতার মতো শক্ত। ওর সাথে যত কম দেখা হয় ততই মঙ্গল।'

'লোকটার জীবনে অনেক উত্থান পতন আছে মনে হলো। তুমি জানো নাকি কিছু ওর কাহিনী?'

'জানবো না! প্রায় সবই জানি কেবল কোথায় জন্ম, কারা ওর বাবা মা, আর প্রথমবার কোত্থেকে অত টাকা পয়সা পেলো এই তিনটে বিষয় ছাড়া। বেচারি হেয়ারটনকে কীভাবে যে বঞ্চিত করেছে বদমাশটা!'

'মিসেস ডীন, ভীষণ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী মনে হচ্ছে। শোনাবে আমাকে? রাতে ঘুমাতে পারবো না নাহলে।'

'আপনি চাইলে নিশ্চয়ই শোনাবো, স্যার। এক মিনিট বসুন, সেলাই করার মতো কিছু নিয়ে আসছি আমি।'

একটু পরেই সেলাইয়ের ঝুড়ি নিয়ে এসে বসলো মহিলা আগের জায়গায়। শুরু করলো গল্প—

তিন

এখানে, এই থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে থাকতে আসার আগে আমি জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি ওয়াদারিং হাইটসে। আমার মা ও-বাড়ির বাচ্চাদের দেখাশোনা করতো। আমি থাকতাম মা-র সাথে। দুই বাচ্চা—হিণ্ডলে আর ক্যাথরিনের সাথে খেলা করতাম, ফাই ফরমাশ খাটতাম, বাড়ির এবং খামারের ছোট খাটো কাজও করতাম।

এক সুন্দর গ্রীষ্ম সকালে, ফসলকাটার মৌসুম সবে শুরু হয়েছে তখন, সালটা যদ্দূর মনে পড়ছে ১৭৭১, মিস্টার আর্নশ মানে আমার পুরনো মনিব বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে দোতলা থেকে নেমে এলেন। প্রথমে তিনি কাজের লোক জোসেফকে সেদিন কী কী করতে হবে সে সম্পর্কে আদেশ নির্দেশ দিলেন। তারপর তাকালেন ছেলে হিণ্ডলে, মেয়ে ক্যাথি আর আমার দিকে। আমি তখন পরিজ খাচ্ছিলাম ওদের সাথেই বসে।

'আমি লিভারপুল যাচ্ছি, তোমার জন্যে কী আনবো বলো তো, বাবা?' ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন মিস্টার আর্নশ। 'যা তোমার পছন্দ বলো। কিন্তু জিনিসটা যেন ছোট হয়। ষাট মাইল রাস্তা আমাকে হেঁটে যেতে হবে, ফিরতেও হবে হেঁটে।'

হিণ্ডলে একটা ফিড্‌ল (বেহালা জাতীয় ছোট-বাদ্যযন্ত্র) আনতে বললো। এবার মিস ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করলেন মনিব। ওর বয়েস তখনো ছয় পোরেনি, কিন্তু এরই মধ্যে সে আস্তাবলের যে কোনো ঘোড়ায় চড়তে শিখে গিয়েছিলো। ও একটা চাবুক আনতে বললো। আমার কথাও ভুললেন না মিস্টার আর্নশ। বাড়ির সবাইকে কড়া

শাসনে রাখলেও আসলে তাঁর মনটা খুব নরম আর উদার। আমার জন্যে পকেট ভর্তি আপেল আর নাশপাতি আনবেন বললেন। এর পর স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে, বাচ্চাদের চুমু খেয়ে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

মাত্র তিনদিন মনিব বাইরে রইলেন, কিন্তু আমাদের মনে হতে লাগলো যেন কত দিন! ক্যাথি একটু পরপরই জিজ্ঞেস করে, 'কখন আসবে বাবা?' তৃতীয় দিন সন্ধ্যা নাগাদ ফেরার কথা তাঁর। আমরা সবাই অপেক্ষা ক'রে রইলাম, কখন আসেন, কখন আসেন। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল, রাত বেড়ে চললো, কিন্তু তিনি এলেন না। মিসেস আর্নশ আমার মা-কে ডেকে বললেন বাচ্চাদের আর চাকর বাকরদের খাইয়ে দিতে। আমরা খেয়ে নিলাম, মিসেস বসে রইলেন টেবিলে স্বামীর জন্যে খাবার সাজিয়ে।

অবশেষে রাত যখন এগারোটা প্রায়, নিঃশব্দে খুলে গেল সামনের দরজা। মনিব ঢুকলেন ঘরে। ওভারকোটটা পোঁটলা পাকিয়ে ধরা তাঁর দু'হাতে।

সবাই খুশিতে চিৎকার ক'রে উঠলো। মিস্টার আর্নশ ওভারকোটের পোঁটলাটা কোলে নিয়ে ধপাস ক'রে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। বাচ্চাদের আনন্দে যোগ দিলেন তিনিও। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ওহ্! শেষের পথটুকু মনে হচ্ছিলো আর শেষ করতে পারবো না!'

এরপরই ঘটলো চমকে ওঠার মতো ঘটনাটা। আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, তাঁর কোলের পোঁটলাটা নড়ে চড়ে সোজা হয়ে উঠছে। পোঁটলাটা খুলে ফেললেন মিস্টার আর্নশ। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, 'দেখ! প্রাণ বেরিয়ে গেছে আমার একে বয়ে আনতে। এত কষ্ট আমি আর করিনি জীবনে। তবু ঈশ্বরের উপহার হিশেবেই একে গণ্য করতে হবে আমাদের।'

আমরা সবাই এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়লাম। মিস ক্যাথির মাথার ওপর দিয়ে আমি দেখলাম; নোংরা, কালো-চুল একটা ছেলে বসে আছে মনিবের কোলে। হাঁটতে এবং কথা বলতে পারার মতো যথেষ্ট বড় সে। সত্যিকথা বলতে কি চেহারা দেখে মনে হলো ক্যাথরিনের চেয়েও বড় ও বয়েসে। মনিব ওকে কোল থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতেই সে ভীতসন্ত্রস্ত চোখে তাকাতে লাগলো চারদিকে। অস্ফুট স্বরে কিছু বললো। আমরা একটা বর্ণও বুঝলাম না তার কথার। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কী করবেন এঁরা এই নোংরা, অচেনা বাচ্চাটাকে নিয়ে?

মিসেস আর্নশ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন ওকে দেখে।

'কী বলে তুমি জিপসী ছোঁড়াটাকে নিয়ে এলে আমার বাড়িতে!?' ফেটে পড়লেন তিনি। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? কী করবে একে দিয়ে?'

এই সব চিৎকার চেঁচামেচির জবাবে মিস্টার আর্নশ ব্যাখ্যা করলেন, ছেলেটার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে, ওকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে চান। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, লিভারপুলের রাস্তায় ছেলেটাকে

দেখতে পান তিনি, আশ্রয়হীন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরতে বসেছিলো। তাঁর জানা কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে না। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি ওর বাবা মায়ের খোঁজ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ বলতে পারেনি কে তার বাবা বা মা বা কোথেকে সে এসেছে। তখন তিনি ঠিক করেন ছেলেটাকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন। ওকে ওভাবে ফেলে আসার কথা তিনি ভাবতে পারেননি।

মিসেস-আর্নশ শান্ত হলেন না এ ব্যাখ্যা শুনে। গজ গজ ক'রে চললেন তিনি। মিস্টার আর্নশ তাকালেন আমার দিকে।

'এলেন, ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে গোসল করাও,' বললেন তিনি, 'তারপর পরিষ্কার কিছু একটা পরিয়ে শুইয়ে দিও বাচ্চাদের সঙ্গে।'

হিণ্ডলে আর ক্যাথি এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো বাবা মায়ের ঝগড়া। এবার ওরা দু'জনই বাবার পকেট হাতড়াতে শুরু করলো ওদের জন্যে যেসব উপহার আনবেন তিনি বলে গিয়েছিলেন সেগুলোর খোঁজে। হিণ্ডলে যে জিনিসটা বের ক'রে আনলো সেটা ফিড্‌ল নয়, তবে দেখে বোঝা যায় এককালে ওটা ফিড্‌ল ছিলো। হিণ্ডলের বয়েস তখন চোদ্দ। তা সত্ত্বেও সাধের ফিড্‌লের ঐ দুরবস্থা দেখে সে কেঁদে ফেললো একেবারে। আর ক্যাথি কিছুই পেলো না বাবার পকেটে। অচেনা ছেলেটার খবরদারী করতে গিয়ে উনি চাবুকটা হারিয়ে ফেলেছেন শুনে ভীষণ হয়ে উঠলো ওর চেহারা। ছেলেটার কাছে গিয়ে তার গায়ে থুতু দিলো সে। মিস্টার আর্নশ কষে এক চড় লাগিয়ে দিলেন মেয়ের গালে ভদ্র আচরণ শেখানোর জন্যে।

আমি ছোঁড়াকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। গোসল করিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে তাকে নিয়ে গেলাম দোতলায়। বাচ্চারা ওর সাথে শোয়া দূরে থাক ওকে ঘরে ঢুকতে দিতেই রাজি হলো না। আমিও চাইছিলাম না ও ঘুমাক ওদের সাথে। তাই একটা কম্বল দিয়ে ভালো ক'রে মুড়ে ওকে শুইয়ে দিলাম সিঁড়ির পাশে। আশা করলাম পরদিন ও দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু রাতে কখন যেন ছেলেটা গিয়ে হাজির হলো মিস্টার আর্নশর দরজায় এবং শুয়ে রইলো ওখানেই। পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরোনোর সময় মনিব ওকে দেখলেন। ওহ্, তারপর সে যে কী হৈ-চৈ!

'ছেলেটা এখানে এলো কী ক'রে?' ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন মিস্টার আর্নশ।

আমি বললাম কারণটা। শুনে এমন রেগে গেলেন তিনি যে তক্ষুণি আমাকে নিষ্ঠুরতার দায়ে বের ক'রে দিলেন বাড়ি থেকে।

কয়েকদিন পরে আমি ফিরে এলাম। কারণ, জানতাম উনি চিরতরে বের ক'রে দেননি, রাগ পড়ে গেলে আবার বাড়িতে ঢুকতে দেবেন আমাকে। ঠিক তাই। আমি ফিরে আসায় বিরক্ত হলেন না মনিব, বরং মনে হলো একটু যেন খুশিই হয়েছেন। দেখলাম ছেলেটা বহাল তবিয়তে আছে বাড়িতে। মিস্টার আর্নশ তাঁর মারা যাওয়া এক ছেলের নামে নামকরণ করেছেন তার—হীথক্লিফ। শুধু এটুকুই, আগে বা পরে

আর কিছু নেই। মিস ক্যাথির সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়ে গেছে এর মধ্যে। তবে হিণ্ডলে সেই প্রথম দিনের মতো এখনো ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সুযোগ পেলেই চিমটি কাটতে, নয় তো চড়টা লাথিটা মারতে ছাড়ে না। আমিও ওকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। এবং হিণ্ডলের মতো অতটা না হলেও, দুর্ব্যবহারই করতে লাগলাম।

সম্ভবত এমন ব্যবহার পেয়ে অভ্যস্ত বলেই হীথক্লিফ ধৈর্যের সঙ্গে নীরবে সইতে লাগলো সব। হিণ্ডলে যতই চড়, কিল বা লাথি দিক না কেন ও একটা শব্দও করে না, কাঁদা দূরে থাক। আমি চিমটি কাটলে ও স্রেফ লম্বা ক'রে শ্বাস নিয়ে সংকুচিত দৃষ্টিতে তাকায়, যেন অসাবধানে নিজে নিজে ব্যথা পেয়ে গেছে। হিণ্ডলের আচরণে খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মিস্টার আর্নশ। হিণ্ডলে হীথক্লিফকে মেরেছে টের পেলেই তিনি ছেলেকে শাস্তি দেন আর আদর করেন পথের ছেলেটাকে। অবশ্য এটাও ঠিক, হিণ্ডলেই সব সময় দোষ করে। মার খেয়ে সামান্য রাগও করে না হীথক্লিফ। ক্যাথিও কম দুষ্টু না। হীথক্লিফের-সঙ্গে ওর ভাব যেমন আছে তেমন ও লাগেও ছেলেটার পেছনে। মিস্টার আর্নশ ওর ভাবটা দেখতে না পেলেও পেছনে লাগাটা দেখতে পান ঠিকই। যে কারণে মেয়েকেও তিনি শাসন করতে শুরু করেছেন কারণে অকারণে। কয়েক দিনের মধ্যে সবার মনে হতে লাগলো নিজের ছেলে মেয়ের চেয়ে তিনি কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটিকেই বেশি পছন্দ করছেন, আদর করছেন।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, প্রথম থেকেই একমাত্র মনিব ছাড়া বাড়ির আর সবার কুনজরে পড়ে হীথক্লিফ। ও আসার দু'বছরের মধ্যে মারা গেলেন মিসেস আর্নশ। এর মধ্যে হিণ্ডলে বাপকে রুক্ষ, বদমেজাজী এবং ওর ওপর বিরূপ একজন হিশেবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মিস্টার আর্নশ এমন ব্যবহার করেন, যেন হীথক্লিফই তাঁর প্রিয় পুত্র আর হিণ্ডলে আশ্রিত। ফলে দিন যত গড়াতে লাগলো হিণ্ডলে ততই হীথক্লিফকে ঘৃণা করতে লাগলো। আমি এখনো ভেবে পাই না মনিব কেন এই অকৃতজ্ঞ ছেলেটাকে এত ভালোবাসতেন। কখনোই ওকে মিস্টার আর্নশের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা প্রকাশ করতে দেখিনি।

মিসেস আর্নশ মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই হামজ্বরে পড়লো বাচ্চারা। হীথক্লিফও। আমার ওপর দায়িত্ব পড়লো ওদের দেখা শোনার। এই সময় হীথক্লিফের ওপর একটু মায়া পড়লো আমার। তিনজনের ভেতর ওরই অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। দিনরাত ওর সেবা করতে হয় আমাকে। কিন্তু, বললে বিশ্বাস করবেন না, কখনো ওর ভেতর কোনোরকম অবাধ্যতা, অসহিষ্ণুতা বা অনুযোগ লক্ষ করিনি। নীরবে ও সহ্য করে অসুখের কষ্ট। আর মনে হয় সেবা করছি বলে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও। হিণ্ডলে আর ক্যাথি ঠিক তার উল্টো। অসুখে খিটখিটে হয়ে গেছে মেজাজ। যতই সেবা করি না কেন ওরা খুশি হয় না কিছুতেই। ফলে

স্বাভাবিক ভাবেই আমি ওদের চেয়ে হীথক্লিফকে বেশি পছন্দ করতে শুরু করলাম।

বাচ্চারা ভালো হয়ে ওঠার কিছুদিনের মধ্যে খেয়াল করলাম বুড়িয়ে যাচ্ছেন মিস্টার আর্নশ। অসুখ বিসুখ কিছু নেই, অথচ দুর্বল হয়ে পড়ছেন দ্রুত। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে চলাফেরা করতেও প্রায় অক্ষম হয়ে পড়লেন। সারাদিন চেয়ারে বসে থাকেন। হাঁটাচলা যদি একান্ত করতেই হয় করেন লাঠিতে ভর দিয়ে। নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেই যেন তিনি আরো বদমেজাজী হয়ে উঠলেন। বিশেষ ক'রে হীথক্লিফকে কেউ কিছু বললে একেবারে সহ্যই করতে পারেন না। তাঁর ধারণা, যেহেতু তিনি হীথক্লিফকে পছন্দ করেন সেহেতু আর সবাই তাকে অপছন্দ করে, আঘাত দেয়ার চেষ্টা করে।

এসময় দু'তিনবার নিজেকে সামলাতে না পেরে হিণ্ডলে বাবার সামনেই মেরে বসে হীথক্লিফকে। ওহ্, তখন মিস্টার আর্নশর অবস্থা যদি দেখতেন! চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, হিণ্ডলেকে মারবেন হাতের লাঠি দিয়ে। তারপরই টের পান আগের সেই শক্তি আর নেই তাঁর শরীরে, দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছেন না ঠিক মত। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকেন তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে একদিন মিস্টার আর্নশ নিজেই নিজেকে খুন ক'রে ফেলবেন এই আশঙ্কা ক'রে অবশেষে একদিন হিণ্ডলেকে পাঠিয়ে দেয়া হলো শহরে, কলেজে পড়বার জন্যে, যদিও ওর বাবার মনে তখন এই ধারণা বদ্ধমূল যে, ওকে দিয়ে কোনোদিন কিছু হবে না।

হিণ্ডলে চলে যাওয়ার পর আমার আশা হলো, এবার আমরা একটু শান্তির মুখ দেখবো। কিন্তু তা হলো না। দু'জন মানুষের কারণে—মিস ক্যাথি আর চাকর জোসেফ। জোসেফ, আমার মনে হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ বাইবেল-পড়ুয়া লোক। ও সব সময় ঠিক পথে, আর বাকি সবাই ভুলপথে চলছে এটা প্রমাণ করার জন্যে ও বাইবেল থেকে অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত ক'রে শোনাতো। এই ধর্মপ্রীতির কারণে মিস্টার আর্নশ জোসেফকে পছন্দ করতেন। এবং ভদ্রলোক যত শক্তিহীন হয়ে পড়ছিলেন তার ওপর জোসেফের প্রভাব ততই বাড়ছিলো। প্রতিনিয়ত সে মনিবের কানে কানে শোনাতো তাঁর আত্মার পরিশুদ্ধির কথা, এবং তা করার জন্যে ছেলে মেয়েদের কীভাবে কড়া শাসনে রাখতে হবে সে কথা। ছেলে সম্পর্কে তাঁর ধারণা যাতে আরো খারাপ হয় সেজন্যে নানাভাবে চেষ্টা করতো সে, নানা কথা বলতো। তাছাড়া রাতের পর রাত বানিয়ে বানিয়ে নানা গল্প শোনাতো ক্যাথরিন আর হীথক্লিফ সম্পর্কে। একটা ব্যাপারে সে সতর্ক থাকতো, গল্পগুলো এমনভাবে বানাতো যাতে সব সময় সব দোষ চাপে ক্যাথরিনের ওপর। হীথক্লিফের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে তা সে জানতো।

ক্যাথরিন সম্পর্কে জোসেফ মনিবকে বাড়িয়ে বলতো সন্দেহ নেই। তবে দু'এক সময় মেয়েটা সত্যিই অভিযোগ করার কারণ যে ঘটাতো না তা নয়। ভীষণ চঞ্চল ছিলো সে। যখন যা মনে হতো তা-ই করতো। সকালে তার ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে এসেই বাড়ির সবার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে শুরু করতো যেন। রাতে আবার ওপরে নিজের ঘরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত চলতো সে পরীক্ষা। মুহূর্তের জন্যে শান্তি দিতো না কাউকে। এত ফূর্তি যে কোত্থেকে আসতো ওর ভেবে পেতাম না আমরা। মুখটা বন্ধ থাকতো না কখনো। হাসছে, গাইছে, আর কিছু না পেলে শুধু শুধু কথা বলছে। সুযোগ পেলেই এর ওর পেছনে লাগছে। তবে একটা ব্যাপার ঠিক, ওর হাসিটা এমন সুন্দর ছিলো! আর, যত যা-ই হোক, আমি এখনো বিশ্বাস করি, ও কারো ক্ষতি করার জন্যে এসব দুষ্টুমি করতো না। অনেক সময়ই দেখেছি, কখনো আমি ধৈর্য হারালে ও সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুমি বন্ধ ক'রে জড়িয়ে ধরতো, আদর ক'রে শান্ত করার চেষ্টা করতো আমাকে।

হীথক্লিফের খুব ভক্ত ছিলো ক্যাথি। ওর জন্যে সবচেয়ে কঠিন যে শাস্তির কথা আমরা ভাবতে পারতাম তা হচ্ছে হীথক্লিফের সাথে ওকে দেখা করতে না দেয়া। ও আমাদের না যতটুকু জ্বালাতো তার চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি জ্বালাতো ছেলেটাকে। তা সত্ত্বেও আমার মনে হতো আশ্চর্য এক বন্ধন যেন গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। হীথক্লিফ হাসি মুখে সইতো ওর সব অত্যাচার।

খেলার সময় সর্দার হওয়ার দিকেই ক্যাথির ঝোঁক থাকতো বেশি। আদেশ নির্দেশ দিয়ে অস্থির ক'রে তুলতো সঙ্গীদের। কেউ ওর কথা না শুনলে হাত চালাতো নির্দ্বিধায়।

বাবাকে নানাভাবে উত্যক্ত করতো ও। তার অসুস্থতা বা দুর্বলতার কথা ভাবতো না কখনো। ভদ্রলোক যা অপছন্দ করতেন তা-ই সে বেশি ক'রে করতো—দেখাতে চাইতো হীথক্লিফ তাঁর চেয়ে ওরই বাধ্য বেশি। ও যা বলতো তা-ই করতো ছেলেটা, কিন্তু মিস্টার আর্নশর কথা ও ইচ্ছে হলে শুনতো ইচ্ছে না হলে শুনতো না।

সারাদিন যতভাবে সম্ভব বিরক্ত ক'রে কখনো কখনো ক্যাথি রাতে যেতো বাবার কাছে। নরম ক'রে, সুন্দর ক'রে আহ্লাদ ক'রে কথা বলে তাঁর মন গলানোর আশায়।

'না, ক্যাথি,' ভদ্রলোক বলতেন, 'তোমাকে আমি আদর করতে পারবো না। তুমি তোমার ভাইয়ের চেয়েও খারাপ। যাও, প্রার্থনা করোগে; ঈশ্বরের ক্ষমা চাওগে, তাতে হয়তো কাজ হবে।'

অবশেষে সেদিন এলো যেদিনটা জাগতিক সব ঝামেলা চুকিয়ে দিলো মিস্টার আর্নশর। অক্টোবর মাস সেটা। সন্ধ্যায় আগুনের সামনে বসে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। ওখানে ঐ অবস্থায়ই নীরবে চলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছিলো। তীব্র শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসছিলো চিমনির ভেতর দিয়ে। ঠাণ্ডা ছিলো না, তবু ঝড়ের কারণে ঘরেই ছিলাম আমরা সবাই। আগুন থেকে সামান্য দূরে বসে উল বুনছি আমি। জোসেফ চাকরদের টেবিলে বসে বাইবেল পড়ছে। মিস ক্যাথির শরীর ভালো না, সে জন্যে ও চুপচাপই রয়েছে। বাবার হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে। হীথক্লিফ শুয়ে আছে ওর কোলে মাথা রেখে

সেদিনকার সে দৃশ্য আমার মনে আছে স্পষ্ট। ঘুমিয়ে পড়ার আগে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মনিব। ক্যাথরিনকে শান্ত দেখে খুশি তিনি।

'সব সময় তুমি এমন লক্ষী হয়ে থাকো না কেন, ক্যাথি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস্ করলেন মিস্টার আর্নশ।

'তুমি কেন সব সময় আমাকে আদর করো না?' মুখ তুলে মৃদু হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলো ক্যাথি। তারপরই ও তাঁর হাতে চুমু খেয়ে বললো, 'চোখ বোজো, বাবা, আমি গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

বাধ্য ছেলের মতো চোখ বুজলেন মিস্টার আর্নশ। গুনগুন ক'রে গান গাইতে লাগলো ক্যাথি। শুনতে শুনতে শিথিল হয়ে গেল তাঁর দেহ। হাতটা খসে পড়লো ক্যাথির হাত থেকে। মুখ ঝুলে পড়লো বুকের ওপর। ফিস ফিস ক'রে আমি থামতে বললাম ক্যাথিকে, পাছে আবার ও জাগিয়ে দেয় অসুস্থ মানুষটাকে। এর পর পুরো আধ ঘন্টা আমরা বসে রইলাম চুপচাপ। অবশেষে উঠে দাঁড়ালো জোসেফ।

'যাই, মনিবকে উঠিয়ে শুইয়ে দিয়ে আসি,' বলে এগিয়ে এলো সে। ডাকলো মিস্টার আর্নশকে। উঠলেন না তিনি। এবার কাঁধে হাত রেখে আস্তে ঠেলা দিলো জোসেফ। নড়লেনও না মিস্টার আর্নশ। জোসেফ টেবিল থেকে মোমবাতি তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো মনিবের দিকে।

চেহারাটা বদলে গেল জোসেফের। টেবিলের কাছে ফিরে এসে বাতিটা নামিয়ে রেখে ফিস ফিস ক'রে বললো, 'ক্যাথি, হীথক্লিফ, যাও তোমরা শুয়ে পড়োগে।'

'আগে বাবাকে শুভ-রাত্রি জানিয়ে নেই;' বললো ক্যাথি। এবং কেউ কিছু বলার আগেই বাবার গলা জড়িয়ে ধরলো ও। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো সত্যটা। চিৎকার ক'রে উঠলো, 'মারা গেছে! হীথক্লিফ! হীথক্লিফ, বাবা আর নেই!'

দু'জনই এরপর ভেঙে পড়লো হৃদয়ভাঙা কান্নায়।

চার

তিন বছর পর ওয়াদারিং হাইটসে ফিরলো মিস্টার হিণ্ডলে আর্নশ বাবার

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেয়ার জন্যে।) এখন ও যুবক। ও ফিরতেই পাড়াপ্রতিবেশীদের ভেতর, এবং বাড়িতেও কানাঘুষা শুরু হলো। কারণ সঙ্গে একটা বউ নিয়ে এসেছে ও। এমন এক বউ যার কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি।

আমাদের কখনো বলেনি হিণ্ডলে কে মেয়েটা, কোথায় ওর জন্ম, কে ওর বাবা। মেয়েটার নাম ফ্রান্সেস। সম্ভবত বলার মতো তেমন কোনো পরিচয় বা টাকা পয়সা ওর নেই, নইলে হিণ্ডলে ওর বাবাকে জানাতো এ বিয়ের কথা।

মেয়েটা রোগা, তবে অল্প বয়েসী এবং দেখতে এক হিশেবে সুন্দরীই। হিরের মতো ঝকঝক ক'রে ওর চোখ দুটো। অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান ব্যাপারটাকে ঘৃণা করে ও ভীষণভাবে। কারণ কী আমি জিজ্ঞেস করায় ও জবাব দিলো, 'আমি—আমি জানি না। মৃত্যুকে ভীষণ ভয় আমার।'

শিগগিরই মারা যাবে এটা আমার মনে হয়নি ওকে দেখে। তবে খেয়াল করলাম, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় রীতিমতো হাঁপায় ও। তাছাড়া লক্ষ করেছি, মাঝে মাঝে ভীষণ কাশে। তখন আমার বয়েস অল্প, এসবের তাৎপর্য কী বুঝতে পারিনি।

তিন বছরে অনেক বদলেছে হিণ্ডলে। আগের চেয়ে একটু রোগা হয়েছে, আর হয়েছে লম্বা। এখন ও পোশাক-আশাক পরে অন্যরকম, কথা বলে অন্যভাবে। বাড়িতে ফিরেই আমাকে আর জোসেফকে ডেকে জানিয়ে দিলো, এখন থেকে আমাদের রান্নাঘরের পেছনের ছোট্ট ঘরটায় দিন কাটাতে হবে, আর মূল রান্নাঘরটা ছেড়ে দিতে হবে ওকে আর ওর স্ত্রীকে। ওর স্ত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে ঘরটা। পছন্দ হওয়ার মতোই ঘর ওটা। বিরাট আয়তন, চলে ফিরে বেড়ানোর জন্যে প্রচুর জায়গা; শাদা ধবধবে মেঝে; ফায়ারপ্লেসটাও বিশাল। এমন ঘর কার না পছন্দ?

ওয়াদারিং হাইটসে তৈরি একটা বোন আছে দেখেও খুব খুশি হলো ফ্রান্সেস। ক্যাথরিনের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব হয়ে গেল ওর। দু'জন ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে, খেলাধুলা করে, একসাথে ছুটে বেড়ায় মাঠে বাগানে। কোনো উপলক্ষ পেলেই হলো, ক্যাথরিনকে কিছু না কিছু উপহার দেবেই ফ্রান্সেস। কিন্তু বেশিদিন চললো না এভাবে। আস্তে আস্তে বাড়ির সবার ওপর, সবকিছুর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলো সে। হিণ্ডলেরও মেজাজ আস্তে আস্তে খচে যেতে লাগলো—না, স্ত্রীর ওপর নয় স্ত্রীর যারা অপছন্দ তাদের ওপর।

ফ্রান্সেসের কুনজরে প্রথম যে পড়লো সে হীথক্লিফ। যখন সে হিণ্ডলেকে বললো ছেলেটাকে কেমন অপছন্দ তার, তখনই হিণ্ডলের মনে পড়ে গেল এক সময় হীথক্লিফকে সে কেমন ঘৃণা করতো সেকথা। ছেলেটাকেও জানিয়ে দিলো, এখন থেকে সে চাকরদের সাথে থাকবে; লেখাপড়ার আর দরকার নেই, চাকরদের সাথে কাজ করবে খামারে।

প্রথম প্রথম বিনা প্রতিবাদে এসব মেনে নিলো হীথক্লিফ। কারণ লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলেও ক্যাথি ওকে শিখিয়ে দেয় সে শিক্ষকের কাছে নতুন যা শেখে তা।

তাছাড়া ক্যাথি খামারে ওর সঙ্গে কাজও করে খেলার ছলে। ওরা দু'জন কীভাবে বড় হচ্ছে, কেমন আছে, কী করছে, এসব দিকে মনোযোগ দেয়ার অবকাশ হয় না হিণ্ডলের। ওরা রোববার দিন গির্জায় যাচ্ছে কি না তা-ও ও খেয়াল করে না। অবশেষে একদিন গির্জার পাদ্রী স্মরণ করিয়ে দিলেন বোনের প্রতি ওর কর্তব্যের কথা। এর পর সাহস পেয়ে জোসেফও সময়ে অসময়ে মনে করিয়ে দিতে লাগলো ক্যাথরিনের প্রতি নজর রাখার ব্যাপারটা। তাতেও যে হিণ্ডলের খুব একটা বোধোদয় হলো তা নয়, তবে এর পর থেকে সে অভিযোগ পেলেই বা গোলমাল কিছু চোখে পড়লেই জোসেফকে ডেকে হীথক্লিফকে পেটানোর নির্দেশ দেয়। ক্যাথরিনকেও শাস্তি দিতে ছাড়ে না—কড়া ধমক লাগায়, নয় তো না খেতে দিয়ে ওর ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

ক্যাথরিন আর হীথক্লিফের একটা বড় আনন্দ ছিলো সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলে মাঠে চলে যাওয়া, এবং সেখানে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা। প্রায়ই ওরা এটা করতো, পরে যে শাস্তি পেতে হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতো না। এভাবে বাধা বন্ধনহীন দুটো বনচর প্রাণীর মতো বেড়ে উঠছিলো দু'জন।

এক রোববার সন্ধ্যায় কিছু একটা হৈ-চৈ করার কারণে বসার ঘর থেকে বের ক'রে দিলো ওদের হিণ্ডলে। কিছুক্ষণ পর খাওয়ার জন্যে ডাকতে গিয়ে দু'জনের এক জনকেও আমি পেলাম না। সারা বাড়িতে খুঁজলাম; উঠানে, আস্তাবলে খুঁজলাম। মনে হলো স্রেফ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ওরা। হিণ্ডলে ভয়ানক রেগে গেল শুনে।

আমাকে নির্দেশ দিলো যেন এক্ষুণি সবগুলো দরজায় তালা মেরে দেই; আর বদমাশ দুটো এলে যেন ঢুকতে না দেই বাড়িতে।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই শুতে চলে গেল। কিন্তু আমি একা বসে রইলাম জেগে। খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো আমার। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। আমার ঘরে ঢুকে জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ফটকের দিকে তাকিয়ে। মনিব বারণ করলেও ওরা এলে ওদের বাড়িতে ঢুকতে দেবো বলে ঠিক করেছি আমি।

অবশেষে, রাত যখন গভীর, টিমটিমে একটা লণ্ঠন দেখতে পেলাম ফটকে। মাথায় একটা স্কার্ফ বেঁধে ছুটে গেলাম আমি গেটের কাছে, যাতে ওরা শব্দ ক'রে মিস্টার আর্নশর ঘুম না ভাঙাতে পারে। কিন্তু গিয়ে দেখি, হীথক্লিফ একা দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়ে গেলাম আমি। একা কেন ও?!

'মিস ক্যাথরিন কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?'

'থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে,' ও বললো। 'আমিও থাকতাম। কিন্তু ওরা আমাকে থাকতে বলার ভদ্রতাটুকুও দেখালো না তো আর কী করবো, চলে এলাম।'

'কপালে দুঃখ আছে তোমার!' আমি বললাম। 'তুমি—তোমাকে ... বাড়ি

থেকে না তাড়ানো পর্যন্ত তোমার শান্তি হবে না বুঝতে পারছি। থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে গেছিলে কী কারণে শুনি?'

'আগে আমাকে ভেজা কাপড়গুলো ছাড়তে দাও। তারপর সব বলছি।'

আমি ওকে সাবধান ক'রে দিলাম যেন বেশি শব্দ ক'রে মনিবকে না জাগিয়ে দেয়। ঘরে ঢুকে ভেজাকাপড় ছেড়ে এলো হীথক্লিফ। তারপর বলতে লাগলো:

'এখান থেকে বেরিয়ে যে দিকে মন চায় হাঁটতে শুরু করেছিলাম আমি আর ক্যাথি। হঠাৎ খেয়াল করলাম থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জের বাতি দেখা যাচ্ছে সামনে। আমরা ভাবলাম চুপিচুপি গিয়ে দেখবো লিনটনদের ছেলে মেয়েরাও আমাদের মতো রোববারের সন্ধ্যাগুলো সারাদিন দুষ্টুমি করার শাস্তি হিশেবে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কাটায় কিনা, আর ওদের বাবা মা ওদের ওখানে রেখে আরামসে আগুনের সামনে বসে খাওয়া দাওয়া করে কিনা।'

'লিনটনদের ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো তোমাদের চেয়ে,' আমি বললাম, 'তোমাদের মতো শাস্তি ওদের পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'বাজে কথা এসব, নেলি! আমরা কী দেখেছি শোনো; শুনলেই বুঝতে পারবে। বেড়ার ভাঙা একটা অংশ দিয়ে আমরা ঢুকে পড়েছিলাম গ্র্যাঞ্জে। বাড়ির একেবারে কাছে পৌঁছে ওদের বসার ঘরের জানালার নিচে রাখা একটা ফুলের টবে উঠে উঁকি দিলাম। ঐ জানালা দিয়েই আলো আসছিলো। পর্দা টানা ছিলো না জানালাটার। উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম ভেতরটা—আহ! কী সুন্দর! লাল গালিচা পাতা ঘরে, চেয়ারগুলোও লাল মখমলে মোড়া। মিস্টার ও মিসেস লিনটন ওখানে ছিলো না। এডগার আর ওর বোন ইসাবেলা শুধু ছিলো ঘরে। অমন ঘরে ওদের খুশি থাকার কথা তাই না? আমরা হলে তো স্বর্গে আছি মনে করতাম। আন্দাজ করো তো তোমার ঐ ভালো ছেলে মেয়েরা কী করছিলো? ইসাবেল্লার বয়েস হবে এগারো, ক্যাথির চেয়ে বছরখানেকের ছোট। ঘরের ওপ্রান্তে শুয়ে সে চিৎকার ক'রে কাঁদছে, আর এপ্রান্তে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে এডগার। টেবিলের মাঝখানে রাখা একটা ছোট্ট খেলনা কুকুর।

'দেখেই বুঝতে পারলাম কুকুরটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিলো ওরা। হেসে উঠলাম আমরা। না হেসে কী করবো? কেমন বিচ্ছিরি ব্যাপার ভাবো তো! ক্যাথি যেটা চায় আমি কক্ষনো সেটা নিতে চাই? আমরা কক্ষনো নিজেদের ভেতর অমন ঝগড়া করি না, মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদিও না। কিন্তু ওরা করছিলো—'

'হয়েছে, হয়েছে!' বাধা দিয়ে আমি বললাম, 'ক্যাথরিন কোথায় তা কিন্তু এখনো বলোনি তুমি।'

'বলছি,' বললো হীথক্লিফ। 'ওদের বোকামি দেখে আমরা হেসে উঠেছিলাম বলেছি। বেশ জোরেই হেসেছিলাম—বিশেষ ক'রে ক্যাথি। সেই হাসি শুনে সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে গেল দু'জনের। জানালার কাছে ছুটে এলো ওরা, তারপরই

চিৎকার: "মা! মা! বাবা! ও মা, তাড়াতাড়ি এসো!" '

'এবার আমরা ওদের ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যে ভীষণ জোরে বিকট শব্দ ক'রে উঠলাম। তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম ফুলের টব থেকে; কারণ শব্দ পেয়েছি, সামনের দরজা খুলছে কেউ; এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেগে পড়া উচিত। ক্যাথির হাত ধরে ছুটতে শুরু করলাম আমি। কিন্তু একটুখানি যেতে না যেতেই হঠাৎ পড়ে গেল ক্যাথি। "পালাও, হীথক্লিফ, পালাও!" ফিসফিস ক'রে ও বললো। "ওরা কুকুর ছেড়ে দিয়েছে! বদমাশটা এখন আমার পা কামড়ে ধরে আছে।" হ্যাঁ, নেলি, ওর গোড়ালি কামড়ে ধরে ছিলো কুকুরটা! কিন্তু ও একটুও চিৎকার করেনি। কিন্তু আমি ক'রে উঠলাম। কসম খেয়ে একটা পাথর তুলে নিয়ে কুকুরটার দাঁতের মাঝখানে ঠুসে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম ক্যাথির পা। কিন্তু পারলাম না ছাড়াতে। বাতি হাতে এক চাকর এগিয়ে এলো চেঁচাতে চেঁচাতে, "ধরে থাক, স্কালকার! শক্ত ক'রে ধরে থাক!"

'চাকরটা এসে যখন দেখলো স্কালকার একটা মেয়েকে কামড়ে ধরে আছে তখন সে কুকুরটাকে সরিয়ে নিলো। ওর দাঁত থেকে তখন রক্ত ঝরে পড়ছে। ক্যাথিকে তুলে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল চাকরটা। ক্যাথির অবস্থা তখন শোচনীয়—ভয়ে যে না তা তো বুঝতেই পারছো—ব্যথায়। আমি এগোলাম লোকটার পেছন পেছন। শাসাতে লাগলাম, ক্যাথির কিছু হলে তাকে আস্ত রাখবো না আমি।

' "কী ধরেছে ও, রবার্ট?" দোরগোড়া থেকে চিৎকার করলো মিস্টার লিনটন।

' "ছোট্ট একটা মেয়েকে, স্যার," জবাব দিলো চাকরটা। "একটা ছেলেও আছে সাথে। ডাকাতরা বোধহয় ওদের জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলো, যাতে আমরা সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর দরজা খুলে দিতে পারে," তারপর পেছন ফিরে আমার উদ্দেশ্যে বললো, "চুপ, ডাকাতের চেলা! এর জন্যে তোকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, জানিস! মিস্টার লিনটন, স্যার, বন্দুকটা তৈরি রাখুন!"

' "নিশ্চয়ই ডাকাতরা টের পেয়েছে কাল আমি খাজনা আদায় করেছি," বললো মিস্টার লিনটন। "সব টাকা লুট করতে চেয়েছিলো। ওদের ভেতরে এনে দরজায় তালা মেরে দাও, রবার্ট। আর স্কালকারকে একটু পানি দাও খেতে।"

' "ওহ, মা মেরি!" এবার চিৎকার করলেন মিসেস লিনটন, "দেখ, দেখ! এইটুকুন ছোঁড়া এই কাজে এসেছে! ওহ!, চেহারা দেখেছো? যেন যমদূত। এক্ষুণি ওকে ফাঁসি দেয়া দরকার, জীবনে আর কোনো খারাপ কাজ তাহলে করতে পারবে না।"

'ক্যাথিকে নামিয়ে রেখে আমাকে আলোর নিচে টেনে নিয়ে গেল চাকরটা। ভীতু ছেলেমেয়ে দুটো এগিয়ে এলো পা টিপে টিপে। "সত্যিই কী বিদঘুটে চেহারা!" বললো ইসাবেলা। "তলকুঠুরিতে আটকে রাখো ওকে, বাবা!"

'আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওরা, এই সময় ক্যাথারিন সোজা হয়ে হেসে উঠলো হি-হি ক'রে। এডগার লিনটন তাকালো ওর দিকে এবং দেখেই চিনতে পারলো। "আরে! এ তো মিস আর্ন্‌শ!" মায়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফিস ফিস করলো সে, "আমি চিনি ওকে, গির্জায় দেখেছি।"

'মিসেস লিনটন বিশ্বাস করলো না ওর কথা। "মিস আর্ন্‌শ? দূর, দূর! আর কথা পেলি না, মিস আর্ন্‌শ আধাজংলী এক ছোঁড়ার সাথে এই রাত দুপুরে মানুষের বাড়িতে উঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে?" মহিলা একটু এগিয়ে ভালো ক'রে তাকালো। তারপরই সবিস্ময়ে চিৎকার, "আরে তাই তো!"

' "ভাইটা ওর কেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন!" বললো মিস্টার লিনটন। "এতক্ষণে বুঝেছি ছোঁড়াটা কে। একেই লিভারপুলের রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলো আর্ন্‌শ। ইণ্ডিয়ান না আমেরিকান না স্প্যানিশ কে জানে।"

' "যা-ই হোক বদ যে তাতে সন্দেহ নেই," বললো মিসেস। "ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকার যোগ্য নয়! শুনছো, লিনটন, কেমন কুৎসিত ভাষা ছোঁড়ার? আমার ছেলেমেয়েগুলো শুনে ফেললো।"

'আবার গালাগাল শুরু করলাম আমি। তখন রবার্টকে নির্দেশ দেয়া হলো আমাকে বের ক'রে দেয়ার। আমি চিৎকার করলাম, ক্যাথিকে ছাড়া আমি যাবো না। রবার্ট আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে এসে বের ক'রে দিলো দরজার বাইরে। লণ্ঠনটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, "যা পালা," তারপর দরজা বন্ধ করে দিলো।

'সেই জানালাটার পর্দা তখনো সরানো। আমি আবার ফুলের টবটার ওপর উঠে উঁকি দিলাম। ক্যাথরিন যদি আসতে চাইতো আর ওরা আটকে রাখতো আমি ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতাম ঐ জানালা।

'কিন্তু, দেখলাম ক্যাথরিন শান্ত হয়ে বসে আছে সোফায় আর মিসেস লিনটন তার শুশ্রূষা করছে। ইসাবেলা কয়েক টুকরো কেক দিলো ওকে। এডগার একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। পায়ের ক্ষত পরিষ্কার ক'রে বেঁধে দেয়ার পর মিসেস লিনটন ওর মাথা মুছে দিলো। বসিয়ে দিলো আগুনের সামনে একটা চেয়ারে। ওখানে বসে ও চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে স্কালকারের সঙ্গে ভাগ ক'রে কেক খেতে লাগলো। ও দিব্বি আছে দেখে আমি চলে এলাম।'

'দুঃখ আছে তোমার কপালে,' আমি বললাম। 'যত সহজে ভাবছো তত সহজে এর শেষ হবে না। সকাল হোক তারপর দেখো হিণ্ডলে কী করে তোমাকে।'

আমার কথা সত্যি প্রমাণিত হলো। সকালে সব শুনে একেবারে খেপে গেল হিণ্ডলে। তার রাগের আগুনে তেল পড়লো যখন বৃদ্ধ মিস্টার লিনটন এসে ছোট বোনের দিকে কীভাবে কেমন নজর রাখা উচিত সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা

দিয়ে গেলেন। এবার বড় নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করলো হিণ্ডলে। মারপিটের মধ্যে গেল না, হীথক্লিফকে ডেকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে শুধু জানিয়ে দিলো, এরপর আর কখনো যদি ক্যাথরিনের সাথে কথা বলতে দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেয়া হবে। মিসেস আর্নশ দায়িত্ব নিলো ক্যাথরিনের, বাড়ি ফেরার পর সে-ই দেখাশোনা করবে ওর। সে ঠিক করলো, আগের মতো হম্বিতম্বি আর করবে না, নরম ক'রে বুঝিয়ে শুনিয়ে চালাবে অবাধ্য মেয়েটাকে।

পাঁচ সপ্তাহ থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে থাকলো ক্যাথি। ক্রিসমাসের আগের দিন বিকেলে ফিরলো বাড়িতে। এর ভেতর ওর গোড়ালি পুরোপুরি সেরে উঠেছে, ওর স্বভাবও যেন ভালো হয়েছে অনেক। ফ্রান্সেস প্রায়ই যেতো ওকে দেখতে। সঙ্গে নিয়ে যেতো নতুন নতুন চমৎকার সব পোশাক। ওগুলো ওকে পরিয়ে বলতো, কী সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে! ক্যাথির স্বভাব বদলানোর যে পরিকল্পনা সে করেছিলো তার প্রথম পদক্ষেপ এটা। অবশেষে ক্যাথি যখন ফিরলো আমরা দেখলাম উদ্দাম, হ্যাটছাড়া, প্রায় জংলী একটা মেয়ের বদলে সুন্দর একটা কালো টাট্টু ঘোড়া থেকে নামছে সম্ভ্রান্ত এক তরুণী। চমৎকার একটা পালকের হ্যাটের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে তার বাদামী চুল।

মিস্টার হিণ্ডলে ওকে ধরে নামালো ঘোড়া থেকে। খুশি খুশি গলায় বলে উঠলো, 'আরে, ক্যাথি, তোকে যে চেনাই যাচ্ছে না! রীতিমতো সুন্দরী হয়ে উঠেছিস! একেবারে ভদ্রমহিলা! ইসাবেলা লিনটনের কোনো তুলনাই হতে পারে না ওর সঙ্গে, কী বলো, ফ্রান্সেস?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' জবাব দিলো হিণ্ডলের স্ত্রী! 'কিন্তু একটা ব্যাপারে সাবধান হতে হবে ক্যাথরিনকে, আগের মতো বুনো হয়ে ওঠা আর চলবে না। এলেন, মিস ক্যাথরিনের কী লাগবে দেখ।'

ওর মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিলাম আমি, সাবধানে, যাতে সুন্দর ক'রে বাঁধা চুল একটুও নষ্ট না হয়। তারপর খুলে নিলাম কোটটা। চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। কুকুরগুলো এসে ঘুর ঘুর করতে লাগলো আশপাশে। কিন্তু ক্যাথি একটাকেও ছুঁলো না, পাছে ওরা ওর কাপড় নোংরা ক'রে দেয়।

আমাকে আলতো ক'রে চুমু খেলো ও। ক্রিসমাসের কেক তৈরি করছিলাম বলে সারা গায়ে আমার ময়দা লেগে ছিলো, তাই আলিঙ্গন করলো না। এরপর চারদিকে তাকাতে লাগলো হীথক্লিফের খোঁজে। কিন্তু কোথাও দেখা গেল না ছেলেটাকে।

ক্যাথরিন না থাকায় ওর খোঁজ কেউ নিতো না। কোথায় আছে, কী করছে কেউ জানতো না। আমি কেবল মাঝে মাঝে বলতাম ওকে, গোসল ক'রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে। কখনো ও শুনতো কখনো শুনতো না। ওর বয়েসী ছেলেরা ক্বচিৎ

সাবান পানির প্রতি আগ্রহ বোধ করে। ফলে মুখটা ওর কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। তার ওপর বহুদিন ও নতুন কাপড় পায়নি। পুরনোটার ধুলো কাদায় এমন জীর্ণ দশা যে আর বলবার নয়। মাথার চুল লম্বা হতে হতে কাঁধ ছাড়িয়েছে, কতদিন যে তাতে চিরুনি পড়েনি কে বলবে। সুতরাং ও যা আশা করেছিলো—সেই পুরনো ওর মতোই অপরিচ্ছন্ন খেলার সাথীকে দেখবে—তার বদলে ঝকঝকে নতুন পোশাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্যাথিকে দেখেই ও লুকিয়েছে এক কোণে একটা কাবার্ডের আড়ালে।

'হীথক্লিফ নেই বাড়িতে?' জানতে চাইলো ক্যাথি। হাত থেকে দস্তানাজোড়া খুললো। অনেকদিন কোনো কাজ না ক'রে বাড়িতে থাকার ফলে চমৎকার শাদা হয়ে উঠেছে ওর আঙুলগুলো।

'হীথক্লিফ, এদিকে আসতে পারিস তুই,' চেঁচালো মিস্টার হিণ্ডলে। 'আর সব চাকরের মতো তোরও অধিকার আছে মিস ক্যাথরিনকে বাড়িতে স্বাগত জানানোর।'

মনিবের এ আহ্বান শুনেও বেরোলো না হীথক্লিফ। অবশেষে ক্যাথরিনই খুঁজে বের করলো ওকে। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো ওর গালে—অন্তত সাত আটটা, তারপর থামলো সে। পিছিয়ে এলো দু'-পা, এবং হেসে উঠলো খিল খিল ক'রে।

'উহ, কী কালো আর রাগী দেখাচ্ছে তোমাকে!' হাসতে হাসতে বললো ক্যাথি। 'আর কী অদ্ভুত! হাসি পেয়ে যাচ্ছে আমার! কিন্তু, হীথক্লিফ, কী ব্যাপার; আমাকে ভুলে গেছো তুমি?'

সংগত কারণ ছিলো প্রশ্নটা করার। ক্যাথরিনকে দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ দূরে থাক একটু নড়েনি বা একটা কথাও বলেনি হীথক্লিফ। একই সঙ্গে লজ্জা, সংকোচ আর অহঙ্কার ওর কালো মুখটাকে আরো কালো এবং গম্ভীর ক'রে তুলেছে।

'শেকহ্যাণ্ড কর, হীথক্লিফ,' বললো মিস্টার আর্নশ। 'কখনো কখনো এটা করা যায়, দোষের কিছু হয় না।'

'না, করবো না,' অবশেষে কথা বলতে পারলো ছেলেটা। 'আমাকে নিয়ে হাসবে আর আমি হ্যাণ্ডশেক করবো!'

ছুটে পালাতে গেল হীথক্লিফ। ধরে ফেললো ওকে ক্যাথরিন।

'আরে, তোমাকে নিয়ে হেসেছি নাকি!' বললো ও। 'হীথক্লিফ, শেকহ্যাণ্ড অন্তত করো! রেগে গেছ তুমি? কী পাগল, আমি তো হেসেছি তোমাকে অমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে বলে। মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে থাকলে এমন অদ্ভুত দেখাবে না। ইস কী ময়লা তোমার গায়ে!'

'ময়লা তো ধরেছো কেন?' ঝাঁঝের সঙ্গে বললো হীথক্লিফ। ক্যাথির হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলো সে। 'আমার খুশি আমি ময়লা থাকবো। ময়লা থাকতে

ভালো লাগে আমার, আমি ময়লাই থাকবো!'

বলে এক ছুটে ও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মনিব এবং মনিবগিন্নি খুব মজা পেলো এতে, কিন্তু ক্যাথরিন বুঝতেই পারলো না ওর কথায় এমন রেগে গেল কেন হীথক্লিফ।

আমি ক্যাথিকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম। কেকটা তন্দুরে ঢুকিয়ে বসার ঘর এবং রান্নাঘর গোছগাছ ক'রে বসে ভাবতে লাগলাম বৃদ্ধ মিস্টার আর্নশ যখন বেঁচে ছিলেন তখন ক্রিসমাসগুলো কেমন আনন্দে কাটতো আমাদের। মনিব আমাকে এক শিলিং দিতেন ক্রিসমাসের উপহার হিশেবে। আমার মনে পড়লো হীথক্লিফকে কতটা ভালোবাসতেন তিনি, কতটা দুশ্চিন্তা করতেন তাঁর মৃত্যুর পর ওর কী দুর্দশা হবে ভেবে। তাঁর দুশ্চিন্তা যে অমূলক ছিলো না তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বেচারি হীথক্লিফের জন্যে মায়া হতে লাগলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বুঝতে পারলাম, শুকনো মায়ায় কোনো লাভ হবে না, তার চেয়ে ওর অবস্থার যতটা সম্ভব উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। এই ভেবে উঠলাম আমি। ইতিমধ্যে জেনেছি, মিস ক্যাথরিন দাওয়াত ক'রে এসেছে লিনটনদের। কাল, মানে ক্রিসমাসের দিন দুপুরে আসবে তারা খেতে। ওদের সামনেও যাতে লজ্জায় না পড়ে সেজন্যে আজই হীথক্লিফকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শোভন ক'রে তুলতে চাইলাম আমি।

খোঁজাখুঁজি ক'রে আস্তাবলে পেলাম ওকে। মিস ক্যাথির নতুন টাট্টু ঘোড়াটাকে খাওয়াচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে নরম ক'রে বললাম, 'ঘরে এসো, হীথক্লিফ। মিস ক্যাথি আবার দেখার আগে তোমাকে সাফসুতরো ক'রে পরিপাটি বানিয়ে দেবো, চলো।'

আমার দিকে তাকালোও না ও, যা করছিলো ক'রে চললো চুপচাপ।

'কই, হীথক্লিফ, এসো।'

এবারও কোনো কথা বললো না ও। রেগে উঠলাম আমি।

'আসবে তুমি? তোমার গায়ে যে ময়লা, সাফ করতে কমপক্ষে আধঘণ্টা লাগবে!'

আমার কথা শুনেছে এমন কোনো ভাব দেখা গেল না হীথক্লিফের ভেতর। তবু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম প্রায় পাঁচমিনিট। শেষে বিরক্ত হয়ে চলে এলাম নিজের কাজে। ন'টা পর্যন্ত আস্তাবলে রইলো ও। তারপর সোজা গিয়ে ঢুকলো দোতলায় ওর ঘরে।

পরদিন ক্রিসমাস। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই হীথক্লিফ চলে গেল মাঠে। বাড়ির সবাই গির্জায় যাওয়ার আগে ও ফিরলো না। যখন ফিরলো, চেহারা দেখে মনে হলো ভালো মেজাজে আছে। চুপচাপ এদিক ওদিক একটু ঘোরাফেরা ক'রে পায়ে পায়ে আমার কাছে এসে বললো, 'এলেন, আমাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে দেবে? এখন থেকে আমি ভালো হয়ে চলবো।'

'অবশেষে সুমতি হয়েছে!' হেসে বললাম আমি। 'তাড়াতাড়ি করো তাহলে। দুপুরে লিনটনদের ছেলেমেয়েরা খেতে আসবে, তার আগেই তৈরি হয়ে নাও। ওরা এসে যেন দেখে লক্ষ্মী ছেলে তুমি।'

ওকে সাফসুতরো করতে শুরু করলাম আমি। একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল অমন করলে কেন? ক্যাথি খুব দুঃখ পেয়েছে। সকালে উঠে মাঠে চলে গেছ শুনে তো বেচারি কেঁদেই ফেললো।'

'আমিও কেঁদেছি কাল রাতে,' বললো হীথক্লিফ। 'ওর চেয়ে অনেক বেশি কাঁদার কারণ আছে আমার।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। 'আমার চেহারা আরো সুন্দর হলো না কেন? কেন এডগার লিনটনের মতো ধনীর ঘরে জন্ম হলো না আমার?'

'দূর, ছিচকাঁদুনে! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চুল আঁচড়ে নাও, আর মুখের ঐ গোমড়া ভাবটা সরাও, দেখবে তোমাকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে—'

এমনি কথাবার্তা বলতে বলতে আমি ওর হাতমুখ ধুইয়ে, গা মুছিয়ে, পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে, চুল আঁচড়ে দিলাম। আস্তে আস্তে বিষণ্ন, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিটা দূর হয়ে গেল ওর মুখ থেকে, হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটের কোণে। তখন সত্যিই তত খারাপ আর দেখাচ্ছে না ওকে।

একটু পরেই গাড়ির শব্দ ভেসে এলো উঠান থেকে। হীথক্লিফ জানালার কাছে ছুটে গেল, আমি দরজার কাছে। দেখলাম এডগার আর ইসাবেলা লিনটন নামছে তাদের পারিবারিক গাড়ি থেকে। আর আর্নশরা নামছে যার যার ঘোড়া থেকে। ক্যাথি দু'হাতে লিনটনদের দুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে বসার ঘরে ঢুকলো। আমি জানালার কাছে গিয়ে ঠেলা দিলাম হীথক্লিফকে। বললাম, 'যাও, দেখিয়ে এসো ওদের, কেমন সুন্দর লক্ষ্মী ছেলে তুমি।'

খুশি মনে রওনা হলো ও। কিন্তু এমনই কপাল, এক দিকের দরজা দিয়ে ও বসার ঘরে ঢুকেছে ঠিক তখন অন্যদিকের দরজা দিয়ে ঢুকেছে হিণ্ডলে আর্নশ। হীথক্লিফকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো সে।

'তুই এখানে কেন?' খেঁকিয়ে উঠলো হিণ্ডলে। 'ঘুর ঘুর করবি আর আমরা যখন অন্য দিকে তাকিয়ে থাকবো চুরি ক'রে কিছু একটা মুখে পুরবি, তাই তো? বেরো!'

'ও কিচ্ছু ছোঁবে না, স্যার,' আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললাম। 'সব কিছুর ন্যায্য ভাগ ওর পাওনা—'

'আমার হাতের ভাগ পাবে যদি সন্ধ্যার আগে ওকে নিচে দেখি,' চেঁচালো হিণ্ডলে। 'চুলের কী বাহার দেখ! মেয়েদের মন ভোলানোর চেষ্টা করছিস, বদমাশ? দাঁড়া, তোর ঐ চুল একবার ধরে নেই—টেনে আরো একটু লম্বা ক'রে দেবো।'

'এমনিতেই তো যথেষ্ট লম্বা আছে,' টিপ্পনি কাটলো এডগার লিনটন। 'আমার অবাক লাগে, ঐ চুল ওর মাথা ধরিয়ে দেয় না?'

এডগারের বয়েস তখন বছর ষোল, হীথক্লিফের বেশি হলে চোদ্দ। কিন্তু

এডগার যতই বড় হোক ওর কাছ থেকে অপমানকর কথা সহ্য করার ছেলে নয় হীথক্লিফ। হাতের কাছে প্রথম যে জিনিসটা পেলো—গরম আপেল-সসের একটা থালা—তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো ও সোজা এডগারের মুখ লক্ষ্য ক'রে।

প্রাণ বের হওয়া স্বরে চিৎকার ক'রে উঠলো এডগার। সে চিৎকার শুনে ছুটে এলো ইসাবেলা, ফ্রান্সেস আর ক্যাথরিন। হিণ্ডলে ছোঁ মেরে ধরে ফেললো হীথক্লিফের হাত। হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল ওপরে ওর ঘরে। ওখানে ছেলেটাকে চাবকে আধমরা ক'রে ফেললো সে।

আমি তাড়াতাড়ি একটা বাসন মোছার কাপড় নিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং ইচ্ছে ক'রেই গায়ের জোরে, যেন ব্যথা পায় এমন ক'রে ঘষে ঘষে পরিষ্কার ক'রে দিলাম এডগারের মুখ, নাক, গলা। ওর বোন কাঁদতে শুরু করলো *বাড়ি যাবো* বলে। ক্যাথি দাঁড়িয়ে রইলো বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে।

'উহ্! কী সাহস।' বললো ফ্রান্সেস।

'তোমার উচিত হয়নি ওর সাথে কথা বলা,' অবশেষে কথা বললো ক্যাথরিন। 'কাল থেকেই ওর মেজাজ ভালো না। কাজের ভেতর তোমাদের বেড়ানোটা মাটি হলো, আর ও খাবে পিটুনি। ওর পিটুনি খাওয়া আমি সইতে পারি না। ও যেদিন পিটুনি খায় সেদিন আমার গলা দিয়ে খাবার নামে না। কেন ওর সাথে কথা বলতে গেলে তুমি, এডগার?'

'আমি বলিনি,' আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করলো এডগার লিনটন। 'মা-কে আমি কথা দিয়ে এসেছি ওর সাথে একটা কথাও বলবো না। বলিওনি আমি।'

'হয়েছে, এবার তোমার কান্না থামাও,' রুক্ষ কণ্ঠে বললো ক্যাথি, 'মরে যাওনি তুমি। আর, ইসাবেলা, তুমি কাঁদছো কেন? তোমাকে তো কেউ কিছু বলেনি!'

'সব ঠিক আছে, বোসো তোমরা,' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো হিণ্ডলে। 'একেবারে শায়েস্তা হয়ে গেছে বদমাশটা। মিস্টার এডগার, আশাকরি এর পর থেকে আক্রান্ত হলে আইনটা নিজের হাতে তুলে নেবে—তাতে ক্ষুধা বাড়বে, যা খাবে অনেক বেশি মজা ক'রে খেতে পারবে।'

ক্যাথি নীরবে শুনলো কথাগুলো, কিছু বললো না। এডগার আর ইসাবেলা শান্ত হলো। ফ্রান্সেস কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে ভুলিয়ে দিলো একটু আগের বিপর্যয়ের কথা। একটু পরেই আমি খাবার দিলাম টেবিলে। ওরা বসলো খেতে। আমি পরিবেশন করতে লাগলাম। ক্যাথরিনের আচরণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখে অবাক হলাম একটু। তাহলে বোধহয় সত্যিই আগের মতো আর ভাবে না ও হীথক্লিফের কথা। ভাবলে খেতে বসলো কী ক'রে? কী ক'রে অমন হেসে হেসে কথা বলছে? আগে তো কোনোদিন দেখিনি হীথক্লিফ পিটুনি খেয়েছে আর ও অমন নির্বিকার আছে!

কিন্তু না, কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই দেখলাম খাবার মুখের কাছে তুলে আবার নামিয়ে আনলো ও। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম লাল হয়ে গেছে গাল আর চোখ দুটো ছলছল করছে। হাত থেকে কাঁটাচামচটা ফেলে দিলো ও। এবং ওটা তোলার ছলে টেবিলক্লথের তলে মুখ নিয়ে গিয়ে কান্না লুকালো। বেশ সময় নিলো ও কাঁটা চামচটা খুঁজে পেতে। আর সবার অনেক আগে খাওয়া শেষ ক'রে উঠে পড়লো ও।

সারাদিন ছটফট ক'রে কাটালো ক্যাথি। আর কেউ ওর এই ছটফটানি খেয়াল না করলেও আমি করলাম। কেন এই অস্থিরতা বুঝতে অসুবিধে হলো না আমার। হীথক্লিফের সাথে দেখা করতে চায় ও। কিন্তু ভাইয়ের, অতিথিদের চোখ এড়িয়ে সেটা সম্ভব নয়।

সন্ধ্যায় অতিথিদের নিয়ে নাচ-গানে মেতে উঠলো বাড়ির সবাই। ক্যাথরিন এসময় ভাইকে অনুরোধ করলো, যেন হীথক্লিফকে নিচে আসতে দেয়। যুক্তি দেখালো, ইসাবেলা লিনটনের কোনো নাচের সাথী নেই, হীথক্লিফ হতে পারবে ওর সাথী। কিন্তু হিণ্ডলে শুনলো না ওর কথা। শেষ পর্যন্ত আমাকে নাচতে হলো ইসাবেলার সাথে। কিছুক্ষণ পর গিমারটনের বাদকদল এলো। ক্রিসমাসের দিন এ এলাকার সব সম্ভ্রান্ত বাড়িতে পালা ক'রে বাজনা বাজায় ওরা, ক্যারল গায়; বাড়ির লোকেরা গলা মেলায় ওদের সাথে।

বাজনা শুরু হতেই ক্যাথরিন উঠে দাঁড়ালো!

'ওপর তলার সিঁড়ি থেকে সবচেয়ে ভালো শোনায় বাজনা। ওখান থেকে শুনবো আমি।' বলে সে উঠে গেল ওপর তলার সিঁড়িঘরে। কাউকে কিছু না বলে আমি চুপি চুপি চললাম ওর পেছন পেছন। সবাই তখন বাজনা শুনতে আর গান করতে ব্যস্ত, আমাদের অনুপস্থিতি নজরে পড়লো না কারো।

একেবারে ওপর তলার সিঁড়িতে পৌঁছেও থামলো না ক্যাথরিন। আরো ওপরে চিলেকোঠায় উঠে গেল ও। ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে হীথক্লিফকে। কোমল স্বরে ওকে ডাকলো ক্যাথি। প্রথমে কোনো সাড়া দিলো না হীথক্লিফ। তবে কয়েক বার ডাকার পর দিলো। একটু পরেই শুনলাম পুট পুট ক'রে আলাপ করছে দু'জন মন খুলে। আমি দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলাম। নিচে গান যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন উঠলাম ওদের সতর্ক করার জন্যে। কিন্তু চিলেকোঠার সামনে দেখলাম না ক্যাথরিনকে, তার বদলে, শুনলাম ভেতর থেকে ভেসে আসছে ওর গলার শব্দ। দস্যি মেয়েটা এক জানালা দিয়ে ছাদে উঠে আরেক জানালা দিয়ে চিলেকোঠায় ঢুকেছে।

প্রমাদ গুণলাম আমি। তাড়াতাড়ি বললাম ওকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু ও কি শুনতে চায় আমার কথা। অনেক সাধ্যসাধনার পর অবশ্য বেরিয়ে এলো ও, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এলো হীথক্লিফকে। আমাকে অনুনয় ক'রে বললো ওকে নিচে নিয়ে

গিয়ে যেন কিছু খেতে দেই।

ওর অনুরোধ রাখলাম আমি। হীথক্লিফকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম। কিন্তু বেশি কিছু খেতে পারলো না ছেলেটা, মার খেয়ে খুবই খারাপ অবস্থা ওর। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো চুপচাপ।

'কি ভাবছো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ভ্রূকুটি করলো হীথক্লিফ।

'ভাবছি কীভাবে শোধ নেবো,' ধীরে ধীরে বললো ও। 'এজন্যে যতদিনই হোক না কেন অপেক্ষা করবো আমি। আশাকরি আমার আগে মরবে না ও।'

'ছি, হীথক্লিফ, ও কথা বলে না,' বললাম আমি। 'খারাপ লোকের শাস্তি ঈশ্বরই দেবেন। ক্ষমা করতে শিখতে হবে আমাদের।'

'না,' বললো ও। 'ওর শাস্তি আমিই দেবো। সবচেয়ে ভালো হবে কোনটা তা-ই ভাবছি। চিন্তা কোরো না, ভেবে কিছু একটা বুদ্ধি বের ক'রে ফেলবো। যাও তুমি, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।'

পাঁচ

পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭৮ সালের চমৎকার এক জুন-সকালে জন্ম নিলো আর্নশ পরিবারের শেষ সন্তান হেয়ারটন—এবং ওর মা, হিণ্ডলের স্ত্রী মারা গেল মাস পুরতে না পুরতে। বাচ্চাটা হওয়ার পর থেকেই শরীর ভীষণ খারাপ যাচ্ছিলো ফ্রান্সেসের। হিণ্ডলে ওকে বলতো, 'চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ও মনে হয় বিশ্বাস করতো একথা। তারপর, এক রাতে, বসার ঘরে বসে আছে ও স্বামীর কাঁধে হেলান দিয়ে। বলছে, ওর ধারণা পরদিন থেকে ও হাঁটাচলা শুরু করতে পারবে। এই সময় হঠাৎ কাশতে শুরু করলো ফ্রান্সেস। কাশতে কাশতে হাত দুটো উঁচু ক'রে সামনে ছুঁড়ে দিলো, তারপর জড়িয়ে ধরলো স্বামীর গলা। মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। মারা গেল ফ্রান্সেস আর্নশ।

বাচ্চা হেয়ারটনকে মানুষ করার ভার পড়লো আমার ওপর। খুব ভালো ছিলো বাচ্চাটা, সুস্থ থাকলে একদম কান্নাকাটি করতো না। আর যতক্ষণ কান্নাকাটি করতো না ততক্ষণ ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করতো না হিণ্ডলে। তাতে আমরা খুশিই ছিলাম। কারণ যখন মাথা ঘামাতো তখন ও বাচ্চাটার উপকারের চেয়ে অপকারই করতো বেশি। ধমকে চমকে অস্থির ক'রে তুলতো দুধের শিশুটিকে। স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতো হিণ্ডলে, তার মৃত্যুর জন্যে ছেলেটাকে দায়ী ভাবতে শুরু করেছিলো সে। ফলে এবার একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠলো হিণ্ডলে আর্নশ। কাঁদলো না বা প্রার্থনার মাঝে শান্তি খুঁজলো না সে, বরং উল্টোটাই

করতে শুরু করলো। ঈশ্বরকে এবং মানুষকে অভিযুক্ত ক'রে তাদের বিরুদ্ধে গালাগালি, অভিশাপের বন্যা বইয়ে দিলো। যাকে সামনে পায় তারই বাপের নাম ভুলিয়ে দেয় গালাগাল দিয়ে। ভীষণভাবে মদ খেতে শুরু করলো। মিশতে শুরু করলো বাজে লোকদের সাথে। কখন সে মাতাল থাকে কখন থাকে না তা বোঝা দুষ্কর হয়ে উঠলো। ওর এই ভয়ঙ্কর ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলো সব চাকরবাকর। জোসেফ আর আমি কেবল রয়ে গেলাম যেন কীভাবে।

মনিবের এসব আচরণের খুবই খারাপ প্রতিক্রিয়া হলো ক্যাথরিন আর হীথক্লিফের ওপর। ক্যাথরিন এমনিতেই বহির্মুখী, আরো বহির্মুখী হয়ে উঠলো ও। হীথক্লিফ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলো হিণ্ডলের মনোকষ্ট। একজনের যতই অধঃপতন হতে লাগলো অন্যজন ততই খুশি হয়ে উঠতে লাগলো। ভীতিজনক এক বাড়িতে বাস করতে লাগলাম আমরা। গির্জার পুরোহিত আমাদের বাড়িতে আসা ছেড়ে দিলেন। ভদ্রলোকেরা আসা বন্ধ ক'রে দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে এবাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে ভয় পেতে লাগলো সবাই। আসে মাত্র একজন লোক—এডগার লিনটন। ক্যাথির কাছে আসে সে। এবং পারতঃপক্ষে হিণ্ডলের সামনে পড়তে চায় না।

পনর বছর বয়েসে এ তল্লাটের রাণী হয়ে উঠলো ক্যাথরিন। সত্যিই ওর মতো সুন্দরী আর একটিও ছিলো না আশপাশের দু'দশটা গ্রামে। কিন্তু ওকে পছন্দ করা খুবই দুষ্কর ব্যাপার। সব সময় নিজের ইচ্ছামতো চলে সে, এবং আশা করে অন্যরাও ওর ইচ্ছামতো চলবে। এর অন্যথা হলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওর, তখন দুর্ব্যবহার করতেও পিছপা হয় না। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শৈশব পেরিয়ে আসার পর থেকে ওকে আর তত পছন্দ করতাম না আমি। তবে ও কখনো অপছন্দ করেনি আমাকে। পুরনো বন্ধুদের কথা ও মনে রাখতো সব সময়, এমনকি হীথক্লিফ পর্যন্ত ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে গিয়েছিলো।

লিনটনদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলো ক্যাথরিন। স্বভাবের কর্কশ দিকটা ও কখনো দেখাতো না ওদের। চমৎকার অমায়িক, অনেকটা আদুরে ব্যবহার করতো বৃদ্ধ মিস্টার এবং মিসেস লিনটনের সাথে। ইসাবেলা লিনটন ওর ভক্ত হয়ে উঠেছিলো রীতিমতো। আর দখল ক'রে নিয়েছিলো এডগার লিনটনের মন প্রাণ। কিন্তু বাড়িতে এলেই ক্যাথি আবার খেয়ালী, উদ্দাম; কখনো কখনো রুক্ষ, কর্কশ। শেষ পর্যন্ত এক ধরনের দ্বৈত চরিত্র হয়ে উঠলো ও, যদিও কাউকে প্রতারণা করা ওর উদ্দেশ্য ছিলো না।

এক দিন বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল হিণ্ডলে। ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলাম দেরি হবে তার ফিরতে। হীথক্লিফও বুঝতে পারলো এটা। এবং ঠিক করলো এদিন আর কোনো কাজ সে করবে না, ছুটি কাটাবে। ওর বয়েস তখন ষোল। গায়ে গতরে বেশ বেড়ে উঠেছে এর মধ্যেই। মাথায় কুচকুচে কালো চুল। চোখে কালো

আগুন। তবে একটা ব্যাপার, আজকাল চেহারায়, পোশাক-আশাকে, আচার আচরণে কেমন যেন জবুথবু হয়ে উঠছে ছেলেটা। কথাও বিশেষ বলে না, এমনকি ক্যাথির সাথেও না। বুঝতে পারি না সত্যিই ওর বুদ্ধি কমে গেছে না হিণ্ডলের ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়েছে না এটা ওর ভান। তবে এটা ঠিক, ছেলেবেলায় লেখাপড়ার ফলে ওর আত্মিক যে উন্নতিটুকু হয়েছিলো তা নিঃশেষ হয়ে গেছে গত বছরগুলোর কঠোর কায়িক পরিশ্রম আর অবহেলার কারণে। বৃদ্ধ মিস্টার আর্নশর স্নেহ যে অহঙ্কার দিয়েছিলো ওকে তা-ও দূর হয়ে গেছে সম্পূর্ণ। এখন আর ও ক্যাথরিনের কাছ থেকে কিছু শিখে নেয় না, যদিও ক্যাথির সঙ্গে ভাব ওর বজায় আছে পুরোপুরি।

সেই বিকেলে, আমি চুল আঁচড়ানোয় সাহায্য করছিলাম ক্যাথরিনকে। ঘরে ঢুকলো সে। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে উঠলো ক্যাথি। ভাই বাড়িতে থাকবে না জেনে এডগার লিনটনকে আসতে বলে পাঠিয়েছে ও। হীথক্লিফের আজই ছুটি কাটানোর ইচ্ছা হবে তা ও ভাবতে পারেনি।

'কী ব্যাপার, এত সাজগোজ?' জিজ্ঞেস করলো হীথক্লিফ। 'কেউ আসছে না কি?'

'ন্—না। তেমন কিছু তো শুনিনি,' অস্বস্তির সঙ্গে জবাব দিলো ক্যাথরিন। 'কিন্তু এ-এখন তোমার মাঠে থাকার কথা না, হীথক্লিফ?'

'আজ আর আমি কাজ করবো না, বিকেলটা তোমার সাথে গল্প ক'রে কাটাবো ভাবছি।'

আগুনের কাছে গিয়ে বসলো হীথক্লিফ। ভুরু মুছলো ক্যাথরিন।

'না, না, তা কী ক'রে হয়!' বললো ও। 'জোসেফ বলে দেবে হিণ্ডলেকে।'

'পারবে না বলতে। জোসেফ অন্য জায়গায় কাজ করছে।'

অগত্যা সত্যি কথাটা প্রকাশ করতে হলো ক্যাথরিনকে।

'ইসাবেলা আর এডগার লিনটন বলছিলো আজ বিকেলে আসতে পারে। ওরা যদি আসে খামোকা ঝামেলায় পড়বে তুমি।'

কুটিল হয়ে উঠলো হীথক্লিফের চাউনি। 'এলেনকে বলে দাও ওরা এলে যেন বলে তুমি দেখা করবে না ওদের সাথে। ঐসব ছ্যাবলা বন্ধুদের জন্যে আমাকে ফিরিয়ে দেবে তা হবে না। আজকাল তুমি এত বেশি সময় দাও ওদের; আর আমার কাছে এসে একটু বসোও না!'

রেগে উঠলো ক্যাথি। 'কেন আমি তোমার কাছে গিয়ে বসে থাকবো সবসময়? লাভ কী তাতে? তুমি কিছু বলো? যদি বা বলো তার বিষয়বস্তু কী? তোমার একটা কথাও আমার ভালো লাগে না বুঝলে!'

হীথক্লিফের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো ধক্ ক'রে। 'আগে কোনোদিন বলোনি তো আমার সঙ্গ তোমার পছন্দ নয়!'

'যে কিছু জানে না, কিছু বলে না তার সঙ্গ কোনো সঙ্গই নয়!' বললো ক্যাথি।

ঝাঁ ক'রে উঠে দাঁড়ালো হীথক্লিফ। কিন্তু অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ ও পেলো না। বাইরে থেকে ভেসে আসছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। দরজার দিকে এগোলো ও বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। ঠিক সেই সময় দরজায় করাঘাত ক'রে ঘরে ঢুকলো এডগার।

একজন ঢুকলো, আরেকজন বেরিয়ে গেল। এটুকু সময়ের মধ্যেই ক্যাথরিনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওর দু'বন্ধুর মধ্যেকার পার্থক্য। একজন যেন ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া রুক্ষ পাহাড়ী এলাকা, আরেকজন সুন্দর সবুজ উপত্যকা। একজন মেঘ ভরা আকাশ, অন্যজন রোদ ঝলমলে দিন। হীথক্লিফের একেবারে উল্টো এডগারের কণ্ঠস্বর, অভিবাদন জানানোর ভঙ্গি, কথাবার্তা। সত্যিই খুব সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারে এডগার।

'বেশি আগে এসে পড়িনি নিশ্চয়ই?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো এডগার।

আমি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘর গোছাতে শুরু করলাম। জবাব দিলো ক্যাথরিন: 'না। নেলি, তুমি কী করছো ওখানে?'

সন্দেহ নেই আমি বেরিয়ে যাই তা-ই চাইছে ও। কিন্তু মিস্টার আর্নশ কড়াকড়িভাবে বলে রেখেছে, এডগার একা ক্যাথির সাথে দেখা করতে এলে আমি যেন ওদের সাথে থাকি। তাই বললাম, 'আমার কাজ।'

আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো ক্যাথরিন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ফিসফিস করলো, 'নেলি, যাও তুমি! বাড়িতে অতিথি এলে চাকর বাকররা তাদের সামনে ঘর গোছাতে শুরু করে না!'

'মনিব আমাকে বলেছেন করতে,' বললাম আমি। 'আমার মনে হয় মিস্টার এডগার কিছু মনে করবেন না আমি কাজ করলে।'

'আমি বলছি তোমাকে বেরিয়ে যেতে!'

'দুঃখিত, মিস ক্যাথি, মনিবের নির্দেশ পালন করতে হবে আমাকে।'

এরপর ক্যাথি যা করলো তা আমি ভাবতেই পারিনি। এডগারের চোখ এড়িয়ে ভয়ানক জোরে এক চিমটি কাটলো আমার বাহুতে। আগেই বলেছি, এখন আর আমি তত পছন্দ করি না ওকে, তার ওপর আমাকে ব্যথা দিয়েছে। তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার ক'রে উঠলাম আমি, 'উহ, মিস, এ কোন ধরনের ব্যবহার? আমাকে চিমটি কাটার কোনো অধিকার নেই তোমার!'

'মিথ্যেবাদী! আমি তোমাকে ছুঁইওনি!' চেঁচালো ক্যাথি। মুখ লাল হয়ে উঠেছে ওর রাগে, অপমানে।

'তাহলে এটা কী?' বাহুতে লাল দাগটা দেখিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

প্রচণ্ড ক্রোধে মাটিতে পা ঠুকে ঠাস ক'রে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলো ক্যাথরিন। জ্বলে উঠলো গালটা। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো আমার।

এডগার একেবারে হতভম্ব ক্যাথরিনের আচরণে।

'ক্যাথরিন! কী করছো, ক্যাথরিন?' অস্ফুটে উচ্চারণ করলো সে।

ক্যাথরিন কান দিলো না ওর কথায়। সারা শরীর কাঁপছে ওর থর থর ক'রে।

'বেরিয়ে যাও, এলেন!' দরজার দিকে হাত তুলে তীব্র হিসহিসে কণ্ঠে নির্দেশ দিলো ও।

ছোট্ট হেয়ারটন বসে ছিলো মেঝেতে। আমার চোখে পানি দেখে কেঁদে উঠলো ভ্যা ক'রে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে দু'হাতে ধরে ঝাঁকাতে লাগলো ক্যাথি। ভয়ে, ব্যথায় লাল হয়ে উঠলো হেয়ারটনের ছোট্ট মুখটা। এডগার ছুটে গিয়ে থামানোর চেষ্টা করলো ক্যাথরিনকে। এতে মেয়েটার সব রাগ গিয়ে পড়লো এডগারের ওপর। ওর কান ধরে মুচড়ে দিলো, মাথাটা ধরে ঝাঁকাতে লাগলো ভয়ানক আক্রোশে। হতবুদ্ধি হয়ে পিছিয়ে গেল এডগার কয়েক পা। আমি আর থাকলাম না ওখানে, হেয়ারটনকে কোলে ক'রে চলে এলাম রান্নাঘরে। দরজাটা খোলাই রেখে এলাম, কারণ এরপর ওরা কী করে দেখতে হবে আমাকে।

এডগার ওর হ্যাটটা তুলে নিয়ে এগোলো সামনের দরজার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছো তুমি?' চেঁচিয়ে উঠে ক্যাথি ছুটলো ওর পথ জুড়ে দাঁড়ানোর জন্যে।

ওকে না ছুঁয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো এডগার।

'যাবে না তুমি!' আবার চেঁচালো ক্যাথি।

'যাবোই আমি!' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো এডগার। 'যে ব্যবহার তুমি করেছো তার পরে আমি থাকবো?'

চুপ ক্যাথরিন।

'তুমি—তুমি মিথ্যে কথা বলেছো একেবারে অকারণে বলে চললো এডগার, 'তোমার জন্যে লজ্জা হচ্ছে আমার! আর কখনো আমি আসবো না এখানে!'

'না!' চিৎকার করলো ক্যাথরিন। 'না, এডগার, অকারণে,' আমি কিছু করিনি!...ঠিক আছে—যাও তোমার ইচ্ছা হলে। চলে যাও! এখন আমি—আমি কাঁদবো, কেঁদে কেঁদে শেষ ক'রে ফেলবো নিজেকে।'

হাঁটুগেড়ে বসে ফোঁপাতে শুরু করলো ও।

এডগার বেরিয়ে গেল। উঠানে নেমে একটু ইতস্তত করলো। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

পারবে না, ভাবলাম আমি।

আমার ধারণাই ঠিক হলো। এডগার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর দ্রুত ঘরে ফিরে এসে বন্ধ ক'রে দিলো দরজা। ঘন্টাখানেক পরে আমি যখন

সে ঘরে ঢুকলাম মিস্টার হিণ্ডলের বদ্ধ মাতাল হয়ে ফিরে আসার কথা জানানোর জন্যে, দেখলাম, ঝগড়াটা ওদেরকে আরো কাছাকাছি করেছে।

হিণ্ডলে ফিরে এসেছে এই খবরটা মুহূর্তের মধ্যে এডগার লিনটনকে নিয়ে গেল তার ঘোড়ার কাছে আর ক্যাথিকে তার ঘরে। আমি ঢুকলাম রান্নাঘরে ছোট্ট হেয়ারটনকে লুকিয়ে রাখার জন্যে। এরপর গিয়ে মনিবের বন্দুক থেকে গুলি বের ক'রে নিতে হবে। মাতাল অবস্থায় বন্দুক নিয়ে খেলতে খুব পছন্দ করে হিণ্ডলে। আমি গুলি বের ক'রে রাখতে ভুলে গেলে একদিন ও নির্ঘাত কাউকে না কাউকে খুন ক'রে বসবে ওটা দিয়ে।

কিন্তু অত সময় পেলাম না আমি। হেয়ারটনকে ঢুকিয়ে রাখার জন্যে কাবার্ডটার পাল্লা খুলেছি সবে, এই সময় জড়িত কণ্ঠে কসম কাটতে কাটতে রান্নাঘরে ঢুকলো হিণ্ডলে আর্নশ। সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র এক বিষোদগার ক'রে এগিয়ে এলো সে। হ্যাঁচকা টানে কাবার্ডের সামনে থেকে সরিয়ে আনলো আমাকে। চিৎকার করলো, 'আজ পেয়েছি তোকে! আমার বাচ্চাকে খুন করতে চাস তুই, না? এখন আমি বুঝতে পারছি কেন সব সময় আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখিস ওকে!'

আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম এক পাশে দাঁড়িয়ে। হেয়ারটন বাপকে দেখলে সাধারণত যা ক'রে, কান্না জুড়েছে তারস্বরে। আমাকে আর কিছু বললো না হিণ্ডলে। হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলে নিলো ছেলেকে।

'ছোঁড়াকে পেটানো দরকার,' জড়িতস্বরে চেঁচালো সে। আমাকে দেখে আদর ক'রে জড়িয়ে ধরে না! চিৎকার শুরু ক'রে দেয়, যেন আমি দানব! এলেন, চুল ছেঁটে দিলে সুন্দর দেখাবে না বদমাশটাকে? দাও কাঁচি দাও, ওর মাথা মুড়িয়ে দেবো আজ। লোম কেটে দিলে কুত্তা হিংস্র হয়, হেয়ারটনও হবে। হিংস্র জন্তু আমার পছন্দ। দাও, কাঁচিটা দাও! কানেরও দরকার নেই ওর, কী বলো? ওগুলোও ছেঁটে দেবো। এই, চুপ! বদমাশের বাচ্চা, চুপ! চুমো খা আমাকে! কী, খাবি না? হেয়ারটন! আজ যদি আমাকে তুই চুমো না খাস তোর মাথা আমি আস্ত রাখবো না!'

বেচারি হেয়ারটন সমানে হাত পা ছুঁড়ছে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে বাপের কোলে বন্দী হয়ে। ওকে ওভাবেই ধরে ওপর তলায় উঠলো হিণ্ডলে এবং ফেলে দেয়ার ভঙ্গিতে রেলিংয়ের ওপর তুললো। এবার আরো জোরে চেঁচাতে এবং হাত পা ছুঁড়তে শুরু করলো বাচ্চাটা। আমি চিৎকার ক'রে ছুটে গেলাম ওকে বাঁচানোর জন্যে। ফেলে যদি না-ও দেয় পশুটা ভয় পাইয়েই মেরে ফেলবে ওকে।

আমি যখন পৌঁছুলাম ওদের কাছে হিণ্ডলে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকলো নিচে কিছু একটা শব্দ পেয়ে। হীথক্লিফের পায়ের আওয়াজ চিনতে পারলাম আমি।

'কে?' খেঁকিয়ে উঠলো হিণ্ডলে।

ঠিক এই সময় আচমকা একবার ভয়ানক জোরে হাত পা ছুঁড়লো হেয়ারটন। হিণ্ডলে যথেষ্ট সতর্ক ছিলো না সে মুহূর্তে। ওর হাত ফসকে পড়ে গেল ছেলেটা।

কী ঘটেছে যখন আমি বুঝতে পেরেছি এবং চেঁচিয়ে উঠেছি তীক্ষ্ণস্বরে ততক্ষণে ছোট্ট শিশুটি নিরাপদে আশ্রয় পেয়েছে হীথক্লিফের কোলে। ঠিক ঐ মুহূর্তে সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়িয়েছিলো সে। বাচ্চাটা ওপর থেকে পড়তেই দু'হাত বাড়িয়ে ধরে নিয়েছে। ওকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওপর দিকে তাকালো হীথক্লিফ কে এমন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাতে চলেছিলো দেখার জন্যে। দুদ্দাড় ক'রে আমি নেমে এসে বুকে তুলে নিলাম হেয়ারটনকে। হিণ্ডলেও নেমে এলো আস্তে আস্তে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, নেশাও কেটে গেছে।

'দোষটা তোমার, এলেন,' বললো সে। 'আমার চোখের আড়ালে রাখা উচিত ছিলো বাচ্চাটাকে। ব্যথা পেয়েছে কোথাও?'

'ব্যথা পেয়েছে!' রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'মরেনি এ-ই বেশি! ওহ্, আমি ভেবে পাই না কী ক'রে আপনি নিজের ছেলের সাথে এমন ব্যবহার করেন! বুনো জন্তুর চেয়েও অধম আপনি! আপনি আর কখনো ওকে ছোঁবেন না! ও আপনাকে পছন্দ করে না, আপনাকে সহ্য করতে পারে না, এটাই সত্যি! একদিন কী সুখের ছিলো এ সংসার, আর আজ কী চমৎকার অবস্থায় তাকে টেনে নামিয়েছেন আপনি!'

হাসলো হিণ্ডলে। আগের সেই রুক্ষতা ফিরে এসেছে ওর চেহারায়।

'অবস্থা আরো চমৎকার হবে, নেলি,' বললো সে। 'এখন বদমাশটাকে নিয়ে দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। আর হীথক্লিফ, তুইও বেরিয়ে যা—আমার চোখ কান দুটোরই আড়ালে চলে যা। একটা ভালো কাজ ক'রে ফেলেছিস তুই আজ, আজ তোকে খুন করার চেষ্টা করবো না।'

কাবার্ড থেকে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল আর গ্লাস বের ক'রে নিয়ে এগোলো হিণ্ডলে পার্লারের দিকে। আমি ছুটে গিয়ে গ্লাসটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম তার হাত থেকে।

'না! আর খাবেন না, মিস্টার হিণ্ডলে,' বললাম আমি, 'আপনার নিজের কথা না হয় না ভাবলেন, আপনার ছেলেটার কথা অন্তত ভাবুন!'

'ওর জন্যে ভাবার অনেক লোক আছে!' বলে ঝটকা মেরে আমার হাত থেকে গ্লাসটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঢুকে গেল সে পার্লারে। দড়াম ক'রে লাথি মেরে আটকে দিলো দরজা।

'এত মদ গেলে তবু শালা মরে না!' বিড়বিড় করলো হীথক্লিফ।

রান্নাঘরে গিয়ে বসলাম আমি। ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলাম হেয়ারটনকে।

ছয়

বাচ্চাটাকে হাঁটুর ওপর শুইয়ে দোল দিচ্ছি আর গুনগুন ক'রে গান গাইছি ঘুম পাড়ানোর জন্যে।

মিস ক্যাথি এসে গলা বাড়ালো দরজা দিয়ে। এতক্ষণ ও ওর ঘর থেকে শুনছিলো সব। ঝামেলা মিটে যেতেই নেমে এসেছে।

'নেলি, তুমি একা আছো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ, মিস,' জবাব দিলাম আমি।

তখন পর্যন্ত তা-ই আমার ধারণা ছিলো; আমি একা আছি, হীথক্লিফ চলে গেছে গোলাবাড়িতে। সোফার কাছ পর্যন্ত যেতে দেখেছি ওকে, কিন্তু তারপর যে ও সোফার আড়ালের বেঞ্চটায় শুয়ে পড়েছে, টের পাইনি হেয়ারটনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায়। পেয়েছিলাম পরে।

ঢুকলো মিস ক্যাথি। একটু বিচলিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে। আগুনের সামনে একটা চেয়ারে বসে মুখ খুললো কথা বলার জন্যে। কিন্তু ওর একটু আগের দুর্ব্যবহার আমি ভুলিনি। তাই ওকে পাত্তা না দিয়ে আবার গান শুরু করলাম।

'হীথক্লিফ কই?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথি।

'বোধহয় আস্তাবলে,' গান থামিয়ে জবাব দিলাম আমি।

চুপ ক্যাথি। কিছুক্ষণ পর বললো, 'আমার ভীষণ মন খারাপ লাগছে, নেলি!'

'খুবই দুঃখের কথা,' বাঁকা ক'রে আমি বললাম। 'তোমাকে খুশি করার সাধ্য কারো আছে বলে তো মনে হয় না। এত বন্ধু তোমার, কোনো দুশ্চিন্তা নেই; তারপরও তোমার মন খারাপ লাগে!'

আমার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো ক্যাথি। মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে, ওর সেই চাউনিতে, যে চাউনি ওর ওপর আমার সব রাগ জল ক'রে দেয়।

'নেলি, একটা কথা বলবো তোমাকে; বলো কথাটা গোপন রাখবে।'

'গোপন কথা?' একটু নরম হয়ে আমি বললাম। 'কী দরকার তাহলে বলার?'

'দরকার আছে—আমার মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কাউকে না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাবো না।'

'তাহলে বলো।'

'আজ এডগার লিনটন আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। ওকে একটা জবাব দিয়েছি আমি। হ্যাঁ না না বলবো তোমাকে। কিন্তু আগে তুমি বলো জবাবটা কী হওয়া উচিত?'

'আমি কী ক'রে জানবো, মিস ক্যাথরিন? বিকেলে তুমি যে ব্যবহার করেছো

ওর সাথে তাতে না বলেছো এটা ধরে নেয়াই সঙ্গত না? ও নিশ্চয়ই রাম বুদ্ধু, নইলে ঐ ঘটনার পরও প্রস্তাব করে?'

ঝট ক'রে উঠে দাঁড়ালো ক্যাথি। 'এভাবে কথা বললে আর কিছু বলবো না তোমাকে, নেলি।' বললো ও। আমি চুপ ক'রে রইলাম। ও আস্তে আস্তে আবার বসলো আমার পাশে। বললো, 'আমি হ্যাঁ বলেছি, নেলি। এখন বলো, ভুল করেছি কিনা।'

'হ্যাঁ বলেছো! তাহলে আর এনিয়ে আলোচনা করার কী অর্থ? তুমি কথা দিয়েছো, এখন তো আর কথা ফেরাতে পারবে না।'

'যা-ই হোক, তুমি বলো কাজটা আমার উচিত হয়েছে কিনা—প্লিজ, নেলি।'

'বলতে হলে অনেকগুলো ব্যাপার হিশেবে আনতে হবে,' জবাব দিলাম আমি। 'প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তুমি এডগারকে ভালোবাসো কিনা।'

'মানে! নিশ্চয়ই বাসি।'

'কেন, মিস ক্যাথি?'

'ভালোবাসি কেন?—অনেক কারণ আছে।'

'কী সেই অনেক কারণ বলো।'

'আঁ...কারণ ও সুদর্শন। ওর সাথে সময় কাটাতে আমার ভালো লাগে। ও তরুণ, হাসিখুশি।'

'খারাপ!' আমি শুধু বলতে পারলাম।

'তাছাড়া ও আমাকে ভালোবাসে। ও ধনী। ওকে বিয়ে করলে এতল্লাটের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলা হতে পারবো আমি। ওকে স্বামী হিশেবে পেলে আমি গর্ববোধ করবো।'

'আরো খারাপ,' আমি বললাম, 'মিস্টার এডগারকে তুমি ভালোবাসো কারণ ও সুদর্শন, তরুণ, হাসিখুশি আর ধনী আর তোমাকে ভালোবাসে। কিন্তু ও সারাজীবন সুদর্শন থাকবে না, তরুণও থাকবে না; ধনীও যে থাকবে তা জোর দিয়ে বলা যায় না।'

'এখন তো আছে। সেটাই যথেষ্ট আমার জন্যে। আমি বর্তমান নিয়েই ভাবি শুধু, ভবিষ্যতে কী হবে না হবে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। এখন বলো, তোমার কী মত?'

'আমার মতের কোনো প্রয়োজন কি আছে? শুধুই যদি বর্তমান নিয়ে ভাবো তাহলে বিয়ে ক'রে ফেল মিস্টার লিনটনকে।'

'তোমার অনুমতি চাইছি না আমি—ওকে আমি বিয়ে করবো। আমি জানতে চাইছি, তোমার কি মনে হয় সেটা ঠিক হবে?'

'বিয়েটা যদি শুধু বর্তমানের ব্যাপার হয় তাহলে না হবে কেন? তোমার মন খারাপের কারণটা বুঝতে পারলাম না। এডগারকে বিয়ে করলে তোমার ভাই খুশি

হবে, বুড়ো মিস্টার এবং মিসেস লিনটন আমার মনে হয় না আপত্তি করবেন, তুমি এই অগোছালো অসুন্দর বাড়ি ছেড়ে সুন্দর বাড়িতে যাবে; সবচেয়ে বড় কথা, এডগারকে তুমি ভালোবাসো, এডগারও তোমাকে ভালোবাসে। সবকিছুই তো সহজ এবং স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তাহলে ব্যাপারটা কী? মন খারাপ লাগছে কেন?'

'এখানে এবং এখানে!' এক হাতে কপাল এবং অন্য হাতে বুক স্পর্শ ক'রে বললো ক্যাথরিন, 'যেখানে মন থাকে। মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছি।'

'কিছুই বুঝলাম না তোমার কথা।'

'এটাই আমার গোপন কথা, নেলি। প্লিজ, হেসো না, আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি।' গম্ভীর হয়ে উঠলো ক্যাথরিনের চেহারা। জিজ্ঞেস করলো, 'নেলি, কখনো তুমি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছো?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই তো দেখি।'

'আমিও। একবার দেখেছিলাম আমি স্বর্গে চলে গেছি, কিন্তু কিছুতেই নিজের বাড়ির মতো লাগছিলো না জায়গাটাকে। দুঃখে কেঁদে ফেললাম আমি। তখন দেবদূতরা রেগে গিয়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ওয়াদারিং হাইটসের ওপর। আনন্দে জেগে উঠলাম আমি। এই স্বপ্নের মতোই আমার গোপন কথা। আমার স্বর্গে থাকার যতটুকু অধিকার আছে তার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি অধিকার নেই এডগার লিনটনকে বিয়ে করার। হিণ্ডলে যদি হীথক্লিফের সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার না করতো, ওকে অত নিচে নামিয়ে না দিতো, আমি হয়তো ভাবতামও না একথা। কিন্তু এখনকার অবস্থায় হীথক্লিফকে বিয়ে করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বেচারা কোনোদিন জানতেও পারবে না ওকে কতখানি ভালোবাসি আমি। ও সুন্দর না অসুন্দর এটা কোনো ব্যাপার নয় এক্ষেত্রে—আমার কাছে আমি নিজে যতটা ও তারচেয়ে বেশি। একই ছাঁচে ঢালা আমাদের মন। লিনটনের মনের সাথে এর পার্থক্য চাঁদের আলোর সাথে বিদ্যুৎচমকের পার্থক্যের মতো, হিমের সাথে আগুনের পার্থক্যের মতো।'

ক্যাথি এ পর্যন্ত বলার আগেই আমি উপলব্ধি করলাম, হীথক্লিফ এতক্ষণ ঘরেই ছিলো। চোখের কোণ দিয়ে অস্পষ্ট এক নড়াচড়া দেখে ঘাড় ফেরালাম আমি। দেখলাম সোফার পেছনের বেঞ্চটা থেকে উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে ও। ক্যাথরিন ওকে বিয়ে করতে পারবে না এটুকু শোনার পর আর অপেক্ষা করেনি ও। ক্যাথরিন মাটিতে বসে আছে, খেয়াল করলো না ওর বেরিয়ে যাওয়া।

'নেলি, বুঝতে পারছো না, আমি আর হীথক্লিফ যদি বিয়ে করি স্রেফ পথের ভিখিরি হয়ে যাবো আমরা? কিন্তু যদি এডগারকে বিয়ে করি আমি হীথক্লিফকে সাহায্য করতে পারবো। ওর অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সে চেষ্টা করতে পারবো। হিণ্ডলের থাবা থেকে বের ক'রে নিয়ে যেতে পারবো ওকে।'

'তোমার স্বামীর টাকায়? যত সহজ ভাবছো তত সহজ হবে না কাজটা, মিস ক্যাথরিন। আমার মনে হয় এডগার লিনটনকে বিয়ে করার পক্ষে এটা তোমার সবচেয়ে খারাপ যুক্তি।'

'না নেলি,' জবাব দিলো ও, 'এটাই সবচেয়ে ভালো। হীথক্লিফকে নিয়ে এত ভাবি আমি! এডগারের জন্যে আমার ভালোবাসা গাছের পাতার মতো। সময় তার রঙ বদলে দেবে। কিন্তু হীথক্লিফের জন্যে যে ভালোবাসা তা গোড়ার চিরস্থায়ী মাটির মতো। দেখে সামান্যই ভালো লাগে, কিন্তু প্রয়োজনের দিক থেকে এর চেয়ে বড় কিছু নেই। নেলি, হীথক্লিফ সবসময় আমার মন জুড়ে আছে—আমার আনন্দের উৎস হয়ে নয়, অস্তিত্বের অংশ হয়ে—।'

থেমে আমার স্কার্টের ভাঁজে মুখ লুকালো ক্যাথি। আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। রেগে গেছি ওর ওপর।

'তোমার এসব প্রলাপ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিস,' বললাম। 'তবে এটুকু বুঝতে পারছি, বিয়ের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তোমার। আর কোনো গোপন কথা আমাকে বোলো না। আমি ওগুলো গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না।'

'এই মাত্র যেটা বললাম সেটা রাখবে তো?'

'বলতে পারি না।'

ঠিক এই সময় জোসেফ এলো। আমরা চুপ ক'রে গেলাম। হেয়ারটনকে ক্যাথির কাছে দিয়ে আমি রাতের খাওয়ার আয়োজনে লাগলাম।

'হীথক্লিফ কই?' টেবিলে খাবার সাজানো হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলো জোসেফ।

'গোলাঘরে মনে হয়,' বললাম আমি। 'বসো, ডেকে আনছি।'

বাইরে গিয়ে ডাকলাম আমি ওকে। কোনো সাড়া পেলাম না। প্রথমে গোলাঘরে তারপর আস্তাবলে ঢুকে দেখলাম। নেই। ফিরে এসে ফিসফিস ক'রে ক্যাথরিনকে বললাম আসল ব্যাপারটা, হীথক্লিফ ঘরেই ছিলো এবং ওর কথার অনেকটাই শুনেছে। শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ক্যাথি, দুশ্চিন্তার ছাপ পড়লো মুখে। ঝড়ের মতো বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে হীথক্লিফের খোঁজে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, ফিরে এলো না ক্যাথরিন। অবশেষে জোসেফ পরামর্শ দিলো আর দেরি না ক'রে খেয়ে নেয়ার। খাওয়া শুরু করার আগে নিয়ম মতো প্রার্থনা করতে লাগলো ও। এই সময় যেমন গিয়েছিলো তেমনি ঝড়ের মতো ঢুকলো ক্যাথি। জোসেফকে নির্দেশ দিলো যেন এক্ষুণি রাস্তায় গিয়ে খোঁজ করে হীথক্লিফের, যেখানেই থাক ওকে ধরে আনতে হবে।

'ওর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে,' বললো ক্যাথরিন। 'আজ রাতেই বলতে হবে। গেট খোলা দেখলাম। নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে ও। দূরে কোথাও গিয়ে

বসে আছে মনে হয়। চেঁচিয়ে ডাকলাম, সাড়া দিলো না।'

জোসেফ প্রথমে একটু গাঁই গুঁই করলেও শেষ পর্যন্ত হ্যাট চাপালো মাথায়। বিড় বিড় ক'রে নারী জাতির ওপর বিষোদগার করতে করতে বেরিয়ে গেল সে। ক্যাথরিন অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলো ঘরের এমাথা ওমাথা। একটু পরপরই দরজার কাছে গিয়ে তাকাতে লাগলো বাইরে। বার বার বলতে লাগলো এক কথা: 'কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে? কী বলেছি আমি, নেলি? ওকে ব্যথা দেয়ার মতো কী আমি বলেছি? ওহ, ফিরে আসুক ফিরে আসুক ও!'

আমি ব্যাপারটাকে প্রথমে তত গুরুত্ব না দিলেও জোসেফ যখন একা ফিরে এলো তখন উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না।

'পেয়েছো ওকে, এই গর্দভ?' চিৎকার করলো ক্যাথরিন। 'যেমন বলেছি সেভাবে খুঁজেছো সব জায়গায়?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো জোসেফ। 'দরজা খুলে রেখে গেছে বদমাশটা। তোমার ঘোড়া বাগানে ঢুকে সব ফুল নষ্ট ক'রে ফেলেছে। ছোঁড়াকে পেয়ে নেই, এমন শিক্ষাই দেবো। ভীষণ মেঘ জমেছে আকাশে। ঝড় বাদল হবে মনে হচ্ছে।'

আমি বাইরে গিয়ে তাকালাম আকাশের দিকে। ঠিকই বলেছে জোসেফ, ঝড়বৃষ্টি আসছে। ভাবলাম বৃষ্টি শুরু হলেই এসে পড়বে হীথক্লিফ।

বৃষ্টি এলো, কিন্তু হীথক্লিফ এলো না। অস্থিরতার চরমে পৌঁছে গেল ক্যাথরিন। এখন আর ঘরের ভেতর পায়চারি করছে না ও, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে একবার ফটকের কাছে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে ঘরের দরজায়। আমি বার বার বারণ করলাম বৃষ্টিতে ভিজতে, ও কানেই তুললো না আমার কথা। শেষ পর্যন্ত ফটক পেরিয়ে রাস্তায় নেমে গেল ক্যাথরিন। ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো বৃষ্টির ভেতর। একটু পর পর কান্না ভাঙা কণ্ঠে ডাকতে লাগলো হীথক্লিফের নাম ধরে।

মাঝরাতে শুরু হলো ঝড়। প্রচণ্ড ঝড়। সেই সাথে বজ্রপাত। তখনো জোসেফ আর আমি বসে আছি রান্নাঘরে। ঝড়ের ঝাপটায় দালানের এক কোণের একটা গাছ ভেঙে পড়লো ছাদের ওপর। এতে পুব দিকের চিমনিটার এক অংশ গুঁড়িয়ে গেল। টুকরো পাথর আর চিমনির গায়ের ভূষা ঝরে পড়লো রান্নাঘরের আগুনে। জোসেফ হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করতে লাগলো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে।

বিশ মিনিটের মধ্যে ঝড় থেমে গেল ক্যাথি ছাড়া আর সবাইকে অক্ষত রেখে। আমাদের নিষেধ উপেক্ষা ক'রে ঝড়ের পুরোটা সময় ও বাইরে কাটিয়েছে। বাতাস থেমে যাওয়ার একটু পরে এসে ঢুকলো রান্নাঘরে। ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে গা, মাথা, চুল। ওভাবেই ও বসে পড়লো আগুনের কাছে একটা সোফায়।

'ঠাণ্ডা না লাগিয়ে তুমি ছাড়বে না, মি[illegible] ঝাঁঝের সাথে আমি জানতে চাইলাম। 'রাত এখন সাড়ে বারোটা। বেআক্কেলটার জন্যে আর অপেক্ষা করার কোনো অর্থ আছে? ও নিশ্চয়ই গিমারটনে গিয়ে বসে আছে।'

'আমার মনে হয় না গিমারটন পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছে,' বললো জোসেফ। 'নির্ঘাৎ পাঁক ভর্তি কোনো গর্তে পড়ে মরেছে বদমাশটা।'

ক্যাথরিনকে ওঠানোর এবং ওর গা থেকে ভেজা কাপড়চোপড় খুলে নেয়ার চেষ্টা করলাম আমি। ও বাধা দিতে লাগলো। শেষে বিরক্ত হয়ে আমি ঘুমন্ত হেয়ারটনকে তুলে নিয়ে চলে গেলাম আমার ঘরে।

সকালে নিচে নেমে দেখি তখনো ক্যাথরিন বসে আছে সেই সোফায়। দরজা খোলা। হিণ্ডলে নেমে এসেছে। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। ক্যাথরিনের মতোই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। আমি ঢুকে শুনলাম হিণ্ডলে বলছে: 'এই, ক্যাথি, হয়েছে কী তোর? ভেজা কুকুরের মতো দেখাচ্ছে, মুখ ফ্যাকাসে! ব্যাপার কী?'

'ভিজেছি রাতে,' বললো ক্যাথি। 'শীত লাগছে, আর কিছু না।'

'ওহ, কাল রাতে যা করেছে,' বললাম আমি। 'চুপচুপে হয়ে ভিজেছে বৃষ্টিতে। ঝড়ের সময়টাতেও বাইরে ছিলো। তারপর থেকে বসে আছে ওখানে!'

বিস্মিত চোখে বোনের দিকে তাকালো হিণ্ডলে। 'সারারাত বসে আছিস?' কেন? ঝড় বাদলের ভয়ে নয় নিশ্চয়ই!'

ক্যাথি আর আমি তাকালাম একে অপরের দিকে। যতক্ষণ পারা যায় হীথক্লিফের অনুপস্থিতির কথা গোপন রাখতে চাই আমরা দু'জনেই। তাই আমি বললাম, জানি না; আর ক্যাথি বললো না কিছু।

জানালা খুলে দিলাম আমি। ঘর ভরে গেল ভোরের তাজা শীতল বাতাসে। ক্যাথরিন কেঁপে উঠে বললো, 'আমার শীত লাগছে, এলেন, জানালাটা বন্ধ ক'রে দাও!'

সত্যিই। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করছে ওর। আগুনের যতটা সম্ভব কাছে এগিয়ে বসলো ও। হিণ্ডলে ওর একটা হাত তুলে নিলো।

'আরে, গায়ে তো জ্বর!' উদ্বিগ্নস্বরে বললো সে। 'এ জন্যেই বোধহয় শোয়নি রাতে। কেন, ক্যাথি, কেন ভিজেছিস বৃষ্টিতে?'

'আর কেন?' বিড়বিড় করলো জোসেফ, 'হীথক্লিফের পেছনে ছুটছিলো। একবার ভাবুন কী সাংঘাতিক কথা, রাত বারোটার সময় ছোঁড়ার পেছন পেছন ঘুরছে আপনার বোন।'

'চুপ করো, ইতর!' চেঁচিয়ে উঠলো ক্যাথরিন।

'ক্যাথি,' বললো হিণ্ডলে, 'সত্যি ক'রে বল, কাল রাতে হীথক্লিফের সঙ্গে ছিলি তুই? ভয়ের কিছু নেই, সত্যি কথা বল। আজ ওকে কিছু বলবো না আমি। কাল মস্ত এক উপকার করেছে ও আমার।'

'কাল রাতে আমি দেখিওনি হীথক্লিফকে,' কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো ক্যাথরিন। 'তুমি যদি ওকে তাড়িয়ে দাও আমি ওর সাথে যাবো। কিন্তু—কিন্তু সে

সুযোগ তুমি আর বোধহয় পাবে না। ও চলে গেছে চিরদিনের জন্যে—'

কুৎসিত এক গালাগাল দিয়ে হিণ্ডলে তক্ষুণি ক্যাথরিনকে পাঠিয়ে দিলো ওর ঘরে। আমি গেলাম পেছন পেছন। ঘরে গিয়ে যা করলো ক্যাথি কোনোদিনই তা আমি ভুলবো না। এই ফোঁপানি, এই চেঁচায়, এই আবোল তাবোল বকে; সঙ্গে থর থর কাঁপুনি। আমার মনে হলো ও বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নিচে এসে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিলাম জোসেফকে।

ডাক্তার কেনেথ ক্যাথির দিকে এক পলক তাকিয়েই বললেন, ভয়ানক অসুস্থ ও। আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, প্রচণ্ড জ্বর। ডাক্তার ওকে ওষুধ খাইয়ে আমাকে বললেন পথ্য কী কী দিতে হবে। ওর ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকতে বললেন আমাকে। সব সময় যেন চোখে চোখে রাখি, নইলে কখন দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়বে ঠিক নেই।

অনেকগুলো সপ্তাহ অসুস্থ রইলো ক্যাথরিন। এই সময়টায় কী ক'রে যে সব সামলালাম আমি নিজেই জানি না। হেয়ারটনের দেখাশোনা; ক্যাথির সেবা শুশ্রূষা, ওকে চোখে চোখে রাখা: তারপর বাড়ির রান্নাবান্না এবং অন্যান্য কাজ—আমি জেরবার হয়ে গেলাম একেবারে।

বৃদ্ধা মিসেস লিনটন সপ্তাহে কয়েকবার ক'রে আসতেন ওকে দেখতে। ক্যাথরিন একটু ভালো হওয়ার পর আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ওকে থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে নিয়ে গেলেন মিসেস লিনটন। এই সহৃদয়তার খেসারত দিতে হলো তাকে শিগগিরই। ক্যাথি পুরোপুরি সুস্থ হতে না হতেই অসুখে পড়লেন তিনি ও তাঁর স্বামী। এবং মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে মারা গেলেন দু'জনেই।

আগের চেয়ে অনেক উদ্দাম উচ্ছল হয়ে, আর বদমেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরলো ক্যাথরিন। এখন হিণ্ডলে ওর কোনো কাজেই বাধা দেয় না। কারণ ডাক্তার বলেছেন, নিজের মতে চলতে না দিলে আবার ও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া হীথক্লিফ সে রাতে সেই যে গেছে আর ফেরেনি। পথের ছেলেটার সঙ্গে বোনের কোনোরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দূর হয়ে যাওয়ায় ওর দিকে আর চোখ রাখার প্রয়োজন বোধ করে না হিণ্ডলে। এখন ও সর্বান্তঃকরণে আশা করে এডগার লিনটনকে বিয়ে ক'রে ক্যাথি পরিবারের মর্যাদা বাড়াবে। সুতরাং বাড়ির আর সবাই বাঁচলো কি মরলো তাতে কিছু এসে যায় না।

ফিরে আসার পর থেকে ক্যাথি একান্ত প্রয়োজন না হলে কথা বলে না আমার সাথে। যখন বলে চাকর ধরে নিয়েই বলে এবং সে কথাগুলো আদেশ ছাড়া আর কিছু নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য যেটা, এখন হীথক্লিফের কথা ও ভুলেও মুখে আনে না।

দিন কেটে যেতে লাগলো। এডগার লিনটনের অন্ধ প্রেম অক্ষুণ্ণ রইলো ক্যাথরিনের প্রতি। অবশেষে বাবার মৃত্যুর তিন বছর পর ক্যাথিকে বিয়ে করলো সে।

গিমারটনের গির্জায় বিয়েটা যেদিন হলো সেদিন এডগারের মনে হলো ওর চেয়ে সুখী আর কেউ নেই পৃথিবীতে।

আমার মোটেই ইচ্ছা ছিলো না, তবু ওয়াদারিং হাইটস ছেড়ে যেতে হলো আমাকে নববধূর সাথে তার শ্বশুর বাড়িতে। হেয়ারটনের বয়েস তখনও পাঁচ পোরেনি, তাছাড়া আমি তখন মাত্র লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেছি ওকে। এই অবস্থায় আমাদের আলাদা হতে হলো। ওর কষ্ট হবে, লেখাপড়া শেখা হবে না; এই অজুহাতে আমি যেতে অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু ক্যাথরিন তখন যা চায় তা-ই পায়। ব্যক্তিগত দাসী ছাড়া ও শ্বশুর বাড়িতে যাবে? অসম্ভব। হিণ্ডলে কড়া গলায় আমাকে আদেশ করলো ওর সাথে যেতে।

'কোনো মেয়ে মানুষের দরকার নেই এবাড়িতে,' চিৎকার করলো সে। 'যে বাড়িতে কোনো গিন্নী নেই সে বাড়িতে মেয়েমানুষের দরকার কী? হেয়ারটনকে লেখাপড়া পাদ্রীই শেখাতে পারবে।'

অগত্যা আমাকে যেতে হলো।

থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক ভালো আচরণ করতে লাগলো ক্যাথরিন। মিস্টার লিনটনের পাশাপাশি ইসাবেলাও খুবই প্রিয় হয়ে উঠলো ওর। ওরাও সব সময় চেষ্টা করতো যাতে ওর কোনোরকম অসুবিধা না হয়। তবে লক্ষ করতাম, মিস্টার লিনটন যেন তটস্থ হয়ে থাকতো সব সময়, কখন স্ত্রী রেগে ওঠে এই ভয়ে। মুখে কখনো কিছু প্রকাশ করতে দেখিনি তবে খেয়াল করেছি, কখনো যদি আমি মিস ক্যাথির কথার পিঠে জোরে কিছু বলেছি তো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ। মাঝে মাঝে ক্যাথিকে একটু গম্ভীর দেখতাম, তবে ব্যাপারটাকে তত গুরুত্ব দিতাম না। আমার মনে হতো সুখেই আছে ও লিনটনদের একজন হয়ে।

তারপর এক দিন বাগানে দেখা হলো আমার তার সাথে…

সাত

মাসটা সেপ্টেম্বর। সময় সন্ধ্যা। বাগান থেকে ফিরছি আমি এক ঝুড়ি আপেল নিয়ে। অন্ধকার নেমে এসেছে চরাচরে। চাঁদ উঁকি দিচ্ছে উঠানের উঁচু দেয়ালের ওপাশ থেকে। ভারি ঝুড়িটা বয়ে এনে হাঁপিয়ে গেছি আমি। রান্নাঘরের দরজার সামনে সিঁড়ির ওপর ওটা রেখে দাঁড়ালাম এক মুহূর্ত জিরিয়ে নেয়ার জন্যে। মৃদু মিষ্টি বাতাস ভেসে আসছে। চাঁদের দিকে চোখ আমার। এই সময় পেছন থেকে একটা ডাক শুনে চমকে উঠলাম আমি।

'নেলি!'

ভরাট গলা। পুরুষকণ্ঠে। অপরিচিত মনে হলো গলাটা। তবে বলার ভঙ্গি বেশ পরিচিত। ঘুরে তাকালাম আমি। অন্ধকার গাড়ি বারান্দার নিচে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম দীর্ঘদেহী এক লোককে। গাঢ় রঙের পোশাক তার পরনে। মুখ এবং চুল কালো।

'এক ঘন্টারও বেশি হয়ে গেল, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি,' বললো সে। 'সবকিছু এমন চুপচাপ এখানে; ভেতরে ঢুকতে সাহস পাইনি। আমাকে চিনতে পারছো না তুমি, নেলি!'

বলতে বলতে গাড়ি বারান্দা থেকে বেরিয়ে এলো সে। চাঁদের আলো পড়লো তার মুখে। অমনি শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আমার। কালো দাড়িতে প্রায় ঢাকা লোকটার মুখ, মোটা ভুরুজোড়া ঝুলে পড়েছে চোখের ওপর। গভীর কালো চোখ দুটোয় কালো আগুন।

এ চোখ, এ আগুন আমার চেনা।

'তু—তুমি, হীথক্লিফ!' কোনোমতে উচ্চারণ করলাম আমি।

'হ্যাঁ।' মুখ তুলে জানালাগুলোর দিকে তাকালো সে। জানালার কাচে সহস্র চাঁদের প্রতিফলন, কিন্তু ভেতর থেকে আসছে না আলোর একটা রেখাও। 'বাড়িতে আছে ওরা?' উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে। 'ও কই, নেলি? তুমি মনে হচ্ছে চিন্তায় পড়ে গেছ? আছে ও এখানে? গিয়ে বলো গিমারটন থেকে একজন এসেছে ওর সাথে দেখা করতে।'

'কীভাবে নেবে ও ব্যাপারটাকে?' অস্ফুটকণ্ঠে আমি বললাম, 'কী ভাববে, কী করবে? তুমি—তুমি এত বদলে গেছ, হীথক্লিফ! কোথায় ছিলে এতদিন?'

'সে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে,' অস্থিরভাবে বললো সে। 'যাও তাড়াতাড়ি, যা বললাম গিয়ে বলো।'

ও নিজেই দরজা খুলে ঠেলে দিলো আমাকে ভেতরে। মুহ্যমানের মতো এগিয়ে চললাম আমি। পার্লারের দরজায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লাম নিজের অজান্তেই। কী করবো বুঝতে পারছি না। শেষে ঠিক করলাম, কিছু একটা ছুতো তৈরি ক'রে ঢুকবো। প্রথমে টোকা দিয়ে আস্তে দরজা খুললাম আমি।

'বাতি জ্বেলে দেবো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দাও,' বললো ক্যাথরিন।

জানালার কাছে বসে আছে দু'জন, বাইরের সবুজ পাহাড় আর গিমারটন উপত্যকার দিকে চোখ। এডগার, ক্যাথি দু'জনকেই বেশ শান্ত সুখী পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে। ওদের বিরক্ত করতে হবে ভেবে খুবই খারাপ লাগলো আমার। কিন্তু উপায় নেই। বাতি জ্বেলে টেবিলের ওপর রাখলাম। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললাম, 'গিমারটন থেকে এক লোক এসেছে। ম্যাডামের সাথে দেখা করতে চায়।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো মিসেস লিনটন।

'জানি না। আমি—আমি জিজ্ঞেস করিনি।'

'ঠিক আছে, নেলি,' বললো ক্যাথি, 'পর্দাগুলো টেনে দিয়ে তুমি যাও, চা নিয়ে এসো। আমি আসছি এক্ষুণি।'

বেরিয়ে গেল ও।

'কে লোকটা নেলি?' জানতে চাইলো মিস্টার এডগার।

'হী—হীথক্লিফ, স্যার,' ঢোক গিলে জবাব দিলাম। 'সেই ছেলেটা—আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই—ওয়াদারিং হাইটসে থাকতো।'

রীতিমতো চমকে উঠলো মিস্টার লিনটন। 'কী! সেই বুনো ডানপিটে ছোঁড়া! ক্যাথরিনকে বললে না কেন?'

লাফ দিয়ে উঠে উঠানের দিকের একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এডগার। জানালাটা খুলে যতটা সম্ভব ঝুঁকে দেখলো বাইরে। চিৎকার করে বললো, 'ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না ডার্লিং! লোকটাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

নীরবে কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। দরজা খোলার এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর রুদ্ধশ্বাসে, প্রায় উড়ে ওপরে উঠে এলো ক্যাথরিন।

'ওহ, এডগার, এডগার!' দু'হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। 'এডগার, ডার্লিং! হীথক্লিফ ফিরে এসেছে!'

'হয়েছে, হয়েছে,' বললো ওর স্বামী, 'সে জন্যে আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে নাকি! এত খুশির কী হয়েছে? ও যে এমন দামী এক সম্পদ তা তো জানতাম না।'

'ডার্লিং, আমি জানি তুমি ওকে পছন্দ করো না। কিন্তু অন্তত আমার মুখ চেয়ে এখন থেকে ওকে বন্ধু ভাববে তুমি। ওপরে আসতে বলবো ওকে?'

'এখানে!?'

'আর কোথায়?'

'না, না, রান্নাঘরই ভালো।'

'না, ওকে নিয়ে রান্নাঘরে বসতে পারবো না আমি। এলেন, আরেকটা টেবিল নিয়ে এসো এখানে। উঁচু এবং দামী একটা, তোমার মনিব আর মিস ইসাবেলা বসবে ওটায়। আর হীথক্লিফ আর আমার জন্যে এই সাধারণটাতেই চলে যাবে।'

আবার ও ছুটতে শুরু করেছিলো প্রায়। এডগার থামালো ওকে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, 'এলেন, ওপরে আসতে বলো ওকে। আর, ক্যাথরিন, খুশি হও আমার আপত্তি নেই, তবে বেআক্কেলপনা কোরো না দয়া ক'রে। বাড়ি থেকে পালানো এক বদ চাকরকে তুমি ভাইয়ের মতো সমাদর করছো এটা আর সব চাকর বাকরদের না দেখানোই ভালো—'

আর শোনার জন্যে দাঁড়ালাম না আমি। নিচে গিয়ে দেখি হীথক্লিফ অপেক্ষা করছে ভেতরে ঢোকার আমন্ত্রণের আশায়। কোনো কথা না বলে আমাকে

অনুসরণ করলো সে। মনিব এবং মনিবগিন্নির কাছে ওকে নিয়ে গেলাম আমি। লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো ক্যাথি। হীথক্লিফের হাত দুটো ধরে ওকে টেনে নিয়ে গেল এডগারের কাছে। স্বামীর অনিচ্ছুক একটা হাত তুলে নিয়ে ধরিয়ে দিলো হীথক্লিফের হাতে।

বাতির আলোয় এবার আমি ভালো ক'রে দেখলাম হীথক্লিফকে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম ওর পরিবর্তন দেখে। অনেক লম্বা হয়েছে, স্বাস্থ্যও অনেক ভালো হয়েছে; ঋজু পেটা শরীর বলতে যা বোঝায় তাই। ওর পাশে এডগার লিনটনকে নেহায়েতই রোগাপাতলা এক ছোকরা মনে হচ্ছে। দাঁড়ানো এবং হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সেনাবাহিনীতে ছিলো ও। মুখটা অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে মিস্টার লিনটনের চেয়ে, প্রায়ই যাদেরকে দুরূহ সিদ্ধান্ত নিতে হয় অনেকটা তাদের মতো পোড়খাওয়া। চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ, ওয়াদারিং হাইটসে এক কালে যে দুর্ব্যবহার পেয়েছে তার কোনো চিহ্নও নেই। তবে দৃষ্টিতে পুরনো সেই বুনো ভাবটা আছে এখনো, যদিও আগের চেয়ে অনেক সংহত তা এখন। কথা বার্তায় আগের মতো কর্কশ, চাঁছাছোলা নয়; তবে অমায়িকও নয়।

মিস্টার লিনটন আমার চেয়ে কম অবাক হলো না ওকে দেখে। এক মুহূর্ত সে ভেবে পেলো না কীভাবে কথা বলবে, এই 'চাকর'টার সাথে।

'বোসো,' অবশেষে বলতে পারলো সে। 'পুরনো দিনের কথা স্মরণ ক'রে আমার স্ত্রী চাইছে তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করি। ও যাতে খুশি হয় তা করতে পারলে আমিও খুশি হই।'

'আমিও,' বললো হীথক্লিফ, 'বিশেষ ক'রে ওর সেই খুশি হওয়ায় যদি আমার কোনো ভূমিকা থাকে।'

বসলো হীথক্লিফ ক্যাথরিনের উল্টো দিকে একটা আসন দখল ক'রে। ক্যাথরিন তাকিয়ে আছে ওর দিকে স্থির চোখে, যেন চোখ সরালেই আবার ও হারিয়ে যাবে। কিন্তু হীথক্লিফ বিশেষ তাকাচ্ছে না ক্যাথির দিকে। মাঝে মধ্যে এক দু'পলকের চাহনি, ব্যস। স্ত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে এডগারকে। একটু পরেই ক্যাথরিন যখন হঠাৎ ক'রে উঠে আবার হাত ধরলো হীথক্লিফের, লক্ষ করলাম, মুখটা কঠোর হয়ে উঠলো তার।

'স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে আমার,' উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললো ক্যাথি। 'সুখের স্বপ্ন, যেন রাত পোহালেই হারিয়ে যাবে। ওহ্, হীথক্লিফ, এতগুলো বছর কীভাবে দূরে থাকলে তুমি, একবারও ভাবলে না আমার কথা!'

'তুমি যতটুকু ভেবেছো তার চেয়ে একটু বেশি ভেবেছি আমি তোমার কথা,' বললো হীথক্লিফ। 'তোমার বিয়ের খবর শুনেছি মাত্র আজ। শোনার পর ভেবেছিলাম একবার মাত্র দেখবো তোমাকে, তারপর বোঝাপড়া করবো হিণ্ডলের সাথে। ওকে শেষ ক'রে নিজে শেষ হয়ে যাবো। কিন্তু এখানে তোমার অভ্যর্থনা পাওয়ার পর ও

চিন্তা দূর হয়ে গেছে আমার মাথা থেকে। শেষবার তোমার কথা শোনার পর থেকে এ পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে, ক্যাথি,—তোমার জন্যেই করেছি এ পরিশ্রম।'

'ক্যাথরিন!' রুক্ষভাবে চিৎকার করলো মিস্টার এডগার, 'ঠাণ্ডা চা না খেতে চাও তো টেবিলে এসো দয়া ক'রে।'

টেবিলে বসলো ক্যাথরিন, তবে ওর উচ্ছ্বাস কমলো না মোটেই। মিস ইসাবেলা এসে যোগ দিলো ওদের সাথে। আমি বেরিয়ে এলাম।

দশ মিনিটের মাথায় আবার ডাক পড়লো আমার চায়ের সাজ সরঞ্জাম সরিয়ে নেয়ার জন্যে। ঢুকে বুঝলাম খাওয়াটা সুবিধার হয়নি ওদের। ক্যাথির কাপে চা ঢালাই হয়নি, কারণ খাওয়া-পান করার ঊর্ধ্বে এখন ওর মনের অবস্থা। এডগার তার তস্তরীতে ঢেলেছে চা, তবে একটাও চুমুক দিয়েছে কিনা সন্দেহ।

সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেকের বেশি থাকলো না হীথক্লিফ। ও যখন চলে যাচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবে এখন? গিমারটনে?'

'না, ওয়াদারিং হাইটসে,' বললো ও। 'সকালে গেছিলাম ওখানে, হিণ্ডলে বললো রাতে থাকতে।'

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। হিণ্ডলে ওকে রাত কাটাতে বলেছে ওয়াদারিং হাইটসে! তার চেয়ে বড় কথা, ও গেছিলো হিণ্ডলের সাথে দেখা করতে! আমার মনে পড়লো, একটা ছেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো প্রতিশোধ নেবে হিণ্ডলের ওপর; সেজন্যে যতদিন দরকার অপেক্ষা করবে সে। ওর অপেক্ষা কি শেষ হওয়ার পথে? অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করলাম আমি, এই লোকটা চিরদিনের জন্যে এ এলাকা ছেড়ে গেলে মঙ্গল হতো সবার জন্যে।

রাত দুপুর তখন। আমি ঘুমিয়ে আছি আমার ঘরে। মিসেস লিনটন এসে ঘুম ভাঙালো আমার। বিছানার পাশে বসে আচ্ছা ক'রে চুল টেনে দিলো আমার, যাতে ঘুম পালায়।

'আমি ঘুমাতে পারছি না, এলেন,' বললো সে। 'আমি চাই আমার সুখের ভাগী হোক কেউ। এডগার রেগে যাচ্ছে ওর অপছন্দের জিনিস নিয়ে আমি এত খুশি হচ্ছি দেখে। হীথক্লিফ সম্পর্কে এত সব সুন্দর সুন্দর কথা বললাম, ও শুনলোই না। ওর হয় মাথা ধরেছে নয় তো ও ঈর্ষায় ভুগতে শুরু করেছে।'

'ওর কাছে হীথক্লিফের প্রশংসা ক'রে কী লাভ?' আমি বললাম। 'ছোটবেলায় ওরা দু'জনই দু'জনকে দেখতে পারতো না। হীথক্লিফের কাছে মিস্টার লিনটনের প্রশংসা ক'রে দেখ না, ও-ও রেগে যাবে। এটা স্বাভাবিক, মানুষের ধর্মই এই। তুমি আর ওর কথা বোলো না মিস্টার লিনটনের কাছে।'

'কিন্তু এ বোকামি, না, নেলি? আমি তো কাউকে ঈর্ষা করি না। ইসাবেলার

সোনালি চুল, আমার চেয়ে ফর্সা রঙ দেখে আমি হিংসায় মরে যাই? কক্ষনো না!'

'এখন করো না,' আমি বললাম, 'কিন্তু কোনোভাবে ইসাবেলা—বা অন্য যে কেউ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলে করবে। যাকগে এসব কথা, হীথক্লিফ যে ওয়াদারিং হাইটসে গেল ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার কিছুই না। প্রথমে আমিও অবাক হয়েছিলাম শুনে, পরে ও ভেঙে বলেছে। তুমি এখনো হাইটসেই আছো মনে ক'রে ও গেছিলো তোমার কাছ থেকে আমার খবর নেবে বলে। বাইরে জোসেফের সাথে দেখা হয় ওর। জোসেফ গিয়ে খবর দেয় হিণ্ডলেকে। খবর পেয়ে হিণ্ডলে বেরিয়ে আসে। দু'চারটে প্রশ্ন করার পর হীথক্লিফকে ও ভেতরে যেতে বলে। হিণ্ডলে কয়েকজনের সঙ্গে তাস খেলছিলো তখন। হীথক্লিফও খেলতে লেগে যায় ওদের সাথে। হিণ্ডলে কিছু টাকা হারে ওর কাছে। এরপর হীথক্লিফের কাছে মোটা টাকা আছে বুঝতে পেরে হিণ্ডলে ওকে বলে সন্ধ্যায় আবার যেতে এবং ওখানে থাকতে।'

'তোমার ভয় করছে না, মিসেস লিনটন, হীথক্লিফ ওবাড়িতে থাকবে?'

'না, হীথক্লিফকে নিয়ে চিন্তা নেই আমার। ওর শক্ত মাথা সব বিপদ থেকে বাঁচাবে ওকে। আমার ভয় হিণ্ডলেকে নিয়ে। তবে ওর যা দশা এখন তার চেয়ে খারাপ কিছু কি হওয়ার আছে? তবু হীথক্লিফ যদি কিছু করতে চায় আমি পারবো ওকে ঠেকাতে; এটুকু ক্ষমতা আমার আছে ওর ওপর।'

হীথক্লিফ, বা মিস্টার হীথক্লিফ প্রথম দিকে খুব একটা ঘন ঘন এলো না থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে। আমার ধারণা ওর আসায় মিস্টার লিনটনের ওপর কতখানি প্রতিক্রিয়া হয় এ সময় ও তার হিশেব কষছিলো। ক্যাথরিনও সাবধান হয়ে গেছে, ওকে দেখে আর তত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। কিছুদিন পর আস্তে আস্তে নিয়মিত হয়ে উঠতে লাগলো হীথক্লিফের আসা। এডগারের প্রথম দিনের সন্দেহও আস্তে আস্তে দূর হয়ে যেতে লাগলো ওর মার্জিত, ভদ্র ব্যবহার আর ওর প্রতি স্ত্রীর উচ্ছ্বাসহীন আচরণ দেখে।

কিন্তু শিগগিরই নতুন এক কারণ ঘটলো উদ্বিগ্ন হওয়ার। মিস্টার লিনটন এবং আমিও খেয়াল করলাম ইসাবেলা যেন একটু একটু ক'রে অনুরক্ত হয়ে উঠছে হীথক্লিফের। আঠারো বছরের সুদর্শনা যুবতী তখন ইসাবেলা। অনেক দিক থেকে কাঁচা হলেও বেশ বুদ্ধিমতী। ওর সবচেয়ে বড় গুণ, সহজে রাগে না। এডগার ওকে প্রাণ দিয়ে স্নেহ করে, ভালোবাসে।

এই ইসাবেলার ক্ষুধা কমতে শুরু করলো হীথক্লিফ ফিরে আসার ক'দিন পর থেকে। খাওয়ার চেয়ে অন্য কিছুর দিকে যেন ওর আগ্রহ বেশি। আরেকটা ব্যাপার, আগে যে মেয়ে কিছুতেই রাগতো না, হাসি ছাড়া যার মুখে কিছু দেখা যেতো না সে এখন কথায় কথায় রেগে ওঠে, হাসে কদাচিৎ।

আমরা সবাই বুঝতে পারলাম, কিছু একটা বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছে মিস লিনটনের মনকে।।

একদিন তুচ্ছ কোনো ব্যাপারে সামান্য বকা লাগালো ক্যাথি ইসাবেলাকে। এটুকু বকায় আগে হাসিটাও দূর হতো না ওর মুখ থেকে। এদিন ভেঙে পড়লো কান্নায়। ক্যাথরিন তো অপ্রস্তুত।

'আজকাল কথায় কথায় এমন ছিঁচকাঁদুনে হয়ে ওঠো কেন তুমি?' রেগে জিজ্ঞেস করলো সে। 'নিশ্চয়ই শক্ত কোনো অসুখ আসছে তোমার। এলেন, ডাক্তার কেনেথকে খবর পাঠাও তো।'

'আমার শরীর একদম ঠিক আছে,' কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করলো ইসাবেলা। 'তুমি দুর্ব্যবহার করো বলেই আজকাল আমার মেজাজ ঠিক থাকে না।'

'কী—কী?' সবিস্ময়ে চিৎকার ক'রে উঠলো ক্যাথি। 'আমি—আমি তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করি! এতবড় কথা বলতে পারলে তুমি? বলো, কখন তোমার সাথে আমি দুর্ব্যবহার করেছি?'

'কাল,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো ইসাবেলা, 'আর এখন!'

'কাল! কখন?'

'মাঠে যখন হাঁটছিলাম। আমাকে বললে যেখানে খুশি যেতে, আর তুমি হাঁটতে লাগলে হীথক্লিফের সাথে!'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটার মুখের দিকে। ক্যাথরিন হেসে ফেললো।

'এই তোমার দুর্ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা?' বললো সে। 'আমি ও কথা বলেছিলাম তোমাকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে নয়। আমাদের কথা শুনতে শুনতে তুমি হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠবে এটুকুই শুধু ভেবেছিলাম আমি।'

'না, না,' কাঁদতে কাঁদতে বললো ইসাবেলা, 'তুমি আমাকে সরিয়ে দিতেই চেয়েছিলে, কারণ তুমি বুঝতে পেরেছিলে আমি ওখানে থাকতে চাই।'

'কী বলছে ও?' আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো মিসেস লিনটন।

'আমি চাই ওর কাছে থাকতে,' বলে চললো ইসাবেলা, 'আর তুমি সব সময় চাও আমাকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে দিতে। তুমি চাও না তোমাকে ছাড়া আর কাউকে মানুষ ভালোবাসুক।'

আমার দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকালো ক্যাথি।

'পাগল হয়ে গেছে নাকি? ইসাবেলা, নিশ্চয়ই তুমি সত্যি কথা বলছো না! তুমি—তুমি হীথক্লিফকে পছন্দ করো!'

'আমি ভালোবাসি ওকে,' বললো মেয়েটা। 'তুমি এডগারকে যতটুকু বাসো তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি আমি ওকে। ও-ও হয় তো বাসতো

আমাকে যদি তুমি সে সুযোগ দিতে!'

'তোমার জায়গায় আমি হলে কক্ষনো এমন ভাবতাম না,' বললো ক্যাথরিন। ইসাবেলা, তুমি কিছু জানো না ওর সম্পর্কে। আমি জানি—এলেনও জানে। নেলি, ওকে বলো তো হীথক্লিফ কী জিনিস। ওর মতো হিংস্র বুনো স্বভাবের মানুষ হয় না, ইসাবেলা! বিশ্বাস করো আমার কথা। ওর স্বভাব সম্পর্কে জানলে তুমি এমন স্বপ্ন দেখতে না। তুমি ভাবছো সুযোগ পেলে ও তোমাকে ভালোবাসবে। ওহ, ইসাবেলা, ইসাবেলা, তুমি জানো না তুমি কী ভাবছো। লিনটন পরিবারের মেয়েকে ও ভালোবাসতে পারে না! তবে হ্যাঁ, সুযোগ পেলে তোমাকে ও বিয়ে করতে পারে, কেন জানো?—তোমার টাকার জন্যে—হ্যাঁ, তোমার টাকার জন্যে। আমি ওর বন্ধু—সেই ছেলেবেলা থেকে—আমি ওকে চিনি!'

দু'চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে ক্যাথরিনের দিকে তাকালো ইসাবেলা।

'বন্ধু!' চিৎকার করলো সে। 'ছি! বিশটা শত্রুর চেয়ে তুমি খারাপ। বন্ধু সম্পর্কে যে এমন নীচ কথা বলতে পারে তার মতো বন্ধু না থাকাই ভালো।'

'তুমি ভাবছো আমি স্বার্থপরতা থেকে এসব বলছি? বেশ! নিজেই তাহলে চেষ্টা ক'রে দেখ, চিনে নাও ওকে। আমি আর তোমার জন্যে কোনোদিন কিছু করবো না!'

বেরিয়ে গেল মিসেস লিনটন। ইসাবেলা ফিরলো আমার দিকে।

'সবাই আমার বিপক্ষে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো সে। 'এসব কথা সত্যি নয়, তাই না, এলেন? মিস্টার হীথক্লিফ শয়তান নয়। সত্যিকারের একটা মন আছে তাঁর, নইলে ক্যাথরিনের কথা মনে রেখেছে কেমন ক'রে?'

'ওর কথা আর মনে ঠাঁই দিও না তুমি, মিস,' শান্তকণ্ঠে আমি বললাম। 'লোকটা সত্যিই খারাপ, তোমার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত নয় কোনোভাবেই। মিসেস লিনটন একটু রূক্ষভাবে বলেছে, কিন্তু সত্যি কথাই বলেছে। হীথক্লিফকে ওর চেয়ে ভালো আর কেউ চেনে না। তাছাড়া ভেবে দেখ, ভালো লোকরা কখনো লুকায় সে জীবনে কী কী করেছে? ওয়াদারিং হাইটস থেকে পালানোর পর ও কোথায় থেকেছে, কী করেছে কোনোদিন বলেছে কাউকে? কী ক'রে ও ধনী হলো? তারপর, এখন ওয়াদারিং হাইটসে থাকে কেন ও—যে লোকটাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে তার বাড়িতে? কোনো ভালো লোক এটা করতে পারে? ও আর হিণ্ডলে আর্নশ সারারাত জেগে মদ খায় আর তাস খেলে। হিণ্ডলে ওর কাছ থেকে জমি বন্ধক দিয়ে টাকা নিচ্ছে। জোসেফের কাছে শুনেছি এসব কথা, সেদিন গিমারটনে দেখা হয়েছিলো আমার ওর সাথে। জোসেফ লোকটা খারাপ, কিন্তু ও কখনো মিথ্যে বলে না—'

'তুমিও ক্যাথরিনের মতোই বাজে, নেলি!' আমাকে থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করলো প্রেমে পাগল মেয়েটা। 'তোমাদের এই সব বানানো গল্প আমি আর শুনতে

চাই না!'

পরদিন কী এক কাজে যেন শহরে যেতে হলো মিস্টার এডগারকে। হীথক্লিফ জানতো একথা এবং সেদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ আগে হাজির হলো গ্র্যাঞ্জে।

ক্যাথরিন আর ইসাবেলা বসে আছে পড়ার ঘরে। এক ঘরে থাকলেও দু'জনেরই মুখ গম্ভীর, কেউ কথা বলছে না কারো সাথে। জানালা দিয়ে হীথক্লিফকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো ক্যাথরিন; হাসি ফুটে উঠলো মুখে। কিন্তু ইসাবেলা হীথক্লিফকেও দেখেনি ক্যাথরিনের হাসিও দেখেনি; কী ঘটতে চলেছে সেসম্পর্কে কোনো আভাসই পেলো না সে। দরজা খুলে হীথক্লিফ যখন ঘরে ঢুকলো তখন আর পালানোর উপায় নেই ওর।

'এসো, এসো,' বললো ক্যাথরিন, 'দু'জন মানুষ এখানে বসে আছে বিষণ্নমনে তৃতীয় জনের জন্যে। হীথক্লিফ, তোমাকে এখন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো যে আমার চেয়েও বেশি পছন্দ করে তোমাকে। না, না, সে নেলি নয়, ওর দিকে তাকিও না! আমার বেচারি ননদিনী তোমার কথা ভেবে ভেবে ওর হৃদয় ভেঙে ফেলছে—তোমার পৌরুষদীপ্ত চেহারা ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে! না, ইসাবেলা, পালালে চলবে না!' ছোঁ মেরে ধরে ফেললো ক্যাথি ইসাবেলার হাত। 'বুঝলে, হীথক্লিফ, আমরা দু'জন তোমাকে নিয়ে বিড়ালের মতো ঝগড়া করছিলাম। আমার ননদিনীর ধারণা আমি দয়া ক'রে পথ থেকে সরে দাঁড়ালে ও তোমাকে চিরদিনের জন্যে নিজের ক'রে নিতে পারে।'

'কী বলছো এসব, ক্যাথরিন!' চিৎকার করলো ইসাবেলা। 'মিস্টার হীথক্লিফ, দয়া ক'রে আপনার বন্ধুকে বলুন আমাকে ছেড়ে দিতে। ও ভুলে গেছে আপনি আর আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নই। আর, ওর কাছে যা মজার ব্যাপার আমার কাছে তা চরম বেদনার।'

হীথক্লিফ কিছু না বলে বসলো একটা আসনে। ইসাবেলার দিকে তাকালো এমন এক চাহনিতে যার অর্থ—ও কী অনুভব করে না করে তাতে তার কিছু আসে যায় না!

'ছেড়ে দাও আমাকে, ক্যাথরিন!' ফিস ফিস ক'রে বললো ইসাবেলা।

'না, ছাড়বো না,' বললো মিসেস লিনটন। 'তুমি থাকবে। কী ব্যাপার, হীথক্লিফ, এমন একটা সুসংবাদ দিলাম, কিন্তু তোমার মুখে খুশির কোনো ছাপ দেখছি না! ইসাবেলা শপথ ক'রে বলেছে এডগারকে আমি যতটুকু ভালোবাসি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসে ও তোমাকে।'

'আমার মনে হয় তুমি ভুল বুঝেছো নয় তো ভুল শুনেছো,' বললো হীথক্লিফ। 'ও এখান থেকে চলে যেতে চাইছে।'

তীব্র বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে ইসাবেলার দিকে তাকালো সে, যেন কুৎসিত কোনো

জন্তু দেখছে। তার এ চাউনি সহ্য করতে পারলো না ইসাবেলা। লাল-শাদা-লাল-শাদা—দ্রুত বদলাতে লাগলো ওর মুখের রঙ। জল এসে গেল চোখে। সেই সাথে চেষ্টা করতে লাগালো টানাটানি ক'রে ক্যাথরিনের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার। কিন্তু ক্যাথরিন সর্বশক্তিতে ধরে আছে হাতটা। শেষে নিরুপায় হয়ে নখ বসিয়ে দিলো ইসাবেলা ওর হাতে।

'উহ্, বিল্লী কোথাকার!' চিৎকার ক'রে উঠে ইসাবেলার হাত ছেড়ে দিলো ক্যাথি। 'ঠিক আছে, যাও, গিয়ে লুকাও কোথায় লুকাবে! কিন্তু ওর সামনে তোমার ঐ থাবার শক্তি দেখালে কী মনে ক'রে? কী ভাবলো ও? দেখ, হীথক্লিফ, দেখ, কেমন ভয়ানক অস্ত্র ওর নখগুলো। ওর সাথে যদি কিছু করো চোখদুটো তোমার সাবধানে রেখো।'

'আমার দিকে যদি থাবা বাড়ায় আমি ওর ঐ নখ উপড়ে নেবো আঙুল থেকে!' ইসাবেলা বেরিয়ে যেতেই ক্রুর কণ্ঠে বললো হীথক্লিফ। 'কিন্তু, ক্যাথি, ওর পেছনে লাগলে কেন তুমি আজ? নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলছো না?'

'সত্যি কথাই বলছি,' ঝাঁঝের সাথে বললো ক্যাথরিন। 'কয়েক দিন ধরে তোমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে মেয়েটা। আমার ওপর রেগে গেছে কারণ আমি বলেছি তুমি খারাপ লোক। যাকগে, এ নিয়ে আর ভেবো না।'

'আমি ওকে মোটেই পছন্দ করি না,' বললো হীথক্লিফ। ঐ মোমের মতো মুখের সাথে যদি আমাকে এক বাড়িতে একা কাটাতে হয় নির্ঘাৎ ওর কপালে দুঃখ আছে! দু'এক দিন পরপরই ওর ঐ নীল চোখ কালো হয়ে যাবে। তোমার স্বামীর চোখের সাথে এত মিল চোখ দুটোর!'

'যা-ই বলো, অদ্ভুত সুন্দর ওদের চোখ। একেবারে দেবদূতের মতো!'

'ভাই মারা গেলে সব সম্পত্তি ও পাবে, তাই না?'

'বোধ হয় না, দূর সম্পর্কের ভাস্তে-ভাস্তি আছে ওদের। তাছাড়া এডগারের ছেলে হওয়ার সময় তো এখনো পেরিয়ে যায়নি। কিন্তু, এসব কথা থাক, অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করি আমরা এসো।'

'ইসাবেলা লিনটন নির্বোধ হতে পারে কিন্তু পাগল নয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো হীথক্লিফ। 'যা হোক, তোমার কথাই সই, এসব ভুলে যাওয়াই ভালো।'

ওরা বন্ধ করলো এ বিষয়ক আলাপ। ক্যাথরিন সম্ভবত ভুলেও গেল প্রসঙ্গটা। কিন্তু হীথক্লিফ, আমার ধারণা, ভুললো না। সে-সন্ধ্যায় অনেক বারই তার মাথায় ঘুরে ফিরে এলো চিন্তাটা। লক্ষ করলাম, মাঝে মাঝেই নিজের মনে হেসে উঠছে ও, ক্রুর হয়ে উঠছে দৃষ্টি। নিশ্চয়ই কিছু একটা ফন্দি আঁটছে ও মনে মনে।

আট

ভীষণ দুশ্চিন্তার ভেতর দিন কাটতে লাগলো আমার। হীথক্লিফের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করলাম। এবং যে কোনো ব্যাপারে ক্যাথরিনের চেয়ে মনিবের পক্ষ নিতে লাগলাম বেশি ক'রে। কারণ আর যা-ই হোক এডগার লিনটন মানুষটা ভালো—দয়ালু, সৎ এবং সম্মানী। ক্যাথরিন যে অসৎ তা বলবো না, তবে ওর নীতির ওপর বিশেষ আস্থা নেই আমার। আমি মনেপ্রাণে চাইছি, এমন কিছু ঘটুক যাতে ওয়াদারিং হাইটস এবং থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জ—দুটো বাড়িই হীথক্লিফের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়; আমরা আবার ফিরে যাই ও আসার আগের অবস্থায়। গ্র্যাঞ্জে যখন ও আসে তখন আমার মনে হয় ভয়ানক কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমার বিশ্বাস এডগারেরও তা-ই মনে হয়। ওর ওয়াদারিং হাইটসে থাকাটাও আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। কেন তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। আমার মনে হয় এক অশুভ জন্তু যেন আসা যাওয়া করছে হাইটস আর গ্র্যাঞ্জের ভেতর। অপেক্ষা করছে ঠিক সময়টার জন্যে। সময় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ ক'রে ফেলবে আমাদের।

কখনো কখনো এসব ভাবতে ভাবতে এমন উতলা হয়ে উঠি যে মনে হয়, যাই দেখে আসি ওয়াদারিং হাইটসে কী ঘটছে, গিয়ে আর কিছু না হোক মিস্টার হিণ্ডলেকে সতর্ক ক'রে আসতে পারবো হীথক্লিফ সম্পর্কে। তারপরই মনে হয় কী লাভ হিণ্ডলেকে বলে? যে শেষ হয়ে যাবে বলে পণ করেছে তাকে বাঁচানোর কী উপায় থাকতে পারে?

একদিন গিমারটনে যাচ্ছি আমি। পথ চলতে চলতে পৌঁছুলাম বহুদিনের পুরনো সেই গেটটার সামনে। হঠাৎ ক'রেই তীব্র ইচ্ছা জাগলো হাইটসে যাওয়ার। পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করলাম বাড়িটার দিকে। ভেতরের ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে দেখি কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ওটার কাছে।

প্রথমে আমার কে যেন-ই মনে হলো। কিন্তু আরেকটু এগোতে দেখলাম বাদামী চোখের এক ছেলে ফটকের বাতায় গাল চেপে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল, ও কে। হেয়ারটন! আমার হেয়ারটন! দশ মাস আগে যখন ওকে ছেড়ে যাই তখন যেমন ছিলো এখনো প্রায় তেমনই আছে। সব ভয়, সব উৎকণ্ঠা ভুলে ছুটে গেলাম আমি।

'কেমন আছো, সোনা!' চিৎকার করলাম। 'হেয়ারটন, আমি নেলি—নেলি, তোমার দাই মা।'

সাঁ ক'রে পিছিয়ে আমার নাগালের বাইরে চলে গেল ও। একটা ঢিল তুলে নিলো।

'তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, হেয়ারটন,' আবার বললাম আমি।

ওর আচরণ দেখে মনে হলো নেলিকে ওর মনে নেই। যদি থেকেও থাকে, এখনকার আমি হিশেবে নেই। ঢিল ধরা হাতটা উঁচু করলো হেয়ারটন। আমি কথা বলে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাভ হলো না। ঢিলটা ছুঁড়ে মারলো ও। আমার হ্যাটে লাগলো ওটা। এরপর হেয়ারটন তুড়ে গালাগাল দিতে লাগলো আমাকে, জঘন্য জঘন্য সব কসম কাটতে লাগলো। ওর বয়েসী কোনো বাচ্চার মুখে অমন গালাগাল, কসম আমি কল্পনা করতে পারি না। কেঁদে ফেলার দশা হলো আমার। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা কমলা বের ক'রে সাধলাম ওকে। একটু ইতস্তত ক'রে এগিয়ে এলো হেয়ারটন। কমলাটা নিলো। আরেকটা কমলা বের করলাম আমি। এটা ওর নাগালের বাইরে রেখে জিজ্ঞেস করলাম:

'এই সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা কে শিখিয়েছে তোমাকে? পাদ্রী?'

'পাদ্রী একটা গাধা! তুমিও! দাও ওটা আমাকে!'

'দেবো। কিন্তু আগে বলো কার কাছ থেকে এসব শিখেছো?'

'শয়তান বাবার কাছ থেকে।'

'আর কিছু শেখোনি?'

'ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, আর কিছু না। বাবা আমাকে পছন্দ করে না, আমি ওকে গালি দেই যে।'

'বাবাকে গালি দেয়া কে শিখিয়েছে?—শয়তান?'

'না, হীথক্লিফ।'

হীথক্লিফ! হীথক্লিফকে পছন্দ তোমার?'

'হ্যাঁ। বাবা আমার সাথে যেমন করে ও-ও বাবার সাথে তেমন করে। বাবা আমাকে গালি দেয় বলে ও গালি দেয় বাবাকে। ও বলে যা খুশি তাই করতে পারি আমি।'

'পাদ্রী এখন আর তোমাকে লেখা পড়া করতে বলেন না?'

'না। হীথক্লিফ বলেছে, ওয়াদারিং হাইটসের ধারে কাছে দেখলে ও পাদ্রীর দাঁত গলা দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।'

আমি ওর হাতে কমলাটা দিয়ে বললাম, 'যাও, সোনা, বাবাকে বলো, নেলি ডীন এসেছে, দেখা করতে চায়।'

চলে গেল হেয়ারটন। কিন্তু একটু পরে হিণ্ডলের বদলে দরজায় দেখা গেল হীথক্লিফকে। ওর কালো মূর্তিটা দেখে আমার যে কী হলো আমি বলতে পারবো না, ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলাম বাঘের তাড়া খাওয়া হরিণীর মতো।

পরেরবার যখন হীথক্লিফ গ্র্যাঞ্জে এলো, মিস ইসাবেলা তখন বাগানে পাখিদের খাওয়াচ্ছে। তিনদিন ধরে ভাবীর সঙ্গে কথা বন্ধ তার। ইদানীং অবস্থা এমন যে

ওদের কথাবার্তা মানেই ঝগড়া। সুতরাং কথা বন্ধ থাকায় আমরা কাজের লোকেরা খুশি, বাড়িতে অন্তত শান্তি বিরাজ করছে।

হীথক্লিফ ফটক থেকেই দেখতে পেলো ইসাবেলাকে। দ্রুত একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো কেউ আছে কিনা। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম রান্নাঘরের জানালায়। তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে এলাম যাতে ওর চোখে পড়ে না যাই। আশপাশে কেউ নেই দেখে এগিয়ে এলো হীথক্লিফ। ইসাবেলার কাছে পৌঁছে কিছু বললো। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে পিছিয়ে যেতে দেখলাম ইসাবেলাকে। ওর হাত ধরলো হীথক্লিফ। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালো ইসাবেলা। হীথক্লিফ দ্রুত আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলো চারপাশে। তারপর কাছে টেনে চুমু খেলো মেয়েটাকে।

'উহ, বদমাশ!' রুদ্ধশ্বাসে বিড় বিড় ক'রে উঠলাম আমি।

'কে, নেলি?' আমার কনুইয়ের কাছে থেকে শুনতে পেলাম ক্যাথরিনের গলা। কখন ও ঘরে ঢুকেছে টের পাইনি।

'তোমার প্রাণের বন্ধু হীথক্লিফ!' ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম আমি। 'আহ্, দেখেছে আমাদের, নিশ্চয়ই এবার ভেতরে আসবে। এসে মিস ইসাবেলাকে চুমু খাওয়ার কী কৈফিয়ত দেয় দেখি।'

ক্যাথরিন দেখলো হীথক্লিফের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাগান থেকে ছুটে পালালো ইসাবেলা। এক মিনিট পর দরজা খুলে ভেতরে এলো শয়তানটা।

'কী করছিলে তুমি, হীথক্লিফ?' ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলো ক্যাথরিন। 'ঝামেলা না বাঁধিয়ে ছাড়বে না? তোমাকে না বলেছি ইসাবেলার পেছনে লাগবে না? এডগার এখানে আসতে নিষেধ করুক তোমাকে তা-ই চাও?'

'আশাকরি সে চেষ্টাও করবে না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো শয়তানটা। 'ঈশ্বর ওর মেজাজ শান্ত রাখুন। নইলে অকালে বেচারা স্বর্গে যাবে।'

'চুপ করো!' চিৎকার করলো ক্যাথরিন। 'ইসাবেলা স্বেচ্ছায় তোমার কাছে এসেছিলো?'

'তা দিয়ে তোমার কী দরকার? কেউ যদি সুযোগ দেয় আমার নিশ্চয়ই অধিকার আছে তাকে চুমু খাওয়ার। তুমি বাধা দেয়ার কে? আমি তোমার স্বামী নই। তাহলে কেন তুমি ঈর্ষা করবে আমাকে?'

'আমি ঈর্ষা করছি না, দুশ্চিন্তা করছি তোমাকে নিয়ে। ইসাবেলাকে পছন্দ হলে বিয়ে করবে, তাতে কারো আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু সত্যিই তুমি ওকে পছন্দ করো? সত্যি ক'রে বলো, হীথক্লিফ। এই তো—কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে! আমি জানি তুমি ওকে পছন্দ করো না।'

'তাছাড়া মিস্টার লিনটন কি অনুমতি দেবেন ঐ লোকটার সাথে বোনের বিয়েতে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তা দেবে যদি ইসাবেলা চায়,' বেশ আস্থার সঙ্গে জবাব দিলো মিসেস

লিনটন।

'এ নিয়ে ওকে মাথা ঘামাতে হবে না,' বললো হীথক্লিফ। 'ওর অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। আর, ক্যাথরিন, আমার মনে হয় সময় হয়েছে তোমাকে কয়েকটা কথা বলার। শোনো, আমি চাই তোমার মনে এ বোধোদয় হোক যে, তুমি খুবই খারাপ আচরণ করেছো আমার সাথে। শুনছো? যদি ভেবে থাকো আমি সেটা বুঝতে পারিনি তাহলে বোকামি করছো। যদি ভেবে থাকো দু'চারটে মিষ্টি কথায় আমার মনের শান্তি ফিরিয়ে আনবে, আমাকে সুখী করবে, তাহলে বলবো আরো বড় বোকামি করছো। আর যদি ভেবে থাকো আমি মনে মনে জ্বলবো শুধুই, প্রতিশোধের কথা ভাববো না তাহলে শুনে রাখো, শিগগিরই দেখতে পাবে কেমন বোকার স্বর্গে তুমি বাস করছো। তবে হ্যাঁ, ননদিনীর গোপন কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছো বলে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। কথা দিচ্ছি, ওর দুর্বলতার সুযোগ যতটা সম্ভব আমি নেবো। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নেবো!'

এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিলো ক্যাথরিন। হীথক্লিফ থামতেই ফেটে পড়লো, 'আমি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করেছি? প্রতিশোধ নেবে? বুঝতে পারছি এডগারের সাথে গণ্ডগোল না বাঁধিয়ে তুমি ছাড়বে না! ঠিক আছে, হীথক্লিফ, তোমার ইচ্ছা হলে বাঁধাও গণ্ডগোল, ঠকাও এডগারের বোনকে। আমার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার একেবারে মোক্ষম অস্ত্রটাই বেছে নিয়েছো!' শেষ বাক্যটা উচ্চারণের সময় চরম হতাশা ধ্বনিত হলো ক্যাথরিনের স্বরে।

'তোমার ওপর কোনো প্রতিশোধ আমি নিতে চাই না,' শান্ত কণ্ঠে বললো হীথক্লিফ।

আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো মিসেস লিনটন। সেখানেই বসে পড়লো আস্তে আস্তে। মুখে একই সাথে ফুটে উঠেছে হতাশা আর ক্রোধ। হীথক্লিফ বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কুটিল দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে।

হঠাৎ করেই একটা সিদ্ধান্তে এলাম আমি। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খোঁজ করতে লাগলাম মনিবের। পড়ার ঘরে পেলাম তাকে। অবাক হয়ে তখন সে ভাবছে, এতক্ষণ ধরে রান্নাঘরে কী করছে ক্যাথি।

'ক্যাথিকে দেখেছো, এলেন?' আমি ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলো মিস্টার লিনটন।

'রান্নাঘরে, স্যার,' বললাম আমি। 'মিস্টার হীথক্লিফের ব্যবহারে ভেঙে পড়েছেন উনি। আমার মনে হয়, স্যার, ভদ্রলোকের আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করার সময় হয়েছে।'

'কী হয়েছে, নেলি?' উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করলো এডগার।

বাগানে যা ঘটেছে বললাম, তারপর বললাম রান্নাঘরে ক্যাথির সঙ্গে হীথক্লিফের যা যা আলাপ হয়েছে সব। শেষ পর্যন্ত শুনতে বেশ কষ্ট করতে হলো মিস্টার লিনটনকে।

'অসহ্য!' চিৎকার ক'রে উঠলো সে। 'আমার মান সম্মান আর কিছু রইলো না! অমন জঘন্য একটা লোক বন্ধু ক্যাথির! তাতেও মুক্তি নেই, আমার নিজেকে আবার সঙ্গ দিতে হবে তাকে! ওহ্ ঈশ্বর! এলেন, গোলা ঘর থেকে দুটো লোক ডেকে নিয়ে এসো তো! আজই চুকিয়ে ফেলবো এ পাট।'

আমি ছুটলাম গোলা ঘরের দিকে। দু'জন লোককে ডেকে নিয়ে এসে দেখি মনিবও নেমে এসেছে নিচে। লোক দু'জনকে উঠানে অপেক্ষা করতে বলে রান্নাঘরে ঢুকলো সে। পেছন পেছন আমি। ক্যাথরিন আর হীথক্লিফ তখনো কথা কাটাকাটি করছে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে। হীথক্লিফ দাঁড়িয়ে আছে জানালার কাছে। মুখ নিচু, মনে হচ্ছে ক্যাথরিনের রাগের কিছুটা হলেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে ওর ওপর। এডগারকে দেখেই থেমে গেল দু'জন।

'আশ্চর্য!' গর্জে উঠলো লিনটন, 'জন্তুটা এভাবে কথা বলছে তোমার সাথে তারপরও তুমি দাঁড়িয়ে আছো এখানে! ওর কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনে তুমি অভ্যস্ত, তাই না? ভেবেছিলে আমিও অভ্যস্ত হয়ে উঠবো?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলে তুমি?' এমন এক স্বরে প্রশ্নটা করলো ক্যাথি যে স্বর শুনলেই চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠবে যে কোনো মানুষ।

হীথক্লিফ হেসে উঠলো বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। সম্ভবত ক্যাথরিনের দিক থেকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইলো এডগারের মনোযোগ। সফল হলো সে।

'এতদিন আমি কিছু বলিনি,' শান্ত কণ্ঠে বললো মিস্টার লিনটন, 'তোমাকে আসতে দিয়েছি আমার বাড়িতে। কারণ আমার মনে হয়েছিলো তোমার বদ স্বভাবের জন্যে তুমি পুরোপুরি দায়ী; তাছাড়া আমার স্ত্রীর মনে নরম একটা কোণ আছে তোমার জন্যে। কিন্তু এখন দেখছি তোমার উপস্থিতি বিষিয়ে তুলছে আমার বাড়িটাকে। তুমি আর কক্ষনো আসবে না এখানে। তিন মিনিট সময় দিচ্ছি—এর ভেতর বেরিয়ে না গেলে চাকররা ঘাড় ধরে বের ক'রে দেবে তোমাকে!'

এডগারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো হীথক্লিফ। তারপর ব্যঙ্গের সঙ্গে বলে উঠলো: 'ক্যাথি, তোমার ভেড়াটা দেখছি ষাঁড়ের মতো ভয় দেখাচ্ছে আমাকে! ঈশ্বরের কসম, মিস্টার লিনটন, তোমার মতো দুবলা পাতলা ভেড়ার গায়ে হাতটা তুলতেও বাধবে আমার!'

আমার দিকে তাকালো লিনটন। বাইরে দাঁড়ানো লোক দুটোকে ডাকার ইশারা করলো। আমি এগোলাম দরজার দিকে। মিসেস লিনটন নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারলো আমি কী করতে যাচ্ছি। এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে সে ছুটে গিয়ে দড়াম ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো দরজা। তালা মেরে চাবি হাতে গিয়ে দাঁড়ালো স্বামীর সামনে।

'লড়াই করো!' স্বামীর ক্রুদ্ধ বিস্ময়ের জবাবে সে বললো। 'যদি সে সাহস না থাকে তো মাফ চাও, নইলে মার খাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এতে তোমার শিক্ষা হবে,

যতটুকু না সাহসী তার চেয়ে বেশি দেখানোর ইচ্ছা তোমার আর কখনো হবে না। না; চাবি তুমি পাবে না। তোমার হাতে যাওয়ার আগে এটা আমি গিলে ফেলবো দরকার হলে।'

চাবিটা জোর ক'রে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো এডগার। কিন্তু ক্যাথরিন চোখের পলকে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো আগুনের একেবারে গনগনে অংশে। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল এডগারের। থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো তার সর্বাঙ্গ। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলো না সে। একটা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মুখ ঢাকলো দু'হাতে।

'ওহ, ঈশ্বর! এই সাহস তোমার!' বিদ্রূপের সুরে বললো তার স্ত্রী। 'ভয় নেই, হীথক্লিফ আঙুলটাও ছোঁয়াবে না তোমার গায়ে। ঠিকই বলেছে ও, ভেড়া তুমি। ভেড়ারও অধম—

'আর একেই তোমার বেশি পছন্দ হয়েছিলো আমার চেয়ে!' ঘৃণার সঙ্গে বললো হীথক্লিফ। 'ভীতুর ডিমটাকে হাত দিয়ে মারবো না আমি, লাথি লাগাবো পা দিয়ে। কাঁদছে নাকি? না জ্ঞান হারাচ্ছে ভয়ে?'

এগিয়ে এসে এডগার যে চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে সেটায় ঠেলা লাগালো সে রুক্ষভাবে।

তারপরই সবিস্ময়ে দেখলাম, লাফ দিয়ে সোজা হলো আমার মনিব। ধাঁ ক'রে সর্বশক্তিতে এক ঘুসি বসিয়ে দিলো হীথক্লিফের গলায়। অন্য যে কেউ ঐ ঘুসি খেয়ে পড়ে যেতো, কিন্তু হীথক্লিফ সোজাই রইলো। তবে দু'হাতে গলা চেপে ধরতে হলো তাকে। মিনিট খানেক বা তারও বেশি শ্বাস বন্ধ হয়ে রইলো ওর। হীথক্লিফের সামলে উঠতে যতক্ষণ লাগলো তার ভেতর পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল এডগার।

'ব্যস! এখানে আসা শেষ তোমার,' চিৎকার করলো ক্যাথরিন। 'এবার ভাগো তাড়াতাড়ি। এক্ষুণি ফিরে আসবে ও বন্দুক এবং লোকজন নিয়ে। তোমাকে ক্ষমা করবে না! যাও, হীথক্লিফ—জলদি!'

'তুমি ভাবছো ঐ ঘুসি আমি নীরবে হজম করবো?' গর্জে উঠলো হীথক্লিফ। 'কক্ষনো না! এই জায়গা ছেড়ে যাওয়ার আগে ওর হাড়গুলো একটা একটা ক'রে ভাঙবো আমি বাদামের খোসার মতো! এখন যদি না পারি তো পরে কখনো ভাঙবো, এবং তখন ওর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং ওকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও যা করার এখনি করতে দাও আমাকে!'

এই সময় জানালা দিয়ে বাইরে চোখ গেল আমার।

'উনি আসছেন না,' মিথ্যে ক'রে বললাম। 'কোচোয়ান আর দুই মালী আসছে ওঁর বদলে। তিন জনের হাতেই লাঠি। নিশ্চয়ই চাইছো না ওরা এসে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিক তোমাকে?'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই এসে গেল কোচোয়ান আর মালীরা; তাদের পেছনে এডগার। তিনজন আসছে শুনে বোধ হয় লড়ার ইচ্ছা দূর হয়ে গেছিলো হীথক্লিফের। কারণ দেখলাম, ওরা পেছনের দরজার মুখে পৌছুতে না পৌছুতে ও ছোঁ মেরে চুল্লীর পাশ থেকে লোহার আগুন খোঁচানীটা তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো সামনের দরজার সামনে। সর্বশক্তিতে লোহার দণ্ডটা দিয়ে ঘা মারলো তালায়। ভেঙে আলগা হয়ে গেল তালাটা। চোখের আরেকটা পলক ফেলতে না ফেলতে আমি দেখলাম ও বেরিয়ে গেছে বাইরে।

সবকিছু মিলিয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মিসেস লিনটন। এবার সে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে বললো তাকে ওপরে নিয়ে যেতে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমি আদেশ পালন করলাম। কারণ এ ঘটনায় আমার ভূমিকাটুকুর কথা জানতে পারেনি ও, পাছে জেনে ফেলে এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি আমি। দোতলায় উঠে পার্লারে ঢুকলো ও। ধপাস ক'রে বসে পড়লো একটা সোফায়।

'কী করবো আমি বুঝতে পারছি না, নেলি,' অস্থির কণ্ঠে বললো ক্যাথরিন। 'আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। হাজার হাজার হাতুড়ি ঘা মারছে আমার মাথায়। খেয়াল রেখো ইসাবেলা যেন না আসে আমার সামনে। ওর জন্যেই আজ হলো এসব। আর, নেলি, রাতে এডগারের সাথে যখন দেখা হবে, বোলো আমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছি। বানিয়ে বলছি না। মনে হয় সত্যিই আমি অসুখে পড়তে যাচ্ছি। কেন ও এসে শুনলো আমাদের কথা? ঠিকই আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে ইসাবেলার চিন্তা দূর ক'রে দিতাম হীথক্লিফের মাথা থেকে। এখন আমাদের সবাইকে কিছুদিন আলাদা থাকতে হবে।··· ঠিক আছে, হীথক্লিফকে যদি বন্ধু হিশেবে না রাখতে পারি, এডগার যদি ছোটলোকের মতো করে, ওদের দু'জনেরই হৃদয় আমি গুঁড়িয়ে দেবো নিজেকে শেষ ক'রে ফেলে। আর, এলেন, তুমি এমন ভাব দেখাবে যেন আমাকে নিয়ে বেশ উদ্বেগের ভেতর আছো।'

মনিবকে ভয় পাইয়ে দেয়ার বা তাকে আরো বেশি রাগিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। সুতরাং রাতে যখন দেখলাম এডগার পার্লারে ঢুকছে আমি কিছুই বললাম না। তবে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম স্বামী-স্ত্রীর আলাপ। প্রথমে কথা বললো এডগারই।

'যেখানে আছো সেখানেই থাকো, ক্যাথরিন।' বিন্দুমাত্র করুণা ধ্বনিত হলো না তার কণ্ঠে। 'আমি থাকবো না বেশিক্ষণ, একটা কথা শুধু জানতে এসেছি—'

'ওহ, ঈশ্বরের দোহাই!' মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করলো মনিবগিন্নী, 'ঈশ্বরের দোহাই এখন আর কিছু জানতে চেও না আমার কাছে! তোমার ঠাণ্ডা রক্ত কিছুতেই গরম হয় না! তোমার শিরা-উপশিরাগুলো বরফ মেশানো পানিতে ভর্তি হতে পারে, কিন্তু আমারগুলো টগবগ ক'রে ফুটছে। এর ভেতর তোমার ঐ শান্ত অবিচল ভঙ্গি গা জ্বালিয়ে দিচ্ছে আমার।'

'আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে চাইলে তাড়াতাড়ি জবাব দাও—জবাব দিতেই হবে তোমাকে। আমি জানি ইচ্ছে করলে তুমি আমার চেয়েও ঠাণ্ডা হতে পারো। বলো, তুমি হীথক্লিফকে ছাড়বে না আমাকে ছাড়বে? একই সঙ্গে আমার এবং ওর বন্ধু থাকতে পারবে না তুমি। এক্ষুণি জবাব চাই!'

'যাও! চলে যাও এখান থেকে!' গলায় যতটা জোর আছে সবটুকু দিয়ে চেঁচালো ক্যাথরিন। 'আমি বলছি, চলে যাও! দেখছো না আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না!'

ঘণ্টা বাজালো ও, এত জোরে যে ওটা ভেঙেই গেল। ভেতরে ঢুকলাম আমি, তবে সঙ্গে সঙ্গে না, একটু পরে, ধীরে সুস্থে। ঢুকে দেখি সত্যিই খেপে উঠেছে ক্যাথরিন। মাটিতে বসে সোফার হাতলে মাথা ঠুকছে সে দাঁত কিড়মিড় ক'রে। এডগার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে ভয়ার্ত চোখে।

'পানি নিয়ে এসো, এলেন!' রুদ্ধশ্বাসে বললো আমার মনিব।

পুরো এক গ্লাস নিয়ে এলাম আমি। এখন ক্যাথি খাবে না জানি তাই পানিটুকু ওর মুখে ঢেলে দিলাম। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হাত পা টান টান ক'রে ও শুয়ে পড়লো মাটিতে, চোখ উল্টে দিলো। মৃত্যুর মতো ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো মুখ। আতঙ্কিত হয়ে উঠলো এডগার। ভয় পেলাম আমিও। তবু ফিস ফিস ক'রে মনিবকে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই!'

'ঠোঁটে রক্ত দেখছো না!' কম্পিত কণ্ঠে বললো এডগার।

'ও কিছু না, আপনাকে একটু ভয় পাওয়াতে চাইছে!' জবাব দিলাম আমি। খুলে বললাম একটু আগে ও আমাকে যা বলেছে সে কথা।

দুর্ভাগ্য আমার, কথাগুলো জোরেই বললাম, এবং শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো ক্যাথি। চোখগুলো জ্বলতে লাগলো আগুনের মতো। এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমিও ছুটলাম পেছন পেছন। কিন্তু আমি কাছে পৌঁছানোর আগেই ও নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

পরদিন সকালে নাশতার সময় ক্যাথি নিচে নামলো না। খাবার ঘরে নিয়ে আসবো নাকি জানতে চাইলাম দরজার বাইরে থেকে।

'না!' জবাব দিলো ও, এবং আর কিছু বললো না।

একই প্রশ্ন করলাম দুপুরে ডিনারের সময়, চায়ের সময়, রাতে; এবং পরদিন। জবাব পেলাম একই।

মিস্টার লিনটন পড়ার ঘরে বন্দী করলো নিজেকে। স্ত্রীর কোনো খোঁজও নিলো না। একবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে আলাপ করলো ইসাবেলার সাথে। কথা বললো মূলত এডগারই। হীথক্লিফ কেমন খারাপ লোক সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলে বোনকে বোঝানোর চেষ্টা করলো ওকে বিয়ে করার চিন্তা দূরে থাক ওর বন্ধু হওয়ার চিন্তাও

কেমন ভয়ঙ্কর। কিন্তু হীথক্লিফকে প্রশ্রয় দেবে কি দেবে না এডগার যখন এই প্রশ্ন করলো ইসাবেলা বিড় বিড় করে কী জবাব দিলো সে বুঝতে পারলো না। সুতরাং ধরে নেয়া যায় আলাপের ফলাফলটা মোটেই সন্তোষজনক হলো না এডগারের জন্যে। তবে বোনকে সে সতর্ক করতে ভুললো না যে, হীথক্লিফকে প্রশ্রয় দিলে ওকে সে আর বোন বলে গণ্য করবে না। এর পরপরই দেখলাম কাঁদতে কাঁদতে বাগানের দিকে চলে গেল মেয়েটা। বাগান থেকে যখন ফিরলো তখনও ওর চোখে পানি।

নয়

তিন দিনের দিন দরজা খুললো মিসেস লিনটন। ওর ঘরে একটা জগে পানি থাকতো সবসময়। গত দু'দিনে সেই পানি শেষ করেছে। এখন আরেকটু চাইলো, আর চাইলো একটু খাবার। তারপর বললো, 'আমি মরে যাচ্ছি, নেলি!'

আমার মনে হলো মিথ্যে কথা বলছে ও। কথাটা নিজের মধ্যেই রাখলাম। মনিবকে কিছু জানালাম না। নিচে গিয়ে একটু চা আর খানকয় শুকনো টোস্ট এনে দিলাম। বুভুক্ষের মতো খেলো ও সব। তারপর লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। কাতর স্বরে বললো, 'মরে যাবো আমি! বেঁচে থাকবো কেন?—কেউ ভাবে না আমার কথা। আমার স্বামী কী করছে, এলেন?'

'পড়ার ঘরে, বই পত্রের ভেতর আটকেছেন নিজেকে। কী আর করবেন বেচারি, আর কোনো সাথী তো তাঁর নেই!'

ক্যাথি কতখানি অসুস্থ তখন বুঝলে নিঃসন্দেহে একথা বলতাম না আমি।

'বই!' চিৎকার করলো সে। 'ওহ্! বউ মরে যাচ্ছে আর উনি আছেন বই নিয়ে!' একটু পরে বিড়বিড় করতে লাগলো, 'না, মরবো না! আমি মরি তা-ই ও চাইছে। আমাকে আর ভালোবাসে না। আমি মরলে ও বেঁচে যাবে!' এরপর হঠাৎই পাগলের মতো দাঁতে কামড়ে বালিশটা কুটি কুটি করতে শুরু করলো ক্যাথরিন।

এবার একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না আমি। মনে হচ্ছে সত্যিই ও অসুস্থ; ভান নয়। বালিশের ছেঁড়া অংশে হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভর্তি তুলো বের ক'রে ছড়িয়ে দিলো ও ঘরে। আদেশ করলো আমাকে জানালা খুলে দেয়ার। তখন ভরা শীতকাল, তাছাড়া উত্তর-পুব দিক থেকে তীব্র হাওয়া বইছে। আমি রাজি হলাম না জানালা খুলতে।

এর পর ও যা করলো সেটা আরো ভয় ধরিয়ে দেয়ার মতো। একটু আগে হয়ে উঠেছিলো হিংস্র এবার হয়ে গেল শিশু। ছেলে বেলায় ও আর হীথক্লিফ মাঠে গিয়ে

যে সব পাখি দেখতো সেগুলোর নাম ধরে ডাকতে লাগলো।

কিছুক্ষণ চুপ ক্যাথরিন। তারপর হঠাৎ ধরলো আমাকে।

'নেলি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ও, 'আমার মনে হচ্ছিলো আমি আমাদের বাড়িতে—ওয়াদারিং হাইটসে ফিরে গেছি; শুয়ে আছি আমার ঘরে। আমার মাথার ভেতর কেমন যেন করছে। কিছু বোলো না, শুধু থাকো আমার সাথে। একা ঘুমাতে ভয় করে আমার। খালি দুঃস্বপ্ন দেখি।'

'ভালো ক'রে ঘুমাও, সব ঠিক হয়ে যাবে,' আমি বললাম।

'ওহ্, আমাদের পুরনো বাড়িতে আমার বিছানায় যদি শুতে পারতাম! ফার গাছের মাথায় বাতাসের শোঁ শোঁ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যেতাম। জানালাটা খুলে দাও না, নেলি,-একটু নিশ্বাস নেই।'

ওকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে জানালাটা খুললাম কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে লাগলো ঘরে। জানালাটা আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে ওর পাশে ফিরে এলাম আমি। শুয়ে আছে ও স্থির হয়ে। মুখ ভিজে গেছে চোখের পানিতে।

'কতক্ষণ আমি এঘরে বন্ধ হয়ে আছি?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথরিন।

'দরজায় খিল দিয়েছিলে সোমবার সন্ধ্যায়,' আমি বললাম, 'এখন বৃহস্পতিবার রাত বা বলতে পারো শুক্রবার সকাল।'

'একই সপ্তার?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'মাত্র এই ক'দিন!' বিড় বিড় করলো ও। 'আমার মনে হচ্ছিলো যেন কত দিন! কী ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে বলি তোমাকে, নেলি। মনে হচ্ছিলো বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে আছি আমি। আর কেমন যেন এক দুঃখে হৃদয়টা আমার ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিলো আমি আবার ছোট হয়ে গেছি, বাবাকে মাত্র কবর দেয়া হয়েছে, এবং হিণ্ডলে বলে দিয়েছে আমি আর হীথক্লিফের সাথে মিশতে পারবো না—

'ওহ্, জ্বলে যাচ্ছে আমার ভেতরটা! বাইরে যাবো আমি! আবার যদি আমি ছোট মেয়ে হয়ে যেতে পারতাম— ডানপিটে, উদ্দাম, উচ্ছল, মুক্ত, বাধা বন্ধনহীন—সব দুঃখকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতাম! কেন বদলে গেলাম এত? কেন একটু দুঃখেই বুক ভেঙে যেতে চায় আমার? উহ্, মাঠের ঠাণ্ডায় ঘুরতে পারলে একটু শান্তি পেতাম। জানালাটা খুলে দাও আবার, নেলি। পুরো খুলে দাও—জলদি! খুলে রাখো! কী হলো, নড়ছো না কেন?'

'তোমাকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে মরতে দেবো না আমি,' জবাব দিলাম।

'তার মানে বাঁচবার সুযোগটা তুমি আমাকে দেবে না! আমি নিজেই খুলবো। ভেবেছো আমি অসহায় হয়ে গেছি?'

আমি বাধা দেয়ার আগেই ও বিছানা থেকে নেমে এগোতে শুরু করলো টলমলে পায়ে। জানালাটা খুলে ঝুঁকে যতটা সম্ভব বের ক'রে দিলো শরীরের ঊর্ধ্বাংশ। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ছুরির ফলার মতো কেটে বেরিয়ে যেতে লাগলো ওর অনাবৃত কাঁধের ওপর দিয়ে। কিন্তু কোনো ভাবান্তর হলো না ওর। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম পাশে। সরে আসতে বললাম জানালা থেকে। কিন্তু আমার কথা আদৌ শুনতে পেয়েছে এমন কোনো লক্ষণ দেখলাম না ওর চেহারায়। ধরে টেনে নিয়ে আসতে চাইলাম। ও ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলো আমার হাত।

আকাশে চাঁদ নেই। বাইরে সব কিছু নিকষকালো আঁধারে ডুবে আছে। জানালা দিয়ে তাকালে যতদূর চোখ যায় কোথাও সামান্যতম আলোর চিহ্ন নেই। অথচ ও বলতে শুরু করলো:

'দেখ!' ফিসফিসে আন্তরিক ক্যাথরিনের কণ্ঠস্বর; 'দেখ! ওয়াদারিং হাইটসের আলো! দেখতে পাচ্ছ? ঐ যে আমার ঘরে মোম জ্বলছে, অন্য মোমটা জোসেফের ঘরে। রাত জেগে বসে আছে জোসেফ, আমি ফিরলে পরে গেট বন্ধ করবে। আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে ওকে। এমন বাজে পথ! তাছাড়া গিমারটনের গির্জা হয়ে যেতে হবে আমাদের। রাতে আমি আর হীথক্লিফ কত বার গেছি ওখানে ভূত দেখার জন্যে। হীথক্লিফ, আমি জানতে চাইছি, আসবে তুমি? যদি আসো তোমাকে রাখবো আমি। একা একা এখানে পড়ে থাকতে পারবো না। ওরা আমাকে বারোফুট নিচে কবর দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু আমি শান্ত হবো না! যতক্ষণ না তুমি আমি এক সাথে হচ্ছি, শান্ত হবো না আমি—না হবো না!'

দরজার হাতল ঘোরানোর শব্দ পেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ঘরে ঢুকেছে মিস্টার লিনটন। আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে বোধহয় উঠে এসেছে ব্যাপার কী দেখতে।

'ওহ্, স্যার!' আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম। 'মিসেস লিনটন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিছুতেই আমি ওঁকে বিছানায় রাখতে পারছি না।'

'ক্যাথরিন অসুস্থ?' উদ্বেগের সাথে বললো এডগার। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো আমাদের কাছে। 'জানালাটা বন্ধ ক'রে দাও, এলেন। ক্যাথরিন—'

স্বামীর গলা শুনে ঘুরে দাঁড়ালো ক্যাথরিন। সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল এডগারের। আতঙ্কিত চোখে তাকাতে লাগলো একবার স্ত্রীর মুখের দিকে একবার আমার দিকে।

কিছু একটা কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম আমি।

'এ—এখানেই ছিলেন উনি এ-ক'দিন। কিছু খাননি, কোনো কথা বলেননি। আজ রাতের আগে কাউকে ঢুকতেও দেননি ঘরে। আমরা কেউ বুঝতে পারিনি উনি অসুস্থ, তাই আপনাকে জানাতেও পারিনি। তবে, স্যার, মনে হচ্ছে তেমন কিছু না।'

নিজেই বুঝতে পারলাম কৈফিয়তটা তেমন ভালো হলো না। মনিব ভ্রুকুটি ক'রে তাকালো আমার দিকে।

'তেমন কিছু না! বেআক্কেল কোথাকার! আরো আগে কেন জানাওনি আমাকে?'

দু'হাতে তুলে নিলো সে স্ত্রীকে। ক্যাথরিন প্রথমে চিনতেই পারলো না তাকে। যখন পারলো তখনি চেঁচিয়ে উঠলো, 'আহ্ এডগার লিনটন! তাহলে এসেছো তুমি! তুমি সেই সব জিনিসের একটা যা যখন চাওয়া হয় না তখন পাওয়া যায় আর যখন চাওয়া হয় তখন কিছুতেই পাওয়া যায় না! নিশ্চয়ই এখন আবার প্রশ্নের জবাব চাইবে আমার কাছে, নয় তো বকবে? যা-ই করো আমাকে তুমি গোরস্থানের ঐ সরু ঘর থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না। বসন্ত শেষ হওয়ার আগেই ওখানে চলে যাবো আমি শেষ বিশ্রাম নেয়ার জন্যে! ভুলো না, লিনটনদের সাথে নয়, গির্জার ছাদের নিচে নয়, খোলা আকাশের নিচে আমার কবর হবে।'

'ক্যাথরিন, কী হয়েছে?' চিৎকার করলো এডগার। 'তোমার কাছে আমার কোনো মূল্যই কি আর নেই? তুমি ঐ লোকটাকে, ঐ হীথক্লিফকেই ভালোবাসো?'

'চুপ! চুপ করো এক্ষুণি! ও নাম যদি আর একবারও উচ্চারণ করো আমি এখনই সব চুকিয়ে দেবো জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। তোমাকে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই, এডগার, কোনো প্রয়োজন নেই। যাও, তোমার বইয়ের মাঝে ফিরে যাও।'

'মাথা ঠিক নেই ওর, স্যার,' আমি বললাম, 'আপনি আসার আগে থেকেই এমনি আবোল তাবোল বকছে; ডাক্তার এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এখন থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে, ওকে রাগানো চলবে না কিছুতেই।'

'তোমার পরামর্শের আর দরকার নেই,' জবাব দিলো মিস্টার লিনটন। 'তুমি জানতে ওকে রাগানো চলবে না তারপরেও আমাকে উস্কেছো যেন রাগাই। এই তিনটে দিন ও কী ভাবে থেকেছে, কী করেছে তা-ও জানাওনি। চরম বোকামি এবং গাফিলতির পরিচয় দিয়েছো তুমি।'

আমি তো তো ক'রে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলাম। আমাকে থামিয়ে দিলো এডগার। কিন্তু তার আগেই ক্যাথরিন বুঝে নিয়েছে তিন দিন আগে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি কী করেছিলাম।

'ও, নেলি, তাহলে তুমিই কথা লাগিয়েছিলে!' উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করলো সে। 'ছাড়ো আমাকে, আমার সাথে শত্রুতা করার ফল ওকে টের পাওয়াচ্ছি।'

মিস্টার লিনটনের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো ও। আমি আর ওখানে থাকা নিরাপদ মনে করলাম না। বেরিয়ে ছুটলাম ডাক্তার ডাকতে।

গ্রামে ডাক্তার কেনেথের বাসায় যখন পৌঁছুলাম তখন রাত দুটো বাজে। মাত্র কয়েক মিনিট হলো তিনি ফিরেছেন আরেক রোগী দেখে। তা সত্ত্বেও ক্যাথরিন লিনটন অসুস্থ শুনে তক্ষুণি রওনা হলেন আমার সাথে।

সরল, সোজা, স্পষ্টবাদী মানুষ ডাক্তার কেনেথ। যা মনে আসে কোনো রকম রাখ ঢাক না ক'রেই বলে ফেলেন। পথে আসতে আসতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাথরিনের কী হয়েছে। আমি বললাম। শুনে গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, এবারের আক্রমণটাও যদি আগের মতো হয়ে থাকে তাহলে তাঁর সন্দেহ আছে রোগীকে বাঁচানো যাবে কিনা। তারপর বেশ বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন:

'তোমাদের গ্র্যাঞ্জে আজকাল হচ্ছে কী, নেলি ডীন? গ্রামে আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা শুনছি। ক্যাথরিনের মতো শক্ত মেয়ের তো শুধু শুধু এ অসুখে পড়ার কথা নয়! কীভাবে হলো এ?'

'মনিবের কাছেই শুনবেন,' আমি জবাব দিলাম। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, একটা ঝগড়া থেকে এর সূচনা। ঝগড়ার পর—ঠিক ঠিক বললে মাঝখানেই ও ছুটে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো। তিন দিন সে দরজা খোলেনি, কিছু খায়ওনি। এখন তো মনে হচ্ছে স্বপ্নের ভেতর ডুবে আছে। আশপাশের সবাইকে চিনতে পারছে কিন্তু মনটা ওর পূর্ণ হয়ে আছে অদ্ভুত সব কাল্পনিক ব্যাপারে।'

'ইদানীং এডগার বেশ বন্ধুভাবে মিশছে হীথক্লিফের সাথে, তাই না?'

'উপায় কী না মিশে? ও প্রায়ই আসে গ্র্যাঞ্জে। আর ক্যাথরিন ছেলেবেলার বন্ধুত্বের কথা মনে ক'রে চায় স্বামীও ওকে বন্ধু ভাবুক, বন্ধুর মতো মিশুক ওর সাথে। তবে সেদিন, মানে যেদিন ঝগড়াটা হয় আমার মনিব ওকে কড়াকড়িভাবে বারণ ক'রে দিয়েছেন গ্র্যাঞ্জে আসতে।'

'মিস লিনটনের সাথে ওর সম্পর্কটা কী রকম?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

ঝট ক'রে আমি মুখ ফেরালাম তাঁর দিকে। 'মিস লিনটন কখনোই তাঁর পছন্দ অপছন্দের কথা বলেন না আমাকে।'

'একেবারে বোকা মেয়েটা,' হতাশভাবে মাথা নেড়ে মন্তব্য করলেন ডাক্তার। 'কাল বিকেলে শুনছিলাম, আগেরদিন রাতে অন্তত দু'ঘণ্টা ওকে হাঁটতে দেখা গেছে হীথক্লিফের সাথে তোমাদের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে। যে আমাকে খবরটা দিয়েছে, সে শুধু দেখেইনি, ওদের কথাবার্তাও শুনেছে। হীথক্লিফ ওকে ওর সাথে পালিয়ে যেতে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলো। আর মিস লিনটন বলছিলো, আজ নয়, পরের বার যখন ওদের দেখা হবে তখন সে পালাবে ওর সাথে। তুমি মিস্টার লিনটনকে বোলো, বোনের দিকে যেন একটু চোখ রাখে।'

এই খবর শুনে নতুন ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার মন। বাড়ি এসে ডাক্তারকে

মিসেস লিনটনের ঘরে পৌছে দিয়েই আমি ছুটে গেলাম ইসাবেলার ঘরে। ঘর খালি। বিছানা পরিপাটি ক'রে পাতা। মানে রাতে শোয়নি ইসাবেলা। বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না কোথায় গেছে ও, কার সাথে গেছে।

কিন্তু ও তো গেছে, এখন আমি কী করি? আমার পক্ষে ওদের পেছন পেছন ছোটা সম্ভব নয়। মনিবকে জানানোর কথাও ভাবতে পারছি না। এমনিতেই যথেষ্ট উৎকণ্ঠার ভেতর আছে সে, তার উদ্বেগ আরো বাড়াতে চাই না আমি। অবশেষে ঠিক করলাম মুখ বুজে থাকবো। ঘটনা তার নিজস্ব খাতে প্রবাহিত হোক।

ক্যাথরিনের ঘরে ফিরে এলাম। আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে ও বিছানায়। শেষ পর্যন্ত এডগার পেরেছে ওকে শান্ত করতে। ডাক্তার ইতিমধ্যে পরীক্ষা করেছেন ওকে। আমি ঢুকে শুনলাম এডগারকে উনি বলছেন: 'যতটা ভেবেছিলাম তত খারাপ নয় অবস্থা। আশা করছি ভাল হয়ে উঠবে। তবে হ্যাঁ, এখন থেকে কোনো অবস্থাতেই ওকে উত্তেজিত করা বা রাগানো চলবে না; খেয়াল রাখতে হবে সব সময় যেন শান্ত স্বাভাবিক থাকে।'

পরে আমাকে একা পেয়ে ডাক্তার বললেন:

'আসল ভয়টা মৃত্যুর নয়, ভয় হচ্ছে, এখন সামান্য উত্তেজিত করলে চিরতরে ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে যেতে পারে।'

বাকি রাতে আমি আর চোখ বন্ধ করতে পারলাম না, মিস্টার লিনটনও না। এমন কি শুতে পর্যন্ত পারলাম না। সকালে স্বাভাবিক সময়ের অনেক আগে চাকর বাকররা সবাই উঠে যার যার কাজে লেগে গেল। কিন্তু মিস ইসাবেলার দেখা নেই। শেষে ওরা বলাবলি করতে লাগলো, কেমন ঘুম ঘুমাচ্ছে মিস! এডগারও অবাক না হয়ে পারলো না। আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো ও উঠেছে কি না। এডগার বোধ হয় চাইছে তার অসুস্থ স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসুক তার বোন।

আমি কোনো মতে 'ঠিক বলতে পারছি না' ধরনের কিছু একটা জবাব দিয়ে সরে পড়তে চাইলাম তার সামনে থেকে, পাছে আমাকে পাঠায় ওকে ডাকতে। বাড়ির এক ঝি ভোরে উঠেই কী কাজে যেন গিমারটনে গিয়েছিলো। এই সময় ছুটতে ছুটতে এলো সে। ঘরে ঢুকেই চিৎকার ক'রে উঠলো, 'ওহ, স্যার! মিস চলে গেছে!'

'আস্তে!' ধমক লাগালাম আমি।

'আস্তে কথা বলো, মেরি,' বললো মিস্টার লিনটন। 'কী হয়েছে ইসাবেলার?'

'চলে গেছে, স্যার!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মেয়েটা। 'হীথক্লিফের সাথে পালিয়েছে।'

মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল এডগারের। 'কী যা তা বলছো? কে তোমার মাথায় ঢোকালো এই উদ্ভট কথা?'

'আমাদের দুধ দিয়ে যায় যে ছেলেটা,' বললো মেরি, 'গিমারটনে যাওয়ার পথে দেখা ওর সাথে। ও-ই বললো। কাল মাঝরাতের কিছুক্ষণ পরে গিমারটনের দু'মাইল ওপাশে এক ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোক নাকি এক কামারের দোকানের সামনে থেমে ঘোড়ার পায়ের নাল ঠিক করিয়ে নিয়েছে! কামারের মেয়ে ভদ্রলোককে দেখেই চিনেছে। হীথক্লিফ। ভদ্রমহিলার শরীর এবং মুখ আলখাল্লায় ঢাকা ছিলো বলে প্রথম তাকে চিনতে পারেনি মেয়েটা। কিন্তু নাল ঠিক হয়ে গেলে চলে যাওয়ার সময় উনি পানি খেতে চান। মেয়েটা পানি এনে দেয়। পানি খাওয়ার জন্যে মুখ থেকে আলখাল্লা সরান মহিলা। তখন ও চিনতে পারে মিস ইসাবেলাকে। লোকটা—মানে হীথক্লিফ পুরো একটা সভরেইন দিয়েছিলো কামারকে, তাই সে কাউকে কিছু বলেনি; কিন্তু তার মেয়ে সকালে উঠে সারা গিমারটনে বলে বেড়াচ্ছে কথাটা।'

'কিন্তু—কিন্তু এ সত্যি হতে পারে না!' বললো লিনটন। 'এলেন ডীন, দেখ তো ইসাবেলা ঘরে আছে কিনা!'

ছুটে গেলাম আমি ওপরে। কী দেখবো জানতাম, তবু ভেড়ানো দরজা ঠেলে উঁকি দিলাম ভেতরে। নিচে এসে বললাম, 'নেই, স্যার। মেরির কথা মনে হচ্ছে সত্যি।' একটা কথাও না বলে মুখ নিচু করলো লিনটন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'খুঁজতে হবে না ওঁকে, স্যার?—বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে হবে না?'

মাথা নাড়ালো এডগার। 'নিজের ইচ্ছায় গেছে ও। ওর কথা বলে আর বিরক্ত করবে না আমাকে। আমি ওকে ছাড়িনি, ও-ই আমাকে ছেড়ে গেছে। এখন থেকে ও নামেই শুধু আমার বোন।'

এর পর দীর্ঘদিন আর বোন সম্পর্কে কোনো কথা বলতে শুনিনি তাকে।

দশ

দু'মাস হয়ে গেল হীথক্লিফের সঙ্গে চলে গেছে ইসাবেলা। এই প্রায় পুরোটা সময় ক্যাথরিনের কাটলো অসুস্থতায়, আর এডগারের সেবা যত্নে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠার ভেতর দিয়ে। এডগার ওর এমন শুশ্রূষা করলো যা কোনো মা তার একমাত্র বাচ্চার জন্যেও করে না। দিন রাত সে স্ত্রীর দিকে নজর রাখলো, তার পাশে বসে রইলো, তার প্রয়োজন মেটালো। ডাক্তার যেদিন জানালেন বিপদ কেটে গেছে সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো সে।

অবশেষে মার্চের শুরুতে ঘর থেকে বেরোতে পারলো ক্যাথরিন। ১৭৮৪ সাল সেটা, আজ থেকে আঠারো বছর আগে। সেদিন ভোরে বাগান থেকে একগুচ্ছ ক্রোকাস ফুল এনে ওর বালিশের পাশে রেখেছে মিস্টার লিনটন। ঘুম ভেঙে উঠেই

ওগুলো দেখলো ক্যাথরিন। খুশি হয়ে ফুলগুলো তুলে নিলো দু'হাতে।

'আমাদের হাইটসে এ-ফুলই সবার আগে ফোটে,' বললো ও। 'এগুলো দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় মৃদু বাতাস, উষ্ণ সূর্য কিরণ আর প্রায় গলে যাওয়া তুষারের কথা। এডগার, দখিনা বাতাস নেই এখন?—তুষার গলে যায়নি?'

'একেবারে গলে গেছে, ডার্লিং,' জবাব দিলো ওর স্বামী। 'আকাশ এখন নীল, পাখিরা গাইছে, ঝরনাগুলো ভর্তি উঁচু পাহাড়ের গলে যাওয়া তুষারে। ক্যাথরিন, গত বসন্তে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম তোমাকে এই ছাদের নিচে নিয়ে আসার জন্যে। এখন আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে নিয়ে ঐ পাহাড়ে বেড়াতে যেতে। ওখানে বাতাস এত মিষ্টি! আমার মনে হয় ঐ বাতাসে তুমি সম্পূর্ণ সেরে উঠবে।'

'আর একবার মাত্র ওখানে যাবো আমি,' বললো ক্যাথরিন। 'সেটাই হবে আমার শেষ যাওয়া। আগামী বসন্তে আবার তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠবে আমাকে এই ছাদের নিচে আনার জন্যে আর পেছন ফিরে ভাববে, কী সুখী ছিলে আজ।'

এই ভয়ানক বিষণ্ন কথা শুনে লিনটন চেষ্টা করলো ওকে উৎফুল্ল ক'রে তোলার। কিন্তু কিছুতেই খুশি হলো না ক্যাথরিন, দু'গাল বেয়ে অশ্রু নামতে লাগলো ওর। মনিবের নির্দেশে আমি পার্লারে গিয়ে আগুন জ্বাললাম; জানালার কাছে রোদে পেতে দিলাম আরাম চেয়ার। এডগার নিয়ে এলো ওকে। বসিয়ে দিলো চেয়ারটায়। বাগানের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলো ক্যাথরিন।

দিন চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠছে ক্যাথরিন। আমি কায়মনে কামনা করছি, ও তাড়াতাড়ি শক্ত সমর্থ হয়ে উঠুক। কারণ ও সন্তানসম্ভবা। আমরা সবাই সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছি যেদিন ক্যাথরিন মিস্টার লিনটনকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দেবে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করবে অবাঞ্ছিত লোকদের হাতে চলে যাওয়া থেকে।

বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ছ'সপ্তাহ পর মিস ইসাবেলা তার ভাইয়ের কাছে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি পাঠালো হীথক্লিফের সাথে তার বিয়ের খবর দিয়ে। লিনটন জবাব দেয়নি চিঠিটার। এর পক্ষকাল পরে আরেকটা চিঠি পাঠালো ইসাবেলা। এবার আমার কাছে। দীর্ঘ চিঠি। অদ্ভুত। মাত্র মধুচন্দ্রিমা শেষ করেছে এমন মেয়ের কলম থেকে এমন চিঠি বেরোনো সত্যিই অদ্ভুত।

ইসাবেলা লিখেছে:

প্রিয় এলেন,

গত রাতে আমি ওয়াদারিং হাইটসে ফিরে এসেছি। এসে শুনলাম ক্যাথরিন অসুস্থ। এ অবস্থায় আমার মনে হয় ওর কাছে চিঠি লেখা উচিত নয়। আর আমার ভাইয়ের কাছেও লেখা উচিত নয়, কারণ আমার ওপর নিশ্চয়ই খুব রেগে আছে ও।

আগে একটা চিঠি লিখেছিলাম ওকে, কিন্তু জবাব পাইনি। তবু গ্র্যাঞ্জের কাউকে না কাউকে জানাতেই হবে আমার কথা, তাই তোমাকে বেছে নিয়েছি।

এডগারকে বোলো আমি ওকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। বোলো, বাড়ি ছেড়ে আসার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই আমার হৃদয় ফিরে গেছে ওখানে, এবং এখনও ওখানেই আছে। ক্যাথরিন এবং এডগারের জন্যে আমার ভালবাসা আরো বেড়েছে। চিঠির বাকি অংশ শুধু তোমার জন্যে।

দুটো প্রশ্ন করতে চাই তোমাকে, এলেন। প্রথম: তুমি যখন এখানে ছিলে কী ক'রে স্বাভাবিক মানুষ ছিলে? এখানে যারা থাকে তাদের মধ্যে এক জনকেও দেখলাম না যার একটু সুস্থ স্বাভাবিক মানবীয় আবেগ-অনুভূতি আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: হীথক্লিফ কি মানুষ? যদি হয় তাহলে কি ও পাগল? যদি না হয় তাহলে কি ও দানব? কেন এ প্রশ্ন আমি বলতে পারবো না, তবে যদি পারো দয়া ক'রে জানিও, কী বিয়ে করেছি আমি। লিখো না, নিজে এসো তুমি। তাড়াতাড়ি এসো। আমি তোমার আশায় থাকবো। আর আসার সময় এডগারের কাছ থেকে পারলে কিছু নিয়ে এসো।

এখন শোনো আমার নতুন বাড়িতে আমি কেমন অভ্যর্থনা পেয়েছি। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসার পর আমরা বাড়ির উঠানে পৌছাই। শব্দ পেয়ে তোমার পুরনো সাথী জোসেফ বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের বরণ ক'রে নিতে। সে বরণ করার ধরন কেমন তুমি আশাকরি আন্দাজ করতে পারছো। প্রথমেই সে টিমটিমে মোমবাতিটা উঁচু ক'রে নিয়ে এলো আমার মুখের কাছে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। একটা কথাও বললো না। তারপর আমাদের ঘোড়া দুটো নিয়ে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল আস্তাবলের দিকে। একটু পরে ফিরে এলো সে ফটক বন্ধ করার জন্যে। হীথক্লিফ বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলো ওর সাথে। আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম।

নোংরা, অগোছালো এক গর্ত মনে হলো আমার ঘরটাকে। আমার বিশ্বাস তুমি যখন ছিলে তখন ঘরটা এমন ছিলো না। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নোংরা একটা ছেলে। গাট্টাগোট্টা, সুন্দর দেখতে; তবে পরে আছে স্রেফ ন্যাকড়া। চেহারায়, চাউনিতে বেশ মিল ক্যাথরিনের সাথে। এগিয়ে গিয়ে ওর নোংরা একটা হাত তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছো, খোকা?'

ও ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কিছু একটা বললো চিৎকার ক'রে; কিন্তু কী আমি বুঝতে পারলাম না। আমি আবার প্রশ্ন করলাম: 'আমার বন্ধু হবে তুমি, হেয়ারটন?'

জবাবে ও তুড়ে গালাগাল দিতে লাগলো আমাকে। শেষে বললো, এক্ষুণি চলে না গেলে কুকুর লেলিয়ে দেবে আমার ওপর। ভালোভাবে প্রশ্ন করতে গিয়ে এমনি জবাব আমি পেয়েছি।

পরে হীথক্লিফের সঙ্গে আবার আসবো ভেবে বাইরে চলে গেলাম আমি। কিন্তু হীথক্লিফকে কোথাও দেখলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জোসেফকে দেখে বললাম আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে। ও এমন ভাব দেখালো যেন আমার কথা বুঝতেই পারেনি।

'বলছি আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো,' এবার রেগে বললাম আমি।

'পারবো না। আমার কাজ আছে,' সরাসরি জবাব দিলো ও। এবং আস্তাবলে ঢুকে নিজের কাজে লেগে গেল। কিছুক্ষণ একা একা উঠানে ঘুরলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। এবার অন্য একটা দরজার সামনে দাঁড়ালাম। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। টোকা দিলাম। দীর্ঘদেহী, রোগা এক লোক খুললো দরজা। নোংরা, অপরিপাটি পোশাক পরনে। লম্বা জটাপড়া চুলে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে তার মুখ, চোখ। এরও চোখ অনেকটা ক্যাথরিনের মতো, তবে ক্যাথরিনের সৌন্দর্য কিছুই নেই এর চেহারায়।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সে, 'কি চাও এখানে?'

'আমার নাম ইসাবেলা লিনটন,' আমি বললাম। 'আমাকে আগে দেখেছেন আপনি, স্যার। হীথক্লিফের সাথে বিয়ে হয়েছে আমার, ও-ই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'ফিরেছে তাহলে ও?' ক্ষুধার্ত নেকড়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো লোকটা।

'হ্যাঁ, একটু আগে এসেছি আমরা,' আমি বললাম। 'হীথক্লিফ আমাকে রান্নাঘরের দরজার কাছে রেখে কোথায় যেন গেছে। ভেতরে ঢুকেছিলাম আমি। কিন্তু আপনার ছেলে ভয় দেখিয়েছে আমার ওপর কুকুর লেলিয়ে দেবে বলে।'

আমার কথা শুনেছে এমন মনে হলো না লোকটার চেহারা দেখে। আপন মনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলো সে, 'ভালো কথা, হীথক্লিফ তাহলে তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে, ফিরে এসেছে!'

আমি তার কথার ধরনে ভয় পেয়ে গেলাম। চলে যাবো কিনা ভাবছি, এই সময় সে আমাকে ঢুকতে বললো ভেতরে। ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম আমি। সে দরজা বন্ধ ক'রে তালা লাগিয়ে দিলো। বিরাট ঘরটা। কিন্তু বাতি দেখলাম না কোনো। ফায়ার প্লেসের আগুনেই যা আলো হচ্ছে। কোনো কাজের মেয়েকে ডাকতে পারবো কিনা জিজ্ঞেস করলাম আমি। কিন্তু মিস্টার আর্নশ (ও যে মিস্টার আর্নশ তখন আর এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই আমার) কোনো জবাব না দিয়ে পায়চারি করতে লাগলো। আমি যে ঘরে আছি সেকথা যেন ভুলে গেছে। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করার সাহস হলো না আমার।

আমার যে তখন কেমন লাগছিলো, এলেন! ঘরে একা নই আমি, কিন্তু একা থাকলেও বোধ হয় এর চেয়ে ভালো হতো। আমার মনে হচ্ছিলো মাত্র চার মাইল

দূরে আমার সুখের বাড়ি। পৃথিবীর যে ক'টা মানুষকে আমি ভালোবাসি তারা আছে ও বাড়িতে, অথচ ওখানে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই। দু'বাড়ির মাঝে যেন মোটে চার মাইল নয়, আটলান্টিক সাগরের বিস্তৃতি।

নিজেকে আমি প্রশ্ন না ক'রে পারলাম না, সুখের আশায় এ আমি কী করেছি? এসব কথা এডগারকে বা ক্যাথরিনকে বোলো না, এলেন। শুধু তোমাকেই বলছি। আর সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিলাম, আমার এ মুহূর্তের সবচেয়ে বড় দুঃখ হলো, ওয়াদারিং হাইটসে একটা মানুষও পাবো না যে সে হীথক্লিফের বিপক্ষে গিয়ে আমার বন্ধু হতে পারে।

মিস্টার আর্নশ পায়চারি করছে তখনো। আমি দেখছি আর ভাবছি, যে দুঃখের শৃঙ্খলে জড়িয়েছি নিজেকে তা থেকে বোধহয় মৃত্যুর আগে মুক্তি পাবো না। ভাবতে ভাবতে কেঁদে ফেললাম আমি। হঠাৎ দেখি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হিণ্ডলে আর্নশ। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার কান্নাভেজা চোখের দিকে। ওর এই মনোযোগের সুযোগ নিয়ে আমি বললাম, 'আমি ক্লান্ত খুব, একটু ঘুমোতে চাই। কাজের মেয়েলোকটা কোথায় একটু বলবেন?'

'এ বাড়িতে কোনো কাজের মেয়ে নেই,' জবাব দিলো সে। 'নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে তোমাকে।'

'তাহলে বলুন আমি ঘুমাবো কোথায়?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম।

'জোসেফ তোমাকে দেখিয়ে দেবে হীথক্লিফের ঘর। ঐ দরজাটা খোলো। ওপাশের ঘরে আছে জোসেফ।'

আমি উঠে দরজাটার দিকে এগোচ্ছি, এই সময় হঠাৎ থামালো আমাকে হিণ্ডলে। অদ্ভুত এক গলায় বললো, হীথক্লিফের ঘরে যখন থাকবে, দরজা বন্ধ রাখবে সব সময়। ভুলো না যেন!'

'কেন, মিস্টার আর্নশ?' সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'দেখ!' জ্যাকেটের নিচ থেকে অদ্ভুত দর্শন এক পিস্তল বের করলো হিণ্ডলে, দু'ধার একটা ছোরা লাগানো ওটার নলের সাথে। ওপরের একটা বোতাম টিপলেই ছোরাটা লাফ দিয়ে ছুটে যায়। 'এটা দিয়ে একদিন ওকে খুন করবো আমি,' বললো সে। 'প্রত্যেক রাতেই আমি ওপরে ওর ঘরের সামনে দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করি। যেদিন খোলা পাবো সেদিন আর রেহাই নেই ওর!'

কৌতূহলের সঙ্গে অস্ত্রটার দিকে তাকালাম আমি। ভয়ঙ্কর এক চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়। অমন একটা অস্ত্র যদি পাই আমি কেমন ক্ষমতাবান হয়ে উঠবো! ওর হাত থেকে নিলাম অস্ত্রটা। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম ছুরিটার ফলা। বিস্মিত চোখে আমার আচরণ লক্ষ করলো হিণ্ডলে। তারপর পিস্তলটা নিয়ে আবার লুকিয়ে রাখলো জ্যাকেটের নিচে।

'হীথক্লিফকে বলবে এটার কথা?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'বলতে পারো, আমার কিছু এসে যায় না।'

'হীথক্লিফ কী করেছে আপনার?' আমি না জিজ্ঞেস ক'রে পারলাম না। 'আপনার কী ক্ষতি করেছে ও? ওকে এবাড়ি ছেড়ে যেতে বলাই আপনার জন্যে সহজ এবং বুদ্ধিমানের কাজ নয়?'

'না!' চেঁচালো আর্নশ। 'যে মুহূর্তে ও যেতে চাইবে সে-মুহূর্তে ও মরবে। তুমি যদি ওকে চলে যেতে প্ররোচিত করো ওর খুনের দায় চাপবে তোমার ঘাড়ে। আমি সব হারাবো?—ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করার সুযোগটাও পাবো না? হেয়ারটন ভিখিরি হয়ে যাবে? না, তা আমি হতে দেবো না। সব আমি ফিরে পাবো, ওর সব সোনাও আমি কব্জা করবো, তারপর রক্ত নেবো ওর। শয়তান চাইলে ওর আত্মাটা নিতে পারে!'

তোমার কাছে শুনেছি বটে, এলেন, তোমার সাবেক মনিব সম্পর্কে। কিন্তু এতটা যে দুরবস্থা তার ভাবিনি। আমার মনে হয় ও পাগল হয়ে যাচ্ছে, যদি এখনো না হয়ে গিয়ে থাকে। হিণ্ডলে আবার পায়চারি শুরু করতেই আমি ওর দেখানো সেই দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লাম পাশের ঘর—অর্থাৎ রান্নাঘরে। এবার আর হেয়ারটনকে দেখলাম না। জোসেফ চুল্লীর পাশে বসে পরিজ রান্না করছে। কাছে গিয়ে ঝুঁকে তাকালাম আমি। ওহ, সে পরিজের চেহারা দেখলে ভয় পেয়ে যেতে তুমি, এলেন।

'সরো, আমি রান্না করছি!' চিৎকার ক'রে আমি পাত্রটা তুলে নিয়ে জোসেফের নাগালের বাইরে চলে এলাম। তারপর কোট আর হ্যাট খুলে বললাম, 'মিস্টার আর্নশ বললেন নিজের কাজ আমার নিজেকেই করতে হবে। সুতরাং ভদ্রমহিলাদের মতো পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে থাকছি না আমি, থাকলে যে না খেয়ে মরতে হবে তা বুঝতে পারছি।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বিড় বিড় করতে লাগলো জোসেফ। আমি গ্রাহ্য না করে কাজে লেগে গেলাম। পরিজের বারোটা যা বাজার আগেই বেজে গিয়েছিলো। আমার হাতে রান্না হয়ে খুব একটা মান উন্নত হলো না তার। টেবিলে দিলাম ওটা। বিরাট এক পাত্র টাটকা দুধ এনে রাখলো জোসেফ। অমনি কোত্থেকে জানি না হেয়ারটন ছুটে এসে পাত্রটা তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো চুমুক দিয়ে। খাচ্ছে যতটা ফেলছে তার চেয়ে বেশি। আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে বললাম, ওভাবে দুধ খেতে হয় না। ওভাবে খাওয়ায় দুধটা এঁটো হয়ে যাচ্ছে। আর কেউ খেতে চাইবে না ও দুধ। আমার কথা কানেই তুললো না হেয়ারটন, খেয়ে চললো পাত্রে মুখ লাগিয়ে।

'অন্য ঘরে খাবো আমি,' রেগে গিয়ে আমি বললাম। 'তোমাদের পার্লারটা কই দেখিয়ে দাও।'

'পার্লার!' বিচ্ছিরি ভাবে হেসে বললো জোসেফ। 'পার্লার আসবে কোত্থেকে?

এটা আর সামনের ঘরটা ছাড়া বসার মতো আর কোনো ঘরই নেই আমাদের।'

খাওয়ার ইচ্ছা নষ্ট হয়ে গেল আমার। বললাম, 'তাহলে ওপরে যাবো আমি। আমার ঘর দেখিয়ে দাও।'

গজ গজ করতে করতে নিয়ে চললো আমাকে লোকটা। ওপরে উঠে একটা একটা ক'রে দরজা খুলে দেখাতে লাগলো আমার পছন্দ হয় কিনা। পছন্দ দূরে থাক একটা ঘরেও আমার ঢুকতে ইচ্ছে হলো না। দুর্গন্ধ সব ঘরে। এভাবে অনেকগুলো দরজা পার হওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হীথক্লিফের ঘর কোনটা?'

জোসেফ অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। 'হীথক্লিফের ঘরে থাকতে চান আপনি? কিন্তু ও ঘরের চাবি তো সবসময় হীথক্লিফের কাছেই থাকে।' আরেকটা ঘরের সামনে দাঁড়ালো জোসেফ। দরজা খুলে বললো, 'এটা মনিবের ঘর।'

'মনিবের ঘর না, আমার নিজের শোয়ার জন্যে একটা ঘর চাই,' বিরক্ত হয়ে আমি বললাম।

জোসেফ কোনো কথা না বলে নিচে চলে গেল, মোমবাতিটা নিয়ে গেল সঙ্গে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি একা। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলো সে ঘুমন্ত হেয়ারটনকে কোলে ক'রে। একটা ঘরে নিয়ে ওকে শুইয়ে দিলো বিছানায়।

'ইচ্ছে করলে আপনিও থাকতে পারেন এঘরে,' বললো জোসেফ।

আমি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলাম না। ছুটে গিয়ে বসলাম আগুনের সামনে একটা চেয়ারে। কাঁদতে লাগলাম নিঃশব্দে। কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টের পেলাম না।

হীথক্লিফ জাগালো আমাকে। মাত্র ফিরেছে সে। আমি তখনো বসে আছি কেন জানতে চাইলো। বললাম, আমাদের ঘরের চাবি ওর পকেটে বলে আমি ঢুকতে পারিনি সেঘরে। 'আমাদের' কথাটা শুনে ভীষণ রেগে গেল ও। কুৎসিত ভাষায় যা বললো তার মর্মার্থ, ও আমার নয়, কখনো হবেও না। যে ভাষা ও ব্যবহার করলো তা আমি লিখতে পারবো না এখানে। এলেন, কখনো কখনো আমার কৌতূহল বড় হয়ে ওঠে ভয়ের চেয়ে—ও হিংস্র বাঘ না বিষধর সাপ জানতে ইচ্ছে করে।

এর পর ক্যাথরিনের অসুস্থতার কথা বললো হীথক্লিফ, এবং সেজন্যে দায়ী করলো আমার ভাইকে। শপথ ক'রে বললো, যতদিন না ও এডগারকে হাতের মুঠোয় পাচ্ছে ততদিন আমাকে ভোগাবে। এই ক'দিনেই যে কষ্ট ও দিয়েছে সারাজীবনে এত কষ্ট আমি পাইনি, এলেন, আর কী কষ্ট ও দেবে আমাকে?

আমি ওকে ঘৃণা করি, এলেন। আমার দুরবস্থা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। উঁহু, কী বোকামিই না করেছি! এসব কথা গ্র্যাঞ্জের আর কারো কাছে বোলো না। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো প্রতিদিন। আমাকে নিরাশ কোরো না, এলেন।

ইসাবেলা।

চিঠি পড়া শেষ ক'রে ছুটে গেলাম আমি মনিবের কাছে। বললাম তার বোন এখন হাইটসে আছে, এবং আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, মিসেস লিনটনের অসুস্থতার খবর শুনে সে খুবই মর্মাহত। আরো বললাম:

'মিস খুবই আশা করছেন আপনি একবার দেখতে যাবেন তাঁকে; আর তাঁকে যে ক্ষমা করেছেন তার নিদর্শন স্বরূপ তুচ্ছ কোনো জিনিস হলেও পাঠাবেন।'

'ক্ষমা!' শীতল কণ্ঠে বললো লিনটন। 'আমি ওকে কী ক্ষমা করবো, এলেন? ও স্বেচ্ছায় নিজের পথ বেছে নিয়েছে। ইচ্ছে হলে তুমি বিকেলে যেতে পারো হাইটসে। যদি যাও বোলো, আমি রাগ করিনি ওর ওপর, ওকে হারিয়ে আমি দুঃখ পেয়েছি। কারণ, জানি হীথক্লিফের সঙ্গে ও সুখী হতে পারবে না। বোলো আমার পক্ষে ওকে দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়। ও যদি সত্যিই আমাকে খুশি করতে চায় তাহলে যেন এমন কিছু করে যাতে বদলোকটা এ এলাকা ছেড়ে যায়।'

'ছোট্ট একটা চিঠিও দেবেন না, স্যার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। হীথক্লিফ বা তার পরিবারের কারো সাথে আমি কোনোরকম সম্পর্ক রাখবো না।'

মিস্টার এডগারের শীতলতা আমাকে হতাশ করলো। তবু বিকেলে রওনা হলাম হাইটসের পথে। ভাবতে ভাবতে চললাম মেয়েটাকে কী ভাবে জানাবো তার ভাই দু'কথা লেখা একটা চিঠিও দেয়নি।

ভেতরের ফটক পেরিয়ে বাগানের পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ইসাবেলা। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নাড়লাম ওর উদ্দেশ্যে। কিন্তু ও সরে গেল চকিতে, যেন ভয় পেয়েছে।

দরজায় টোকা না দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলাম আমি। ঢুকেই কান্না পেয়ে যাওয়ার অবস্থা। ইস! কী বাড়িটার কী দশা হয়েছে! যেদিকে তাকাই আবর্জনার স্তূপ, নোংরা, ধুলোবালি। হিণ্ডলে নেই ঘরে। হীথক্লিফকে দেখলাম টেবিলে বসে কী সব কাগজপত্র দেখছে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো সে। কেমন আছি জিজ্ঞেস করলো। বসতে বললো একটা চেয়ার দেখিয়ে।

হীথক্লিফকে যা দেখাচ্ছে! এত ভালো ওকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়লো না আমার। অপরিচিত কেউ দেখলে নিশ্চই ভাববে ও জন্ম ভদ্রলোক—আর নোংরা অপরিপাটি কাপড় পরা মেয়েটা চাকরানী, ওর স্ত্রী নয়। বাড়িটার মতোই দশা ইসাবেলার। ভীষণ অবহেলিত। ওর সুন্দর মুখটা বিষণ্ণ, মলিন। চুল আঁচড়ানো হয়নি কতদিন কে জানে?

আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে ছুটে এলো ইসাবেলা, সম্ভবত বহু আকাঙ্ক্ষিত ভাইয়ের চিঠি নেয়ার জন্যে।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লাম আমি।

'আমার স্ত্রীর জন্যে কিছু যদি এনে থাকো দিতে পারো,' বললো হীথক্লিফ। 'আমাদের মাঝে কোনো লুকোচুরি নেই।'

'কিছুই আনিনি,' বললাম আমি। 'আমার মনিব শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন আপনার জন্যে, ম্যা'ম,—তবে চিঠি বা অন্য কিছু আশা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আসবেন এটাও আশা না করাই ভালো।'

ইসাবেলার ঠোঁটদুটো কাঁপলো একটু। কী পরিশ্রম করতে হলো ওকে কান্না সামলানোর জন্যে বুঝতে পারলাম। আস্তে আস্তে ফিরে গেল ও আবার জানালার কাছে। হীথক্লিফ প্রশ্ন করতে লাগলো আমাকে ক্যাথি সম্পর্কে। ওর অসুস্থতা সম্পর্কে যতটুকু জানানো যায় বলে মনে হলো বললাম তাকে। শেষ করলাম এই বলে, 'আশা করি তুমি দেখা করার চেষ্টা করবে না ওর সাথে।'

'এখান থেকে যাওয়ার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে, এলেন,' জবাব দিলো সে, 'তুমি ওর সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করবে। যে ভাবেই হোক করবে।'

'না, মিস্টার হীথক্লিফ, তুমি দেখা করবে না ওর সাথে,' বললাম আমি। 'আমার মাধ্যমে তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার মনিবের সাথে তোমার আরেকবার মুখোমুখি হওয়ার অর্থ ওর অবধারিত মৃত্যু।'

'তোমার সাহায্য পেলে ওর মুখোমুখি হতে হবে না আমাকে। তুমি ভালো করেই জানো লিন্টনকে নিয়ে ও একবার ভাবলে আমাকে নিয়ে ভাবে হাজার বার! আমি ওকে এক দিনে যতটুকু ভালোবাসবো লিন্টন আশি বছরেও অতটা পারবে না।'

'যে কোনো স্বামী-স্ত্রীর মতোই একে অপরকে ভালোবাসে ক্যাথরিন আর এডগার,' চিৎকার করলো ইসাবেলা। 'আমার ভাইয়ের নামে যা-তা বলবে আর আমি চুপচাপ বসে শুনবো ভেবো না!'

'ভাইয়ের জন্যে খুব দরদ দেখছি!' বিদ্রূপ করলো হীথক্লিফ। 'তোমার জন্যে ভাইয়ের দরদ কতটুকু টের পাওনি এখনো? যে আপদ বিদায় হয়েছে তাকে আবার ঘরে নেয়ার ইচ্ছে ওর নেই বুঝতে পারোনি?'

'আমি কী কষ্ট ভোগ করছি তা জানে না ও,' জবাব দিলো ইসাবেলা। 'জানলে নিশ্চয়ই অন্যরকম করতো। জানাইনি আমি ওকে।'

'কিছু তাহলে জানিয়েছো? চিঠি লিখেছো?'

'হ্যাঁ, শুধু বিয়ের খবর দিয়েছি। চিঠিটা তুমি দেখেছো।'

'তারপরে আর কিছু লেখোনি?'

'না।'

'ম্যা'মকে খুবই মনমরা দেখাচ্ছে,' প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে আমি বললাম। 'তুমি আর বোধহয় ওঁকে তেমন ভালোবাসো না।'

'সেটা ওরই দোষ,' বললো হীথক্লিফ। 'নিজেই নিজের চেহারা চাকরানীর

মতো করেছে! আজকাল আর আমাকে খুশি করার চেষ্টাও করে না। কেন যে আছে আমার সাথে! তবে যা-ই হোক এ বাড়িতে ওকে মানিয়ে যায়। আমাকে শুধু খেয়াল রাখতে হবে বাইরে ঐ কালিমুখ দেখিয়ে আমার মানসম্মান যেন না ডোবায়।'

স্ত্রী সম্পর্কে এমনি ধারা অপমানকর কথা একের পর এক বলে চললো হীথক্লিফ। শেষে আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, 'মিস্টার হীথক্লিফ! পাগলের মতো কথা বলছো তো তুমি! নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রী পাগল ধরে নিয়েছে তোমাকে। এবং সেজন্যেই এখনো আছে তোমার সাথে। তা যখন বলছো তোমার সাথে না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই তখন আমার মনে হয় না উনি আর থাকতে চাইবেন এখানে।'

'ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না, এলেন,' সক্রোধে চিৎকার ক'রে উঠলো ইসাবেলা। 'মানুষ নয় ও, মিথ্যেবাদী শয়তান! আমাকেও বলেছিলো ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারি। কিন্তু সে চেষ্টা করতে গিয়ে কী দশা আমার হয়েছিলো তা আর বলতে চাই না তোমাকে! কিন্তু এলেন, এসব কথা আমার ভাইকে বা ক্যাথরিনকে বলবে না তুমি। ও যা-ই করুক বা বলুক না কেন ওর একমাত্র উদ্দেশ্য এডগারকে মরিয়া ক'রে তোলা। ও নিজেই বলেছে, আমাকে বিয়ে করেছে এডগারের ওপর খানিকটা ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে। কিন্তু ও তা পারবে না। তার আগেই আমি মরবো। এখন একটাই কামনা আমার—মৃত্যু—আমার অথবা ওর!'

'ওপরে যাও!' গর্জে উঠলো হীথক্লিফ। 'যাও এক্ষুণি! এলেন ডীনের সাথে একা কথা বলবো আমি।'

উঠে হাত ধরে ওকে ঘর থেকে বের ক'রে দিলো সে। এক দিনে যথেষ্ট দেখা হয়েছে ভেবে আমি আমার হ্যাট তুলে নিলাম।

'রাখো ওটা, এলেন!' আদেশ করলো হীথক্লিফ। 'এখনই যাচ্ছো না তুমি। বোসো। বলো ক্যাথরিনের সাথে আমার দেখা করিয়ে দেবে কিনা। কোনো রকম ঝামেলা চাই না আমি। শুধু দেখা করতে চাই ক্যাথরিনের সাথে। কাল রাতে আমি ছ'ঘণ্টা পায়চারি ক'রে কাটিয়েছি গ্র্যাঞ্জের বাগানে—আজ রাতেও যাবো। যত দিন না ওর সাথে দেখা হবে আমি যেতে থাকবো। এডগার লিনটন আমার সামনে পড়লে ওকে শুইয়ে ফেলবো পিটিয়ে, ওর চাকররা এলে সব ক'টাকে খুন করবো এই পিস্তল দিয়ে। কিন্তু তুমি যদি সাহায্য করো এসব কিছুই ঘটবে না। তুমি গোপনে ওকে নিয়ে এসে দেখা করিয়ে দেবে আমার সাথে। কারো কোনো ক্ষতি হবে না।'

আমি সরাসরি অস্বীকার করলাম মনিবের সঙ্গে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করতে। উপরন্তু ভয় দেখালাম বাড়ি গিয়েই এডগারকে বলে দেবো এসব কথা।

'তাহলে কাল সন্ধ্যার আগে আর এ বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারছো না তুমি,'

ঘোষণা করলো হীথক্লিফ। 'আমি এক্ষুণি গিয়ে বোঝাপড়া করবো এডগারের সাথে। ভেবে দেখ কোনটা করবে তুমি—আমাকে সাহায্য না মনিবের সর্বনাশ!'

আমি পঞ্চাশ রকম ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলাম ওকে, অনুনয় করলাম, মিনতি করলাম। কিন্তু লাভ হলো না। শেষ পর্যন্ত ওর প্রস্তাবে রাজি হতেই হলো আমাকে। ঠিক হলো আজই ওর একটা চিঠি নিয়ে যাবো। সময় সুযোগ মতো ওটা দেবো ক্যাথরিনকে। ক্যাথরিন যদি ওর সাথে দেখা করতে রাজি থাকে তাহলে আমি জানাবো ওকে পরের কোন দিন মিস্টার লিনটন বাড়িতে থাকবে না। চাকর বাকররা যেন কিছু টের না পায় সেটাও দেখতে হবে আমাকে।

বিষণ্ণ মনে রওনা হয়েছিলাম আমি বাড়ি থেকে, ফিরলাম আরো বিষণ্ণ হয়ে।

এগারো

তিন দিনের ভেতর চিঠিটা দিতে পারলাম না ক্যাথরিনকে। কারণ এই তিন দিনে একবারও বাড়ি থেকে বেরোলো না এডগার। চতুর্থ দিন রবিবার। বিকেলে এডগার এবং চাকর বাকররা প্রায় সবাই চলে গেল গির্জায়। আস্তে আস্তে আমি ঢুকলাম ক্যাথরিনের ঘরে।

খোলা জানালার সামনে বসে আছে ও। ক'দিনেই অনেক বদলে গেছে চেহারা। দৃষ্টিতে আগের সেই চঞ্চলতা নেই; তার জায়গা নিয়েছে বিষণ্ণ এক স্বপ্নালু কোমলতা। সব সময় ও তাকিয়ে থাকে যেন অনেক অনেক দূরের কোনো জিনিসের দিকে—এমন জিনিস যা এ পৃথিবীর নয়।

গিমারটন-চ্যাপেলের ঘন্টাগুলো বাজছে। উপত্যকা পেরিয়ে তার ধ্বনি কোমল হয়ে এসে পৌঁছুচ্ছে কানে। পকেট থেকে চিঠিটা বের ক'রে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম ওর পাশে।

'তোমার জন্যে একটা চিঠি আছে, মিসেস লিনটন,' বলে চিঠিটা দিলাম ওর হাতে। 'এক্ষুণি পড়তে হবে, কারণ জবাব দিতে হবে এটার। খুলে দেবো আমি?'

চিঠিটার দিকে তাকালোও না ক্যাথরিন। উদাস কণ্ঠে বললো:

'দাও।'

খুললাম আমি খামের মুখ। ভাঁজ করা কাগজটা বের ক'রে দেখলাম, খুবই ছোট চিঠি। বললাম:

'পড়ো। হীথক্লিফ পাঠিয়েছে।'

চমকে মুখ তুললো ক্যাথরিন। এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে। পড়া শেষ ক'রে গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'তোমার সাথে দেখা করতে চায়,' বললাম আমি। 'এতক্ষণে বোধ হয় বাগানে এসে গেছে এবং অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছে জবাবের জন্যে।

কথাটা আমি শেষও করতে পারিনি, নিচের হলে শুনতে পেলাম পায়ের শব্দ। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই ঘরে ঢুকলো হীথক্লিফ। বাড়ি ফাঁকা টের পেয়ে জবাবের জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্যটুকুও ও ধরতে পারেনি।

ব্যাকুল চোখে তাকালো ওর দিকে ক্যাথরিন। দু'তিনটে পদক্ষেপ মাত্র। পৌঁছে গেল হীথক্লিফ ওর পাশে। বাহুর বাঁধনে বেঁধে ফেললো ওকে।

অন্তত পাঁচ মিনিট ক্যাথরিনকে বুকের সাথে চেপে ধরে রইলো হীথক্লিফ। কোনো কথা বললো না। ওর মুখ দেখে মনে হলো ক্যাথরিনের রোগা পাণ্ডুর মুখটা ওর হৃদয় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

'ও ক্যাথি! আমার প্রাণ, আমার জীবন!' অবশেষে বলতে পারলো সে, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার! তোমার এদশা আমি সইবো কী ক'রে?' বুকের একেবারে গভীর থেকে যেন উঠে এলো কথাগুলো।

হীথক্লিফ একটু হাত ঢিল দিতেই ঝাঁ ক'রে পেছনে হেলে পড়লো ক্যাথরিন। ভ্রূকুটি ক'রে বললো:

'তুমি আর এডগার আমার মনটাকে ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে শেষ ক'রে দিয়েছো, হীথক্লিফ। তারপর এখন এসেছো এসব শোনাতে, যেন করুণা আমার নয় তোমাদের পাওনা! না, আমি কোনো করুণাই দেখাবো না কাউকে! তোমরা আমাকে খুন করেছো! কত শক্ত মনে করো তুমি নিজেকে? আমি মরার পর ক'বছর বাঁচবে বলে ভাবো তুমি?'

হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়লো হীথক্লিফ। একটু পরেই আবার ওঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু ক্যাথরিন মাথা চেপে ধরে বসিয়েই রাখলো ওকে।

'আমার ইচ্ছা হয়,' বলে চললো ক্যাথরিন, 'তোমাকে আঁকড়ে ধরে থাকি যতদিন না দু'জনের এক সাথে মরণ হয়! তুমি কী দুঃখ পেয়েছো না পেয়েছো তাতে কিছু এসে যায় না আমার। দুঃখ তুমি পেয়েছো আদৌ? আমি পেয়েছি! আমাকে ভুলে যাবে তুমি? আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি তুমি শান্তি পাবে? আজ থেকে বিশ বছর পরে কী বলবে?—বলবে "ঐ যে ক্যাথরিন আর্নশর কবর। এক সময় ওকে আমি ভালোবাসতাম, অবশ্য সে অনেক আগের কথা।" একথাই তো বলবে, বলবে না, হীথক্লিফ?'

'এভাবে কথা বোলো না আমার সাথে, ক্যাথি,' মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো হীথক্লিফ। 'তুমি কি চাও আমিও পাগল হয়ে যাই তোমার মতো?'

অপরিচিত কেউ এ দৃশ্য দেখলে নিঃসন্দেহে আতঙ্কিত হয়ে উঠতো। ক্যাথরিনের মুখ বিবর্ণ, রক্তশূন্য। চোখগুলো উন্মাদের মতো বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। মুখে লেগে আছে নিষ্ঠুর এক ভঙ্গি। আর হীথক্লিফ ধরে আছে

ওর হাত। হাতটা যখন সে ছেড়ে দিলো, দেখলাম, নীল দাগ ফুটে উঠেছে ক্যাথরিনের রক্তহীন ত্বকে।

'তোমার ওপর কি শয়তান ভর করেছে?' বলে চললো হীথক্লিফ, 'নইলে এমন কথা বলছো কী ক'রে তুমি? জানো তুমি চলে যাওয়ার দীর্ঘদিন পরেও এসব কথা মনে থাকবে আমার? তখন তুমি শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকবে আর আমি জ্বলবো নরক-আগুনে!'

'শান্তিতে থাকবো না আমি,' বদলে গেছে ক্যাথরিনের কণ্ঠস্বর। ক্রোধের জায়গা নিয়েছে আবেগ। 'আমার মনে যে জ্বালা তার চেয়ে বেশি তুমি জ্বলো তা আমি চাই না—চাই না হীথক্লিফ। আমি শুধু চাই, আমরা যেন কখনোই আলাদা না হই। আমার কোনো কথা যদি পরে তোমাকে যন্ত্রণা দেয়, জেনো একই যন্ত্রণা আমি ভোগ করবো কবরে শুয়ে। আমাকে ক্ষমা করো, হীথক্লিফ।'

উঠে আবার ওকে জড়িয়ে ধরলো হীথক্লিফ।

'দেহের খাঁচায় বন্দী থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,' বলে চললো ক্যাথরিন। 'ভীষণ ক্লান্ত! মনে হয়—মনে হয় কবরের ওপাশের ঐ রাজ্যে যদি পালাতে পারতাম!'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব দু'জন। হীথক্লিফের চোখে টল টল করছে পানি। শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরে আছে ও ক্যাথরিনকে, যেন প্রাণ থাকতে ওকে ও কোথাও যেতে দেবে না।

'ওহ্, ক্যাথি!' অবশেষে আবার চিৎকার করলো হীথক্লিফ। 'আমার ক্যাথি! লিনটনকে কেন বিয়ে করলে তুমি?'

'সেটা যদি ভুল হয়ে থাকে তো তার শাস্তি পাচ্ছি এখন,' বললো ক্যাথরিন। 'তুমিও তো আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে। সেজন্যে এখন তোমাকে দোষারোপ করবো না। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। তুমিও করো আমাকে।'

'কঠিন, খুবই কঠিন! তোমার এই চোখ, এই শীর্ণ হাতের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা করা খুবই কঠিন। এ চোখ আর দেখিও না আমাকে। তুমি আমাকে যা করেছো তার ক্ষমা আমি করেছি। আমি আমার হত্যাকারীকে ভালোবাসতে পারি, কিন্তু তোমার হত্যাকারীকে কী ক'রে ভালোবাসবো?'

আবার চুপ ওরা। একজন আরেকজনের কাঁধে মুখ লুকিয়ে আছে। আর আমি অস্বস্তিতে ভুগছি। দ্রুত বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি গিমারটনের গির্জা থেকে লোকজন বেরোতে শুরু করেছে।

'প্রার্থনা শেষ,' আমি বললাম। 'মিস্টার লিনটন এসে পড়বেন এক্ষুণি।'

বিড় বিড় ক'রে একটা অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করলো হীথক্লিফ। এবং আরো শক্ত ক'রে কাছে টানলো ক্যাথরিনকে। ক্যাথরিন নড়লো না একটুও। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফটকে শব্দ পেয়ে আমি উঁকি দিলাম নিচে। মিস্টার লিনটন ঢুকছে প্রাঙ্গণে।

'এসে গেছেন!' ভয়ার্তস্বরে বলে উঠলাম আমি। 'ঈশ্বরের দোহাই, চলে যাও, হীথক্লিফ। সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামলে তোমার সাথে দেখা হবে না মনিবের!'

ক্যাথরিনকে ছেড়ে দিলো হীথক্লিফ। 'এবার যেতে হবে আমাকে, ক্যাথি!'

'না!' ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে এলো ক্যাথরিন। 'না, তুমি যাবে না।'

'যেতেই হবে, ক্যাথি! এডগার এসে পড়েছে!'

'না! না!' পাগলের মতো চিৎকার ক'রে হীথক্লিফকে আঁকড়ে ধরলো ক্যাথরিন। 'যেও না! এ-ই আমাদের শেষ দেখা! হীথক্লিফ, মরে যাবো আমি! মরে যাবো!'

'ঠিক আছে যাবো না আমি।' ক্যাথরিনকে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো হীথক্লিফ। 'এ জন্যে যদি ও আমাকে খুন করে তবু যাবো না।'

সিঁড়িতে মনিবের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। আমার বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা।

'ওর কথা শুনছো তুমি?' ভীষণ উৎকণ্ঠায় ফিসফিস করলাম। 'ও নিজেই জানে না কী বলছে! সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার আগে পালাও, হীথক্লিফ। ওঠো! আমরা সবাই বিপদে পড়ে যাবো—'

এই সময় হঠাৎ শিথিল হয়ে এলো ক্যাথরিনের শরীর। উদ্বেগের সঙ্গে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লো হীথক্লিফ। পরমুহূর্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো এডগার।

ক্যাথরিনের শিথিল, অচেতন দেহটা দু'হাতে ধরে উঠে দাঁড়ালো হীথক্লিফ।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো এডগার। মুখটা প্রথমে ফ্যাকাসে, তারপর টকটকে লাল হয়ে উঠলো। লাফ দিয়ে এগোলো ও হীথক্লিফের দিকে।

হীথক্লিফ ক্যাথরিনের অচেতন দেহটা দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এডগার এগোতেই চিৎকার করলো: 'ক্যাথির কথা ভাবো আগে! শয়তান না হও তো ওকে ধরো, তারপর যা বলবার বোলো আমাকে?'

ক্যাথরিনকে বিছানায় নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ও। স্ত্রীর পাশে বসে ব্যস্তভাবে আমাকে ডাকলো এডগার। আমরা দু'জনে কিছুক্ষণের চেষ্টায় জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলাম ক্যাথরিনের। কিন্তু ও কাউকে চিনতে পারলো না। নিজের মনে বিড় বিড় ক'রে চললো। ভয়ে উৎকণ্ঠায় হীথক্লিফের কথা ভুলে গেছে এডগার। কিন্তু আমি ভুলিনি। প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এলাম ওঘর থেকে। পার্লারে গিয়ে পেলাম হীথক্লিফকে।

'অনেকটা ভালো এখন ক্যাথরিন,' বললাম আমি ওকে। 'তুমি চলে যেতে পারো। কাল সকালে তোমাকে জানাবো ও কেমন থাকে।'

'বাগানে অপেক্ষা করবো আমি,' জবাব দিলো ও। 'তুমি যেন ভুলে যেও না খবর দিতে। ঐ লার্চ গাছগুলোর নিচে থাকবো আমি।'

সেদিনই রাত বারোটার সময় জন্ম নিলো ছোট্ট ক্যাথরিন—এই ক্যাথরিনকেই

আপনি ওয়াদারিং হাইটসে দেখেছেন, মিস্টার লকউড। দু'ঘন্টা পর মারা গেল ওর মা। আঠারো বছর আগের কথা, কিন্তু আমার মনে হয় মাত্র সেদিন। সময় হওয়ার তিন মাস আগেই জন্মেছিলো বাচ্চাটা। জন্মের পরপরই মরে যেতে পারতো, কিন্তু মরেনি বেচারি! কী ক'রে যে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি ভেবে এখনো আমার অবাক লাগে।

পরদিন সকালে বাড়ির বাইরেটা ঝলমলে উজ্জ্বল উৎফুল্ল; কিন্তু ভেতরটা বিষণ্ণ, নিরানন্দ, নিথর। ক্যাথরিনকে শুইয়ে রাখা হয়েছে তার বিছানায়। চোখ বন্ধ, যেন ঘুমিয়ে আছে। অদ্ভুত সুন্দর, শান্ত দেখাচ্ছে ক্যাথরিনের মুখটা, স্বর্গের অপ্সরীর মতো। ওর অত শান্ত চেহারা কোনোদিন আমি দেখিনি।

সূর্যোদয়ের সামান্য পরে আমি বেরিয়ে এলাম বাইরে। হীথক্লিফের কথা ভুলিনি। বাগানে ওর অপেক্ষা করার কথা। ওর মুখোমুখি হতে আমার ভয় করছে। তবু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম ওর দেখানো লার্চ গাছগুলোর দিকে। কী ক'রে খবরটা দেবো দুশ্চিন্তা হচ্ছে সে নিয়ে। কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছে ও বুড়ো এক গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। মাথায় হ্যাট নেই। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাতে ভিজে আছে চুল। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ও; কারণ, দেখলাম, এক জোড়া পাখি ওর মাত্র দু'তিন ফুট দূর দিয়ে উড়ে গেল নির্ভয়ে। আমার শব্দ পেয়ে মুখ তুললো হীথক্লিফ।

'মারা গেছে!' আমি কিছু বলার আগেই বলে উঠলো ও। 'আমি জানি। তুমি কখন এসে জানাবে সে আশায় বসে নেই আমি।'

কী ক'রে জানলো ও? নিশ্চয়ই সারারাত দাঁড়িয়ে থেকেছে এখানে। রাতে ডাক্তার ডাকতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে বাতি হাতে চাকর বাকরদের ছুটোছুটি দেখেছে এবং ভেতরে ব্যাপার স্যাপার স্বাভাবিক নয় আন্দাজ ক'রে এগিয়ে গিয়ে বাড়ির কাছে কোথাও ঘাপটি মেরে শুনেছে আমাদের কথাবার্তা।

'রুমাল সরাও,' আবার বললো হীথক্লিফ। 'তোমার ঐ চোখের পানির কোনো প্রয়োজন হবে না ওর!'

আমি কাঁদছি যতটা না ক্যাথির জন্যে তার চেয়ে বেশি ওর জন্যে। কান্না থামিয়ে বললাম, 'আশা করি স্বর্গে গেছে ও। এখন থেকে সতর্ক হলে, পাপ পথ ত্যাগ করলে আমরাও একদিন হয়তো গিয়ে মিলিত হতে পারবো ওর সাথে!'

'ও তাহলে সতর্ক হয়েছিলো?' রুক্ষ বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করলো হীথক্লিফ। 'তাপসীর মতো মরেছে তাই না?'

কয়েক মুহূর্ত আগুনঝরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো ও। তারপর জিজ্ঞেস করলো:

'ঠিক কীভাবে মরলো বলো।'

আগের মতোই রুক্ষ ওর গলা। কিন্তু আমি টের পাচ্ছি, কান্না লুকানোর চেষ্টায় থর থর ক'রে কাঁপছে ও।

'একেবারে নিঃশব্দে,' আমি বললাম। 'লম্বা ক'রে একবার শ্বাস টানলো, বাচ্চাদের মতো ক'রে একবার আড়মোড়া ভেঙে টানটান করলো শরীর, তারপর মনে হলো ঘুমিয়ে গেল আবার। পাঁচ মিনিট পর আমি কাছে গিয়ে খেয়াল করলাম হৃদস্পন্দন থেমে গেছে।'

'আমার কথা বলেনি একবারও?' একটু ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞেস করলো হীথক্লিফ।

'তুমি চলে আসার পর একবারের জন্যেও পুরোপুরি সজ্ঞান হয়নি। কাউকে চিনতে পারছিলো না। সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেমন হাসি ফুটে ওঠে তেমনি হাসি মুখে নিয়ে মারা গেছে ও। আশাকরি পরপারেও অমনি সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে জাগবে।'

'আমি আশা করি না!' ভয়ঙ্কর ক্রোধে চিৎকার করলো হীথক্লিফ। 'কেন করবো? ও মিথ্যেবাদী! শেষ পর্যন্ত মিথ্যেবাদী! কোথায় এখন ও? আর যেখানেই হোক স্বর্গে নয়! আমি যতদিন বেঁচে আছি ও-শান্তি পাবে না।...তুমি বলছিলে আমি তোমাকে খুন করেছি—বেশ তাহলে এসে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াও আমাকে! সারাক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াও! পাগল ক'রে দাও আমাকে! শুধু—শুধু একা ফেলে রেখো না! ও, ঈশ্বর! এ যে ভয়ানক! আমার আত্মা ছাড়া আমি বাঁচবো কী ক'রে?'

হঠাৎ ক'রেই হীথক্লিফের খেয়াল হলো আমি তাকিয়ে আছি ওর দিকে। অমনি চিৎকার ক'রে উঠলো, 'কী দেখছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? যাও! ভাগো এখান থেকে!'

সঙ্গে সঙ্গে আমি পালন করলাম সে আদেশ। কারণ জানি, ওকে শান্ত করা বা সান্ত্বনা দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে।

পরের শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো মিসেস লিনটনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। মাঝের দিন এবং রাতগুলো একটানা খোলা কফিনের পাশে কাটালো লিনটন। হীথক্লিফ দিনে ওয়াদারিং হাইটসে ফিরে গেলেও রাতগুলো কাটাতে লাগলো বাইরে, থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জের বাগানে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমার মনিব অবসন্নতার চরমে পৌঁছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘুমাতে বাধ্য হলো। এই সুযোগে আমি বাইরে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলাম হীথক্লিফকে। মৃত ক্যাথরিনকে শেষ একবার দেখতে পাবে না ও এটা আমি ভাবতে পারছিলাম না।

মিস্টার আর্নশকে বোনের শেষকৃত্যে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হলো কিন্তু সে এলো না, কোনো কারণও জানালো না না আসার। ইসাবেলাকে বলা হয়নি আসতে।

শবযাত্রা শেষে বিস্মিত গ্রামবাসীরা দেখলো, ক্যাথরিনের কবরের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে গির্জার ছাউনির নিচে লিনটনদের জন্যে নির্ধারিত জায়গায় নয়, ওর স্বজনদের

আশপাশেও নয়। ওর কবর খোঁড়া হয়েছে গোরস্থানের এক প্রান্তে সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢালে; যেখানে গোরস্থানের দেয়াল এত নিচু যে মাঠের বুনো ফুলেরা অনায়াসে উঁকি দিতে পারে সেখান দিয়ে।

বারো

সেদিনই রাতে বাতাস দিক বদলে উত্তর-পূব থেকে বইতে শুরু করলো, এবং প্রথমে বৃষ্টি তারপর তুষার নিয়ে এলো। পর দিন সকাল নাগাদ সারা এলাকা শাদা হয়ে গেল তুষারে চাপা পড়ে। বেশ বেলা হয়ে যাওয়ার পরও এডগার লিনটন ঘর থেকে বেরোলো না। আমি হাতের কাজ সব সেরে বাচ্চা ক্যাথিকে নিয়ে গিয়ে বসলাম পার্লারে। ওকে কোলে ক'রে দোল দিচ্ছি আর জানালার বাইরে স্তরে স্তরে তুষার জমে ওঠা দেখছি।

হঠাৎ ঘরের ঠিক বাইরে শুনতে পেলাম নারীকণ্ঠে উচ্ছল হাসির শব্দ। একটু পরেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো কেউ। আমি দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে ছিলাম। কে ঢুকেছে দেখতে পাইনি। নির্বোধ ঝি-টা ভেবে রেগে বললাম, 'আচ্ছা সাহস তো তোমার! মিস্টার লিনটন এ হাসি শুনে কী বলবেন?'

'দুঃখিত,' জবাব দিলো একটা গলা, 'কিন্তু, কী করবো, নিজেকে থামাতে পারছি না আমি। এডগার নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে।'

গলাটা ঝিয়ের নয়, তবে অপরিচিতও নয়। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মিসেস হীথক্লিফ। খুশিতে উজ্জ্বল মুখ। এগিয়ে এসে আগুনের সামনে বসলো সে। বললো, 'ওয়াদারিং হাইটস থেকে এ পর্যন্ত পুরো পথ দৌড়ে এসেছি। ক'বার যে পড়েছি, আর ক'বার পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি বলতে পারবো না। ভয় পেও না, এলেন, ভয়ের কিছু নেই। একটু দম নিয়ে নিতে দাও, তারপর সব খুলে বলছি তোমাকে। কিন্তু তার আগে একটু উপকার করবে আমার?—বাইরে গিয়ে কোচোয়ানকে বলো গাড়িটা তৈরি করতে, আমাকে গিমারটনে পৌঁছে দিয়ে আসবে; আর কাউকে বলো আমার কাবার্ড থেকে দু'একটা কাপড় এনে দিতে।'

চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম না এত খুশির কী কারণ ঘটেছে ওর। চুলগুলো ভিজে ঝুলে পড়েছে কাঁধের ছেঁড়া কাপড়ের ওপর, পোশাকটা ভিজে সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে। তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি আর তুষার ঝরে পড়ছে মেঝেতে। পায়ে শুধুমাত্র চটি। এই অবস্থায় প্রায় চার মাইল দৌড়ে আসার পর অমন হাসি কী ক'রে হাসছে ও?

'যতক্ষণ না ঐ নোংরা ভিজে কাপড় বদলে শুকনো কিছু পরছো ততক্ষণ এখান

থেকে নড়ছি না আমি,' বললাম। 'তাছাড়া এই আবহাওয়ায় তুমি গিমারটনে যেতে পারবে না। সুতরাং কোচোয়ানকে—'

'না, যেতেই হবে আমাকে। তবে শুকনো কিছু পরে একটু ভদ্র হতে আপত্তি নেই আমার।'

আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, এই তুষারপাতের ভেতর একা একা গিমারটনে যাওয়ার চেষ্টা করা পাগলামি। তাছাড়া দরকারটাইবা কী গিমারটনে যাওয়ার? এখানে থাকলেই তো হয়। কিন্তু ও ওর কথায় অটল রইলো—যাবেই। উপরন্তু ভয় দেখালো, কোচোয়ানকে যদি পৌঁছে দিতে না বলি ও হেঁটেই চলে যাবে, এবং এই ভিজে পোশাকে।

'আচ্ছা ঠিক আছে, বলছি কোচোয়ানকে,' আমি বললাম, 'কিন্তু আগে ভেজা কাপড়টা পাল্টে নাও।'

'না, আগে বলে এসো তুমি, তারপর কাপড় ছাড়বো।'

অগত্যা যেতেই হলো আমাকে কোচোয়ানকে বলতে। ফেরার পথে ইসাবেলার ঘরে গিয়ে নিয়ে এলাম এক প্রস্থ শুকনো কাপড়। কাজের মেয়েটাকে ডেকে বললাম একটা বাক্সে আরো কিছু কাপড় ভরে নিচে নিয়ে আসতে।

মাথা গা মুছে ভেজা কাপড় পাল্টে আগুনের সামনে বসলো আবার ইসাবেলা।

'এবার, এলেন, এক কাপ চা দাও আমাকে,' বললো সে, 'তারপর বসো আমার সামনে।'

গরম এক কাপ চা আর কিছু খাবার এনে রাখলাম আমি ওর সামনে। আবার কোলে তুলে নিলাম বাচ্চা ক্যাথিকে।

'রেখে এসো ওকে,' বললো ইসাবেলা। 'ওকে দেখতে চাই না আমি। তাই বলে ভেবো না ওর মায়ের প্রতি আমার যে অনুভূতি ছিলো তা নষ্ট হয়ে গেছে। ক্যাথরিনের মারা যাওয়ার খবর শুনে ভীষণ কেঁদেছি আমি, তবে হীথক্লিফকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করিনি। পশু—না পশু বললে কম বলা হয়, দানব একটা ও!' বলতে বলতে হাত থেকে বিয়ের আংটিটা খুলে সক্রোধে আগুনে ছুঁড়ে দিলো ইসাবেলা।

'বুঝতে পারছি তুমি পালিয়ে এসেছো স্বামীর কাছ থেকে,' আমি বললাম। 'কেন? তা ছাড়া যাবে কোথায় এখন?'

'যেখানে খুশি। ঐ দানবটার কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব। যে ব্যবহার আমার সাথে করেছে! ওহ্! ক্যাথরিনের জন্যে চোখের পানি না ঝরিয়ে যদি বুকের রক্ত ঝরায় তবু আমার এক বিন্দু করুণা হবে না ওর জন্যে! আমি ওকে আমার হৃদয়টা দিয়েছিলাম ভালোবেসে, কিন্তু ও সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। তারপর ফিরিয়ে দিয়েছে আমার কাছে। এখন ওর জন্যে এক বিন্দু মায়াও নেই এই মরা হৃদয়ে।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো ইসাবেলা। একটু পরে চোখের পানি মুছে বলতে

লাগলো, 'এখানেই থাকতাম আমি, কিন্তু ও তো দেবে না। তুমি কি মনে করো আমি সুখে শান্তিতে আছি দেখে ও চুপ ক'রে বসে থাকবে? কক্ষনো না। তাই ঠিক করেছি এখানে থাকবো না, ওর ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবো। এমনিতেই যথেষ্ট ভুগেছে এডগার, আমার কারণে ওর জীবনে অশান্তি নেমে আসুক তা আমি চাই না।

'এবার তাহলে শোনো, এলেন, কেন আমি পালিয়ে এসেছি। বদমাশটাকে এমন খেপিয়ে দিয়েছি যে আরেকটু হলে খুনই করছিলো আমাকে!'

'সে কী!'

'হ্যাঁ। গত রোববার ক্যাথি মারা যাওয়ার পর থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লোক হয়ে গেছে হীথক্লিফ। এই প্রায় পুরো সপ্তাহ আমাদের সাথে এক বেলাও খায়নি, অন্য কোথাও কিছু খেয়েছে বলেও মনে হয় না। রোজ ভোরে বাড়িতে ফিরে ওপর তলায় নিজের ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করেছে। বেরিয়েছে বিকেলে এবং নিচে নেমে কারো দিকে না তাকিয়ে, কারো সাথে কথা না বলে সোজা বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। আমার বিশ্বাস এখানেই এসেছে ও প্রতিদিন। এডগার যে কেন ওকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেয়নি ভেবে অবাক লাগে।

'ক্যাথরিনের মৃত্যুতে সত্যি সত্যি দুঃখ পেয়েছি আমি, তবু এই এক সপ্তাহ হীথক্লিফের গালাগালি শুনতে হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে ছুটি কাটাচ্ছি যেন। গ্র্যাঞ্জ ছেড়ে যাওয়ার পর এত শান্তিতে কাটাইনি কোনো দিন।

'কাল রাতে রান্নাঘরে আগুনের সামনে বসে পুরনো একখানা বই পড়ছিলাম—পড়ছিলাম ঠিক না, পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিছুতেই মন দিতে পারছিলাম না বইয়ের পাতায়। বার বার ভাবনা চলে যাচ্ছিলো গোরস্থানের পাশে নতুন খোঁড়া কবরটার দিকে। হিণ্ডলেও ছিলো ঘরে। ও কিন্তু কখনোই দুর্ব্যবহার করেনি আমার সাথে, চরম মাতাল অবস্থায়ও না। আমার সামনেই একটা চেয়ারে বসে ছিলো ও মাথায় হাত দিয়ে। অনেকক্ষণ আগে মদ খাওয়া বন্ধ করেছে, বোধ হয় মাতাল হওয়ার ইচ্ছে হয়নি। আমি যা ভাবছিলাম বসে বসে তা-ই ভাবছিলো সম্ভবত। কখন যে রাত বারোটা বেজে গেছে টের পাইনি। বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জন ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই বাড়িতে। হেয়ারটন আর জোসেফ ঘুমিয়ে পড়েছে।

'অবশেষে ভাঙলো এই শোচনীয় নীরবতা। কে যেন দরজা খোলার চেষ্টা করছে রান্নাঘরের। চমকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। হিণ্ডলেও মুখ তুললো। কে এসেছে বুঝতে অসুবিধা হয়নি দু'জনের কারো। গত ক'দিনের চেয়ে অনেক আগে ফিরে এসেছে হীথক্লিফ, সম্ভবত আকস্মিক ঝড় এবং তুষারপাতের কারণে। রান্নাঘরের দরজায় তালা দেয়া ছিলো। শুনতে পেলাম ঘুরে সামনের দরজার দিকে যাচ্ছে ওর পদশব্দ। হিণ্ডলে তাকালো আমার দিকে।

"পাঁচ মিনিট বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবো ওকে," বললো সে। "তুমি আপত্তি করবে না তো?"

"পাঁচ মিনিট কেন সারারাত রাখলেও আপত্তি করবো না," আমি বললাম।

'উঠে দাঁড়ালো হিণ্ডলে। হীথক্লিফ সামনের দরজায় পৌঁছুনোর আগেই সে ওখানে পৌঁছে দরজায় তালা লাগিয়ে ফিরে এলো রান্নাঘরে। ওর চোখে জ্বলন্ত ঘৃণা দেখতে পেলাম আমি।

"তোমার আমার দু'জনেরই কিছু বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে ঐ লোকটার সাথে," বললো সে। "তুমিও তোমার ভাইয়ের মতো নরম?—নাকি প্রয়োজনে যে তোমার ক্ষতি করেছে তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারো? কিছুই করতে হবে না তোমাকে, মিসেস হীথক্লিফ. শুধু বসে থাকবে, আর একটা কথাও বলবে না। আজই যদি এর একটা বিহিত না করি ও তোমার মৃত্যু ঘটাবে আর শেষ ক'রে দেবে আমাকে। শোনো, কেমন ক'রে দরজা ধাক্কাচ্ছে, যেন এ বাড়ির মনিব হয়ে গেছে এর মধ্যেই! বলো, চুপ ক'রে থাকবে? যদি থাকো তিন মিনিটের মধ্যে তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে!"

'জ্যাকেটের নিচ থেকে সেই অদ্ভুত অস্ত্রটা বের করলো হিণ্ডলে—যেটার কথা চিঠিতে লিখেছিলাম তোমাকে। মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতে গেল। আমি ওটা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেলাম এক পাশে। বললাম, "আমি কিন্তু চুপ ক'রে থাকবো না। আর যা-ই করুন ওর গায়ে হাত তুলতে পারবেন না আপনি। দরজা বন্ধ আছে, এখন চুপ ক'রে বসে থাকুন। দেখুন কী হয়।"

"না।" চিৎকার করলো হিণ্ডলে! "আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি, আজই হয়ে যাবে এসপার নয় ওসপার। তুমি মুক্তি না চাইতে পারো, কিন্তু আমি হেয়ারটনকে ভিখিরি বানাতে চাইতে পারি না। ভাবছো ওর সাথে পারবো না আমি? না পারি ক্ষতি নেই। ক্যাথরিন মরে গেছে; আমি মরলে দুঃখ পাওয়ার আর কেউ নেই। আজ রাতের পর এই পৃথিবীতে হয় ও থাকবে নয়তো আমি থাকবো।"

'পাগলকে বোঝালে লাভ হলেও হতে পারে কিন্তু হিণ্ডলেকে অসম্ভব বোঝানো। অতএব আমার করণীয় রইলো একটাই। জানালার কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করলাম, "আজ রাতটা বাইরে কোথাও কাটিয়ে এসো! মিস্টার আর্নশ ঠিক করেছে তোমাকে খুন করবে।"

"অত কথা না বলে দরজাটা খুলে দিতে পারছো না,——!" পাল্টা প্রশ্ন করলো হীথক্লিফ, এমন একটা সম্বোধন করলো যা আমার পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।

"তোমাকে আর কোনোরকম সাহায্য আমি করবো না," চেঁচালাম আমি। "ইচ্ছে হলে ভেতরে এসে গুলি খেতে পারো। আমার যতটুকু কর্তব্য ছিলো করেছি।"

'জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে আমার জায়গায় এসে বসলাম। হিণ্ডলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগলো আমাকে, এখনো আমি হীথক্লিফকে ভালোবাসি, এসব বলে। হঠাৎ আমার পেছনের জানালাটার কাচ ঝন ঝন শব্দে ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম হীথক্লিফের মুখ উঁকি দিচ্ছে। ভাঙা অংশটা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো ও। কিন্তু ওর কাঁধ অনেক বেশি চওড়া ফোকরটার চেয়ে। হাসি ফুটে উঠলো আমার মুখে, আর যা-ই হোক এখনো বাইরে আমি ওর নাগালের। ওর চুল, ভুরু, কাপড় সব শাদা হয়ে গেছে তুষারে। সত্যিকারের দানবের মতো দেখাচ্ছিলো ওকে।

"ইসাবেলা, ঢুকতে দাও আমাকে, নইলে তোমার অবস্থা খারাপ ক'রে দেবো আমি!" চেঁচালো ও।

"আমি একটা খুনীকে সাহায্য করতে পারি না," বললাম। "মিস্টার হিণ্ডলে ছোরা আর পিস্তল নিয়ে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে!"

"তাহলে রান্নাঘরের দরজা খুলে দাও।"

"আমি যাওয়ার আগেই হিণ্ডলে পৌঁছে যাবে ওখানে। কেমন প্রেমিক তুমি, হীথক্লিফ! এই সামান্য তুষার সহ্য করতে পারছো না! তোমার জায়গায় আমি হলে ক্যাথরিনের কবরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতাম এবং মরতাম বিশ্বস্ত কুকুরের মতো। বুঝতে পারছি না ওকে হারিয়ে বেঁচে আছো কী ক'রে তুমি!"

'আমার কথা শেষ হতে না হতেই হিণ্ডলে ছুটে এলো পাশের ঘর থেকে।

"ওখানে ও?" চিৎকার ক'রে সে ছুটে গেল ভাঙা জানালাটার কাছে। ফোকরের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে অদ্ভুত পিস্তলটা তাক করলো হীথক্লিফের দিকে। হীথক্লিফ এক দিকে সরে গিয়ে ঝটকা মেরে ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো অস্ত্রটা। টানাটানিতে ওটার বোতামে চাপ পড়ে গেল। দু'ধার ছোরাটা ছুটে এসে বিঁধলো তার মালিকেরই হাতে। হীথক্লিফ হ্যাঁচকা টানে বেশ খানিকটা মাংসসহ খুলে নিলো ছোরাটা। রক্তাক্ত অবস্থায়ই ওটা ভরে রাখলো নিজের পকেটে। এরপর ও বড় সড় একটা পাথর কুড়িয়ে এনে ঘা মেরে মেরে ভেঙে ফেললো পুরো জানালাটা। লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকলো বিনা বাধায়। ব্যথা আর রক্তক্ষরণে অচেতন হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে তখন হিণ্ডলে। ঘরে ঢুকেই আগে আমাকে ধরলো হীথক্লিফ। এক হাতে আমাকে ধরে এলোপাতাড়ি লাথি মারতে লাগলো হিণ্ডলেকে। আমি চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম জোসেফকে।

'লাথি মেরে মনের ঝাল যখন মিটলো, থামলো হীথক্লিফ। এক হাতে ধরে অচেতন দেহটা টেনে এনে তুললো সোফার ওপর। তারপর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে হিণ্ডলেরই জ্যাকেটের হাতা ছিঁড়ে বেঁধে দিতে লাগলো তার ক্ষত। আমি এক মুহূর্ত দেখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম জোসেফের খোঁজে।

'সিঁড়ির মুখে পৌঁছে দেখি জোসেফ নেমে আসছে। "কী হয়েছে? কী

হয়েছে?" করতে করতে ঢুকলো ও রান্নাঘরে।

"তোর মনিব পাগল হয়ে গেছে," চিৎকার করলো হীথক্লিফ। "ওর গা থেকে রক্তগুলো ধুয়ে ফেল, বদমাশ।"

"তু-তুমি খুন করছিলে ওকে?" মেঝেতে রক্ত আর সোফার ওপর রক্তাক্ত, অচেতন হিণ্ডলেকে দেখে আতঙ্কে চিৎকার ক'রে চোখ ঢাকলো জোসেফ। "ওহ ঈশ্বর! এমন ভয়ানক—"

ওকে আর বলতে দিলো না হীথক্লিফ, ঠেসে ধরে বসিয়ে দিলো রক্ত পরিষ্কার করতে। ওর দিকে একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিয়ে ধরলো আমাকে। "বদমাশটার দলে ভিড়েছিলি, না, কালসাপিনী?" বলে দু'হাতে এমন ঝাঁকাতে লাগলো যে আমার দাঁত ঠকঠকিয়ে ব্যথা হয়ে গেল। জোসেফের পাশে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "যা ওকে সাহায্য কর। এসব কাজ তো তোর পছন্দ।"

জোসেফ গজ গজ করতে করতে তোয়ালে দিয়ে রক্ত মুছে চললো। কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এলো মিস্টার আর্নশর। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো সে। হীথক্লিফের নির্দেশে জোসেফ তাড়াতাড়ি একটু ব্র্যান্ডি এনে খাওয়ালো ওকে। হীথক্লিফ কড়া গলায় শাসালো, "মদের ঘোরে যা করেছো করেছো, ভবিষ্যতে আর কখনো অমন করবে না। করলে এবার আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। যাও, এখন গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

চলে গেল হীথক্লিফ। হিণ্ডলে যেখানে ছিলো সেখানেই আবার শুলো লম্বা হয়ে! আমি গিয়ে ঢুকলাম আমার ঘরে। এত সহজে নিস্তার পেয়ে যাবো কল্পনাও করিনি।

সকালে নিচে এসে দেখি মিস্টার আর্নশ আগুনের সামনে বসে। চেহারায় অসুস্থতার ছাপ। হীথক্লিফ বসে আছে চিমনিতে হেলান দিয়ে, ওরও চেহারা বিধ্বস্ত। খেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম ওদের। কেউ কোনো জবাব দিলো না। অগত্যা আমি একাই বসলাম খেতে। আমার খাওয়া শেষ হওয়ার পর হিণ্ডলে পানি চাইলো এক গ্লাস। আমি ওকে পানি দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছে ও।

"সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা," জবাব দিলো হিণ্ডলে, "মনে হচ্ছে যেন কয়েক শো দৈত্যের সাথে লড়েছি।"

"যন্ত্রণা তো হবেই," আমি বললাম, "মারা যে পড়েননি এ-ই তো বেশি।"

তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালো হীথক্লিফ।

"মানে?" জিজ্ঞেস করলো হিণ্ডলে। "যখন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম ও মেরেছে আমাকে?"

"শুধু মার!" আমি বললাম। "মনের সুখে লাথিয়েছে, পাড়িয়েছে! মানুষ নাকি ও?"

"যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে!" চিৎকার করলো হীথক্লিফ।

অন্য সময় হলে তা-ই যেতাম। কিন্তু তখন আমার মাথায় যে কী ভর

করেছিলো জানি না। বললাম, "দুঃখিত, তোমার কথা শুনতে পারছি না। আমিও ভালোবাসতাম ক্যাথরিনকে। ওর ভাইয়ের এখন সাহায্য দরকার, ওর স্মৃতি মনে ক'রে সে সাহায্য আমি করবো। ও মারা গেছে, এখন ওর ভাইয়ের মাঝে আমি ওকে দেখতে—"

"বেরো! এক্ষুণি বেরো এখান থেকে! নইলে তোকেই এবার পাড়িয়ে মারবো!" প্রচণ্ড রোষে চেঁচিয়ে উঠলো হীথক্লিফ।

"বেচারি ক্যাথরিন যদি ভরসা ক'রে তোমাকে বিয়ে করতো তাহলে মানুষের সাথে এমন ব্যবহার ও করতে দিতো না তোমাকে।"

তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালো হীথক্লিফ। আমার আর ওর মাঝে রয়েছে সোফা আর আর্নশ, তাই এগোনোর চেষ্টা না ক'রে টেবিল থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো আমার মাথা লক্ষ্য ক'রে। আমার কানের লতি ছুঁয়ে চলে গেল ছুরিটা। এক সেকেণ্ডও দেরি না ক'রে দরজার দিকে ছুটলাম আমি। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালাম শেষ একটা অপমান ওর উদ্দেশে ছুঁড়ে মারার জন্যে। কিন্তু মুখ খোলার আগেই লক্ষ করলাম ভয়ঙ্কর আক্রোশে লাফ দিয়ে এগিয়ে আসছে ও আমার দিকে। ততক্ষণে লাফ দিয়েছে হিণ্ডলেও। আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ঝাপটে ধরলো সে হীথক্লিফকে। কয়েক মুহূর্ত ধস্তাধস্তির পর মাটিতে পড়ে গেল দু'জনেই। আমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। উঠানে নেমে দেখলাম জোসেফকে। চিৎকার ক'রে ওকে ওর মনিবের কাছে যেতে বলে সোজা ফটক পেরিয়ে রাস্তায়। সেই থেকে তুষারের ভেতর দিয়ে একটানা দৌড়ে পৌঁছেছি গ্র্যাঞ্জে। জোর করলে আমি নরকে গিয়ে থাকতে রাজি, কিন্তু ওয়াদারিং হাইটসের ছাদের নিচে আর এক রাতও না।'

থামল ইসাবেলা। চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি আবার ওকে অনুরোধ করলাম থেকে যেতে। কিন্তু ও কানেও তুললো না আমার কথা। শালটা গায়ে জড়িয়ে গিয়ে উঠলো অপেক্ষমাণ গাড়িতে। চলে গেল ইসাবেলা। সে-ই শেষ যাওয়া, গ্র্যাঞ্জে বা আশপাশের এলাকায় আর কখনো ফেরেনি ও।

কয়েক সপ্তাহ পরে ওর কাছ থেকে একটা চিঠি এলো। এ চিঠির জবাব দিলো লিনটন। এর পর থেকে নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান প্রদান হতে লাগলো ভাই বোনের ভেতর। মনিবের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে আমি জানতে পারলাম, দক্ষিণে লণ্ডনের কাছে এক জায়গায় আছে ও। কয়েক মাস পরে খবর এলো একটা ছেলে হয়েছে ইসাবেলার। তার নাম রেখেছে ও লিনটন। ছেলেটা জন্ম থেকেই রোগা, দুর্বল প্রকৃতির।

এর কিছুদিন পর হঠাৎ হীথক্লিফের সাথে দেখা আমার গিমারটনে। ইসাবেলা কোথায় আছে জিজ্ঞেস করলো সে। আমি বলতে অস্বীকার করলাম। তখন সে

বললো, ইসাবেলা কোথায় আছে না আছে তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই; তবে যদি ভাইয়ের কাছে আসে তাহলে ওকে সে শান্তিতে থাকতে দেবে না। পরে সে জানতে পেরেছিলো—আমার ধারণা অন্য চাকর বাকরদের কাছ থেকে—কোথায় আছে ইসাবেলা এবং ওর যে একটা ছেলে হয়েছে সে খবর। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলো হীথক্লিফ, কখনোই জ্বালাতে যায়নি ইসাবেলাকে। মাসে দু'মাসে একবার ঘটনাচক্রে আমার সাথে দেখা হলে ও জিজ্ঞেস করতো ছেলেটার কথা। প্রথম যেদিন বলেছিলাম ওর নাম রাখা হয়েছে লিনটন, সেদিন গম্ভীর একটু হেসে হীথক্লিফ বলেছিলো, 'ওরা চায় ওকেও আমি ঘৃণা করি, তাই না?'

'কী চায় তা জানি না,' আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'তবে এটুকু জানি তুমি বাচ্চাটার সম্পর্কে কিছু জানো তা ওরা চায় না।'

'তাহলে এটাও জেনে রাখো, আমি যখন ইচ্ছা নিয়ে নিতে পারি বাচ্চাটাকে। বলে দিও ওদের কথাটা।'

সৌভাগ্যবশতঃ সে সময় আসার আগেই মারা যায় ইসাবেলা। ক্যাথরিনের মৃত্যুর তের বছর পরের কথা সেটা! ছোট্ট লিনটনের বয়েস তখন বারোর কিছু বেশি।

তেরো

স্ত্রীর মৃত্যুর পর একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে গেল আমার মনিব। সব কাজকর্ম ছেড়ে দিলো, এমন কি গির্জায় যাওয়া পর্যন্ত। একমাত্র ক্যাথরিনের কবর দেখতে যাওয়া ছাড়া বাড়ি থেকে বেরই হয় না সে। সারাদিন হয় বাগানে ঘুরে বেড়ায়, নয় তো পড়ার ঘরে ডুবে থাকে বইয়ের ভেতর।

তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই মনোযোগ দেয়ার মতো, ভালোবাসবার মতো, আঁকড়ে ধরে স্ত্রীর দুঃখ ভোলবার মতো একটা জিনিসের খোঁজ সে পেয়ে গেল। জন্মের সময় যে ছোট্ট মেয়েটিকে ও খেয়ালও করেনি, এপ্রিলের শেষ ন্যাগাদ সে-ই হয়ে উঠলো ওর চোখের মণি।

বাচ্চা ক্যাথিকে কখনোই সে পুরো নামে ডাকেনি যেমন ডাকেনি প্রথম ক্যাথরিনকে আদরের সংক্ষিপ্ত নামে, সম্ভবত হীথক্লিফ ওকে ওভাবেই ডাকতো বলে।

হিণ্ডলে আর্নশ যে আর বেশি দিন বাঁচবে না তা আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম। তবে এত তাড়াতাড়িই যে মারা যাবে ভাবতে পারিনি। ক্যাথরিনের মৃত্যুর পর ছ'মাস পুরতে না পুরতেই চলে গেল সে মাত্র সাতাশ বছর বয়েসে।

খবরটা পাওয়ার পর আমার চিন্তা হলো, হীথক্লিফ ঠিক মতো ওর শেষকৃত্য করাবে তো? মনিবের কাছে অনুমতি চাইলাম ওয়াদারিং হাইটসে গিয়ে সব একবার দেখে আসার। মিস্টার লিনটন প্রথমে চাইলো না আমাকে যেতে দিতে। তখন আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম ওখানকার বাচ্চাটা, মানে হেয়ারটন তার স্ত্রীর ভাস্তে। এবং যেহেতু ও তার সবচেয়ে কাছের আত্মীয় সেহেতু ওর দেখাশোনা করা তার কর্তব্য। তাছাড়া স্ত্রীর ভাইয়ের বিষয় সম্পত্তির দেখাশোনা করাও তার কর্তব্য। এসব শুনে অবশেষে রাজি হলো এডগার আমাকে যেতে দিতে। আমার মনিবের উকিল যে ভদ্রলোক তিনি হিণ্ডলেরও উকিল। ঠিক করলাম হাইটসে যাওয়ার পথে গিমরেটনে ভদ্রলোকের বাড়ি ঘুরে যাবো।

'হেয়ারটনের বাবা বিরাট অঙ্কের ঋণ রেখে মারা গেছে,' বললেন উকিল। 'তার পুরো সম্পত্তির যা দাম ঠিক তত টাকা সে ধার করেছে হীথক্লিফের কাছ থেকে। এখন তার ছেলের একটাই করণীয় আছে, হীথক্লিফের মনে ঠাঁই ক'রে নেয়া। এটা যদি করতে পারে তাহলে হয়তো তাকে মাথার ওপরের ছাদটা হারাতে হবে না।'

হাইটসে যখন পৌঁছুলাম হীথক্লিফ আমাকে দেখে বললো, আমি কেন এসেছি তা সে বুঝতে পারছে না; তবে যখন এসেই পড়েছি আমি থাকতে পারি ইচ্ছে হলে, এবং সাহায্য করতে পারি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনে।

'আমার মত যদি চাও,' বলে চললো ও, 'গর্দভটার কবর হওয়া উচিত ফাঁকা মাঠের ভেতর কোনো রকম ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া। কাল বিকেলে মাত্র দশ মিনিটের জন্যে আমি ওকে একা রেখে গেছিলাম। ফিরে এসে দেখি সব দরজা ভেতর থেকে তালা মেরে দিয়েছে, যাতে আমি ওর কাছে যেতে না পারি। মরবে প্রতিজ্ঞা ক'রে মদ খেয়েছে সারা রাত। সকালে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি ওখানেই ঐ সোফার ওপর পড়ে আছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীর। ডাক্তার কেনেথকে খবর দেয়ার পর উনি এসে বললেন মারা গেছে।'

'যা হওয়ার হয়েছে,' আমি বললাম, 'এখন অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানটা ভদ্রসম্মত হওয়া দরকার।'

'তোমার যা খুশি করতে পারো,' বললো হীথক্লিফ, 'শুধু খেয়াল রেখো, যা খরচ হবে তার প্রতিটা ফার্দিং আমার পকেট থেকে যাবে।'

অন্ত্যেষ্টি শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার ঠিক আগে বাচ্চা হেয়ারটনকে তুলে একটা টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলো হীথক্লিফ। অদ্ভুত আন্তরিকতায় বিড়বিড় করে বলতে লাগলো: 'এখন থেকে তুই আমার—শুধুই আমার! আমি দেখবো বাতে এই গাছটাকে একেবারে শেষ পর্যন্ত বাঁকা চোরা ক'রে গড়ে তোলা যায়।'

হতভাগা ছেলেটা কিছুই বুঝলো না এসব কথার মর্ম। তবে হীথক্লিফ যে ওর দিকে এতটা মনোযোগ দিয়েছে এজন্যে সে খুশি হলো। বদলোকটার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগলো, ওর গালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি

বললাম:

'ওকে আমি থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে নিয়ে যাবো। এই পৃথিবীতে ওর চেয়ে অপছন্দের আর কী আছে তোমার কাছে?'

'লিনটন বলেছে ওকে নিয়ে যেতে?' জানতে চাইলো হীথক্লিফ।

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে তো আর কোনো আলাপ আলোচনার দরকার নেই। এখানেই থাকবে ছেলেটা। লিনটন যখন ওকে চায় তখন কিছুতেই আমি ওকে ছাড়তে পারি না। লিনটনকে বোলো, ওকে চাইলে নিজে এসে যেন নিয়ে যায়।'

বলাই বাহুল্য হেয়ারটনের জন্যে কিছু করার ইচ্ছা আমার এখানেই শেষ হয়ে গেল। গ্র্যাঞ্জে ফিরে মিস্টার লিনটনকে বলেছিলাম হীথক্লিফের বক্তব্য, কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারিনি হীথক্লিফ যে বাড়িতে থাকে সেখানে যেতে।

হেয়ারটন, যে এতল্লাটে সেরা মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারতো সে বড় হতে লাগলো তার বাবার জাত শত্রুর দয়ার ওপর নির্ভর করে, নিজের বাড়িতে চাকরের মতো থেকে। বুঝতে শিখে নিজের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা যে করবে সে সুযোগটাও পায়নি বেচারি বন্ধুর অভাবে। সত্যি কথা বলতে কি ও যে খারাপ অবস্থায় আছে, ওর ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে এই সত্যটাই কোনোদিন বুঝতে বা জানতে পারেনি ও।

অনেক নিরানন্দ বিষণ্ন বাড়িতেই ছোট্ট একটা ফুটফুটে, ছটফটে, উচ্ছল মেয়ে এসে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়। এরকম সব বাচ্চার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ফুটফুটে, ছটফটে, উচ্ছল ছিলো আমাদের ক্যাথি। অদ্ভুত মিষ্টি চেহারা। চোখ কালো আর্নশদের মতো, আর গায়ের রঙ লিনটনদের মতো—ঝকঝকে উজ্জ্বল। মাথার কোঁকড়া হলদেটে চুলও পেয়েছিলো বাপের কাছ থেকে। আগেই বলেছি ও ছটফটে ছিলো, এত ছটফটে যে ওকে দেখে ওর মায়ের কথা মনে পড়ে যেতো আমার। তবে ওর মায়ের বদমেজাজ একেবারেই পায়নি ও। নরম, মিষ্টি ছোট্ট একটা পাখির মতো ছিলো ও। গলার স্বর অদ্ভুত কোমল। তবে হ্যাঁ, দোষ যে একেবারে ছিলো না তা নয়, ভীষণ জেদী ছিলো ও, বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান বেশি আদরে যেমন হয়।

বয়েস তের বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কখনো ও একা থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জের সীমানার বাইরে যায়নি। যা-ও বা গেছে, কচিৎ, সীমানার ওপাশে এক বা দু'মাইল এবং একমাত্র মিস্টার লিনটনের সঙ্গে। আর কারো সাথে ওকে ছাড়তে কখনো ভরসা পায়নি ওর বাবা। গিমারটন নামটা কেবল নামই ছিলো ওর কাছে, কখনো যাওয়ার ভাগ্য হয়নি ওখানে এই তের বছরের ভেতর। ওয়াদারিং হাইটস এবং হীথক্লিফের অস্তিত্ব গোপন রাখা হয়েছিলো ওর কাছে। মোট কথা থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জের

বাইরে যা কিছু সব ওর কাছে অজানা, অপরিচিত, রহস্যময় একটা কিছু। এমনিতে খুশি মনেই থাকতো ও বাড়িতে। কিন্তু মাঝে মাঝে দোতলায় ওর ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়, উপত্যকা, গ্রাম দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করতো: 'এলেন, আর কতদিন পর ঐ সব জায়গায় একা একা যেতে পারবো আমি? ঐ পাহাড়ের ওপাশে কী আছে? সাগর? বাইরে এতসব জিনিস আমি কখনো দেখিনি! বাবাকে জিজ্ঞেস করবো আমি যেতে পারবো কিনা।'

অনেকবার ও জিজ্ঞেস করেছে বাবাকে। জবাব পেয়েছে এক, 'এখন না, ক্যাথি। এখনও সময় হয়নি।'

এডগার ভয় পেতো, মেয়ে একা একা বেড়াতে বেরোলে এক দিন না একদিন হীথক্লিফের সামনে পড়ে যাবেই। ঘটনাটা ঘটা দূরে থাক কল্পনা করাও অসহ্য তার পক্ষে।

স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার পর বছর বারো বেঁচেছিলো মিসেস ইসাবেলা হীথক্লিফ। ভাইয়ের মতো তারও স্বাস্থ্য কখনোই খুব একটা ভালো ছিলো না। শেষ অসুখটা ওর কী হয়েছিলো আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয় ওর ভাই যে অসুখে মারা গিয়েছিলো সেই একই অসুখ। শুরুটা হয় খুব ধীরে, কোনো ওষুধেই ভালো হয় না। দুর্বল হতে হতে এক সময় মারা যায় রোগী।

ছোট্ট ক্যাথির বয়েস যখন তের সেই সময় ইসাবেলার কাছ থেকে একটা চিঠি এলো। লিখেছে, তার ভাইকে যেন বলি তার মনে হচ্ছে সে আর বেশি দিন বাঁচবে না, সম্ভব হলে যেন যায় তাকে একবার দেখতে। অনেক কথা বলার আছে তার এডগারকে, তা ছাড়া ভাইয়ের কাছ থেকে সে শেষবারের মতো বিদায় নিতে চায়, আর তার হাতে তুলে দিতে চায় ছেলে লিনটনকে। ও আশা করে এডগার ভার নেবে লিনটনকে মানুষ করার।

এচিঠি পাওয়ার পর কোনো রকম ইতস্তত না করে আমার মনিব রওনা হয়ে গেল বোনকে দেখতে। ক্যাথিকে দিয়ে গেল আমার দায়িত্বে। বার বার সাবধান ক'রে দিয়ে গেল, যেন কোনো অবস্থাতেই ও বাড়ির সীমানার বাইরে যেতে না পারে—একা তো নয়ই, আমার সাথেও না।

তিন সপ্তাহ বাইরে থাকলো এডগার লিনটন। প্রথম দুটো দিন খুবই মন মরা হয়ে রইলো ক্যাথি। এই তের বছরের জীবনে একটা দিনও সে কাটায়নি বাপকে ছাড়া। খেলা, পড়াশোনা কিছুতেই ওর মন বসলো না। তৃতীয় দিনেই ওর আচরণ বদলে গেল। কেমন যেন অস্থিরতায় ভুগতে লাগলো। আমি ওর টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়ে গ্র্যাঞ্জ এলাকার (আকারে যথেষ্ট বড়) ভেতর ঘুরিয়ে চেষ্টা করলাম ওকে হাসিখুশি ক'রে তুলতে। কাজ হলো এতে। ঘোড়ায় চড়ে, কখনও কখনও পায়ে হেঁটে ও ঘুরতে লাগলো বাড়ির আশপাশে এবং ফিরে এসে আমাকে পাগল ক'রে তুলতে

লাগলো কী দেখেছে কী শুনেছে তার বর্ণনা দিয়ে।

সময়টা মধ্য-গ্রীষ্ম। আমি নিশ্চিন্ত এই ভেবে যে, ঘুরে ফিরে বেড়ানোর ব্যাপারটা পছন্দ হয়েছে ক্যাথির। সকালে নাশতার পর বেরিয়ে দুপুরে ফিরে আসে। তখন আমাকে শোনায় কী দেখেছে। কোনো কোনো দিন দুপুরে খাওয়ার সময় পার ক'রে আসে। আমি কিছু মনে করি না, -যা হোক একটা কিছু নিয়ে ভুলে আছে বাবার অনুপস্থিতি। কখনো কল্পনা করিনি ও বাড়ির সীমানার বাইরে চলে যেতে পারে।

সেদিন সকালে, আটটার দিকে নেমে এলো ক্যাথি নিজের ঘর থেকে। বললো, আজ সে আরব ব্যবসায়ী হবে। মরুভূমি পেরিয়ে যেতে হবে বলে আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি খাবার দিতে হবে তার আর তার জানোয়ারগুলোর জন্যে। একটা ঘোড়া আর তিনটে উট নিয়ে যাবে সে। উটের ভূমিকা পালন করবে তিনটে কুকুর—একটা বড় আর দুটো ছোট ছোট।

ওর নির্দেশমতো অনেকটা খাবার থলেতে পুরে টাট্টুর জিনের পাশে বেঁধে দিলাম। উৎফুল্ল মনে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল ও হাসতে হাসতে।

দুপুরে খাওয়ার সময় তো নয়ই বিকেলে চায়ের সময়ও ফিরলো না সে। একটা উট অর্থাৎ বড় কুকুরটা ফিরে এলো। কিন্তু ক্যাথি বা তার টাট্টু বা অন্য কুকুর দুটোর চেহারা দেখা গেল না কোনো দিকে। বাড়িতে চাকর বাকর যে ক'জন ছিলো সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম ওর খোঁজে। আমি নিজেও বেরোলাম।

রাস্তার কাছাকাছি পৌছে দেখি এক কামলা বেড়া মেরামত করছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম মনিবের মেয়েকে দেখেছে কিনা।

'সকালের দিকে দেখেছিলাম,' জবাব দিলো লোকটা। 'চাবুক বানাবে বলে একটা ডাল কেটে দিতে বললো। আমি কেটে দিতেই ও ওটা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে লাফিয়ে বেড়া পার হয়ে চলে গেল ঐ দিকে।' দিকটা ওয়াদারিং হাইটসের।

শুনে আমার কলজে শুকিয়ে যেতে চাইলো। পড়ি কি মরি ক'রে ছুটলাম হাইটসের দিকে।

ওখানে যখন পৌছুলাম তখন সন্ধ্যা। ফটকের কাছে দেখা হলো এক মহিলার সাথে। নাম জিল্লা। আগে থেকেই চিনতাম আমি ওকে। হিণ্ডলে আর্নশ মারা যাওয়ার পর ঘরের কাজকর্ম করার জন্যে ওকে রেখেছে হীথক্লিফ।

'আহ্, নেলি,' আমাকে দেখেই বলে উঠলো সে, 'মালিকের মেয়ের খোঁজে এসেছো তাহলে, ভয়ের কিছু নেই, ও এখানেই আছে এবং নিরাপদে আছে।'

'মিস্টার হীথক্লিফ—'

'বাড়িতে নেই,' বললো জিল্লা। 'উনি এবং জোসেফ, দু'জনেই বাইরে। এসো না ভেতরে, একটু জিরিয়ে যাবে।'

জিল্লার পেছন পেছন ঘরে ঢুকলাম আমি। ক্যাথি বসে আছে আগুনের সামনে।

ছোট্ট একটা চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। চেয়ারটা ওর মায়ের। ক্যাথরিন যখন ছোট ছিলো ঐ চেয়ারে বসে অমনি দোল খেতো সে। ক্যাথির হ্যাটটা ঝুলছে দেয়ালে একটা পেরেকের সাথে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বেশ আরামেই আছে ও। খিলখিল ক'রে হাসছে হেয়ারটনের সাথে কথা বলতে বলতে। হেয়ারটন এখন প্রায় যুবক। আঠারো বছর বয়েস। দেখে আরো বড় মনে হয়। দু'চোখ ভরা কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে দেখছে সে ক্যাথিকে। সামান্য বুঝতে পারছে সে ওর কথা, কারণ ক্যাথি কথা বলছে এমন এক ঢঙে, এমন এক ইংরেজীতে যা ওর সম্পূর্ণ অজানা।

ক্যাথিকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ লুকিয়ে চেহারা কঠোর ক'রে তুললাম আমি। বললাম, 'ভালো, মিস! খুব ভালো! তোমার বাবা ফিরে আসার আগে এ-ই তোমার শেষ বাইরে বেরোনো, আমি বলে দিলাম। আর কক্ষনো তুমি ঘরের বাইরে বেরোতে পারবে না, দুষ্টু মেয়ে!'

'এলেন, তুমি!' খুশিতে চিৎকার ক'রে লাফ দিয়ে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো ক্যাথি। 'তাহলে তুমি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছো একা একা বেরিয়ে আমি কোথায় যাই। আগে কখনো তুমি এখানে এসেছো, এলেন?'

'হ্যাট পরে নাও এক্ষুণি! বাড়ি যেতে হবে,' কড়া গলায় আমি বললাম। 'আর কোনোদিনও আমি তোমার বানানো গল্প শুনবো না। তুমি সত্যিই খুব খারাপ কাজ করেছো, মিস ক্যাথি। তোমার বাবা বলে গেছেন কিছুতেই যেন তোমাকে গ্র্যাঞ্জের সীমানার বাইরে না যেতে দেই, আর তুমি এভাবে পালিয়ে চলে এসেছো!'

'এত বকছো কেন আমাকে, এলেন!' ফোঁপাতে শুরু করলো ক্যাথি। 'কী করেছি আমি? বাবা আমাকে তো কিছু বলেনি। নিশ্চয়ই এখানে এসেছি বলে বকবে না আমাকে বাবা।'

'হয়েছে, কান্না থামাও! চলো তাড়াতাড়ি! তের বছরের কোনো মেয়ে এমন ক'রে কাঁদে কোনোদিন শুনিনি।'

'এলেন ডীন, এত ধমকাচ্ছো কেন বাচ্চাটাকে?' বললো জিল্লা। 'ও তো চলে যাচ্ছিলো, আমরাই না জোর ক'রে ধরে রাখলাম। মনে হলো সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পথ ভালো না, কোথায় বিপদ-আপদে পড়ে।'

হেয়ারটন পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি আমি এসে আলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় খুশি হয়নি সে।

'আর কতক্ষণ তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবো, ক্যাথি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'দশ মিনিটের ভেতর অন্ধকার হয়ে যাবে। তোমার ঘোড়া কই?'

'আস্তাবলে।' হেয়ারটনের দিকে তাকালো ক্যাথি। 'এই, আমার ঘোড়াটা এনে দাও তো।'

হেয়ারটনকে ক্যাথি সম্ভবত কাজের ছেলে বলে ধরে নিয়েছে। তাই অমন

ক'রে বললো ঘোড়া আনতে। কিন্তু হেয়ারটন ওর গলায় আদেশের সুর শুনেই চটে উঠলো।

'আমি তোমার চাকর নাকি?' বললো সে।

'আমার কী!?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো ক্যাথি।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না, ক্যাথির হাত ধরে বেরিয়ে এলাম বাইরে। নিজেরাই আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম গ্র্যাঞ্জের দিকে।

ওয়াদারিং হাইটসে হেয়ারটনের অবস্থানটা কী বুঝতে পারেনি ক্যাথি। চাকর না, তাহলে কী? পথে ও একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলো ওর সম্বন্ধে। শেষ পর্যন্ত আমি না বলে পারলাম না সত্যি কথাটা, হেয়ারটন ওর মামাতো ভাই। শুনে ভীষণ অবাক হলো ক্যাথি। কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকলো না, কাজের ছেলের মতো দেখতে, কাজের ছেলের মতো পোশাক আশাক পরে, কাজের ছেলের মতোই কথা বলে এমন একটা ছেলে ওর মামাতো ভাই হয় কী ক'রে? আমি করুণ একটু হাসলাম শুধু, ব্যাখ্যা আর করলাম না কেন ওর মামার ছেলে নিজের বাড়িতে কাজের ছেলের মতো থাকে।

দু'তিনদিন পরেই কালো প্রান্তঅলা একটা চিঠি এলো। ইসাবেলার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে মনিব লিখেছে কবে ফিরছে। আরো লিখেছে ভাগ্নে লিনটনকে সঙ্গে নিয়ে আসছে সে, আমি যেন একটা ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি লিনটনের জন্যে।

বাবা আসছে, এবং সাথে নিয়ে আসছে ওর ফুপাতো ভাইকে—শুনে খুশিতে নেচে উঠলো ক্যাথি। আসার দিন আমাকে নিয়ে ফটকের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলো ও বাবাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। পথের পাশে ঘাসের ওপর বসলো, কিন্তু এক মিনিটের জন্যে স্থির থাকতে পারলো না। একটু পরপরই প্রশ্ন করতে লাগলো, 'আসে না কেন?' 'আর কতক্ষণ লাগবে?' ইত্যাদি।

অবশেষে দূরে দেখা গেল গাড়িটা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ক্যাথি। গাড়ির জানালায় বাবার মুখ দেখামাত্র খুশিতে চিৎকার ক'রে দু'হাত বাড়িয়ে দিলো।

ফটকের কাছেই থামলো গাড়ি। তাড়াতাড়ি নেমে এসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলো মিস্টার লিনটন। আমি গাড়ির ভেতর উঁকি দিলাম ছোট লিনটনকে দেখার জন্যে।

এক কোণে ঘুমিয়ে আছে ও। গরম একটা কম্বল গায়ের ওপর, যেন শীতকাল এখন। মুখটা ফ্যাকাসে, ছোটখাটো; দেখেই মনে হয় দুর্বল, অসুস্থ।

বাবাকে আদর করার পর ক্যাথি ওর স্বভাবসুলভ ছটফটে ভঙ্গিতে দেখতে চাইলো ফুপাতো ভাইকে।

'মা, তোমার ভাই খুব শক্ত পোক্ত মানুষ নয়,' বললো মিস্টার লিনটন, 'তোমার মতো ডানপিটেও নয়। তাছাড়া মাত্র ও ওর মাকে হারিয়েছে। এই অবস্থায় আশা কোরো না এখনি ও তোমার সাথে ছুটোছুটি, লাফালাফি করতে

লেগে যাবে। আজকের দিনটা ওকে নিজের মতো থাকতে দাও, তারপর—'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে,' বললো ক্যাথি। 'ওকে খেলতে বলছি না আমি, একবার শুধু দেখতে চাইছি। এখনো একবারও বাইরে মুখ বের করেনি ও!'

ঘুম ভাঙিয়ে ছেলেটাকে নামানো হলো নিচে।

'লিনটন, এই হচ্ছে তোমার মামাতো বোন ক্যাথি,' বললো মিস্টার লিনটন। 'কান্নাকাটি শুরু ক'রে ওকে ভড়কে দিও না যেন। মুখটা হাসিখুশি ক'রে তোলো, আমরা এসে গেছি।'

'তাহলে বিছানা কই? আমি শোবো,' গোমড়া মুখে বললো লিনটন।

ফটক থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথটুকু আমরা হেঁটে এলাম। ঘরে ঢুকে আমি টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম লিনটনকে। বসেই কাঁদতে শুরু করলো সে।

'কী হয়েছে?' নরম ক'রে জিজ্ঞেস করলো আমার মনিব।

'আমি চেয়ারে বসতে পারি না,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো ছেলেটা।

'তাহলে যাও সোফায় বসো; এলেন চা দিচ্ছে তোমাকে,' বললো ওর মামা।

লিনটন আস্তে আস্তে নামলো চেয়ার থেকে। সোফার কাছে গিয়ে প্রথমে বসলো তারপর শুয়ে পড়লো। ক্যাথি চা নিয়ে এলো। আদর ক'রে ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো চা টুকু খেয়ে নিতে। এবার একটু খুশি হলো ছেলেটা। উঠে চুমুক দিলো চায়ে।

'ঠিক হয়ে যাবে ও,' বললো আমার মনিব। 'ক'দিন থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। ওর বয়েসী আরেক জনের সঙ্গ নতুন প্রাণ দেবে ওর দেহে—অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি আমরা ওকে রাখতে পারি।'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত যদি আমরা ওকে রাখতে পারি,' মনে মনে বললাম। ও এখানে এখবর পাওয়ার পর হীথক্লিফ কী করবে ভেবে শঙ্কিত না হয়ে পারলাম না আমি।

যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে তাড়াতাড়ি সত্যি হলো আমাদের আশঙ্কা।

চায়ের পর লিনটনকে ওপরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছি ওর ঘরে। নিচে নেমে বাতি জ্বালছি মিস্টার এডগারের ঘরে দেয়ার জন্যে। এই সময় রান্নাঘর থেকে কাজের মেয়েটা এসে বললো, মিস্টার হীথক্লিফের ভৃত্য জোসেফ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, মিস্টার এডগারের সাথে কথা বলতে চায়।

শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল আমার শরীর বেয়ে। বুঝতে অসুবিধা হলো না কী জন্যে এসেছে জোসেফ।

'আমার মনে হয় না মনিব এখন ওর সাথে দেখা করতে চাইবেন,' আমি বললাম। 'আমিই দেখি কী চায়।'

জোসেফকে ডেকে নিয়ে এলাম ভেতরে। কী চায় জিজ্ঞেস করলাম।

'মিস্টার লিনটনের সাথে দেখা করতে চাই।'

'মিস্টার লিন্টন এখন দেখা করতে পারবেন না,' বললাম। 'যা বলার আমাকে বলো।'

'না তোমাকে বললে হবে না। মিস্টার লিনটনকেই বলবো। এরকমই নির্দেশ আছে আমার ওপর।'

'বললাম যে, মিস্টার লিনটন এখন দেখা করতে পারবেন না।'

'করতেই হবে,' বললো জোসেফ। 'উনি না চাইলেও আমাকে করতে হবে। ওঁর সাথে দেখা না ক'রে গেলে আমাকে আস্ত রাখবে না হীথক্লিফ। কোনটা ওঁর ঘর, দেখিয়ে দাও, এলেন।'

অগত্যা মনিবকে ডেকে আনলাম আমি।

'হীথক্লিফ তার ছেলেকে নিতে পাঠিয়েছে আমাকে,' বললো জোসেফ। 'বলে দিয়েছে ওকে ছাড়া যেন হাইটসে না ফিরি।'

চোদ্দ

দীর্ঘ নীরবতা ঘরে। এডগার লিনটনের চেহারা করুণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিছু করারও নেই তার। নিজের ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে হীথক্লিফের। তাই বলে অসুস্থ ছেলেটাকে এখন ঘুম থেকে জাগাতে রাজি নয় এডগার। শান্ত কণ্ঠে বললো, 'মিস্টার হীথক্লিফকে গিয়ে বলো, তার ছেলে কাল যাবে ওয়াদারিং হাইটসে। ও খুব ক্লান্ত। ঘুমিয়ে গেছে। আজ আর এতটা পথ যেতে পারবে না কিছুতেই।'

'না,' বললো জোসেফ। 'এ অজুহাত শুনবে না হীথক্লিফ। ও ওর ছেলেকে চায়। আমি ওকে না নিয়ে—'

'যাও!' শান্ত শীতল গলায় আদেশ করলো এডগার। 'তোমার মনিবকে গিয়ে বলো যা বললাম। এলেন, ওকে দরজা দেখিয়ে দাও!'

'ঠিক আছে,' চেঁচালো জোসেফ। 'কাল সকালে ও নিজেই আসবে। পারলে তাকেও দরজা দেখিয়েন!'

এ ধরনের কোনো কিছুর মুখোমুখি যাতে না হতে হয় সেজন্যে জোসেফ চলে যাওয়ার পরই মিস্টার লিনটন আমাকে বললো, 'কাল ভোরেই তুমি ওকে নিয়ে যাবে হাইটসে। ক্যাথির টাট্টুতে ক'রে নিয়ে যেও। ক্যাথিকে জানিও না কোথায় ওকে দিয়ে এসেছো। ও জিজ্ঞেস করলে বোলো, লিনটনের বাবা হঠাৎ ক'রেই ওকে নিতে লোক পাঠিয়েছিলো, তাই ও চলে গেছে।'

ভোর পাঁচটায় লিনটনকে জাগালাম আমি। এখন আবার কোথাও যেতে হবে

শুনে ও অবাক হয়ে গেল। আরো অবাক হলো যখন শুনলো বাবার কাছে থাকতে যাচ্ছে।

'বাবা!' বললো ও, 'মা তো কখনো বলেনি বাবা আছে আমার! কোথায় থাকে বাবা? মা আর বাবা এক সাথে থাকতো না কেন আর সবাই যেমন থাকে?'

এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া উচিত হবে কিনা আমি জানি না তাই নানা কথা বলে যেখানে যাচ্ছে সে জায়গা সম্পর্কে ওকে কৌতূহলী এবং আগ্রহী ক'রে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম।

একটু পরেই আমরা রওনা হলাম।

'ওয়াদারিং হাইটস থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জের মতো সুন্দর?' জিজ্ঞেস করলো লিনটন।

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'তবে এত বড় নয়, আর এত গাছপালাও নেই ওখানে। যা-ই হোক, জায়গাটা তোমার ভালোই লাগবে, আর তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারীও হবে।'

সাড়ে ছ'টার সময় আমরা পৌছুলাম হাইটসে। লিনটনকে বাইরে ঘোড়ায় বসিয়ে রেখে আমি ঢুকলাম ভেতরে।

বাড়ির লোকজন সবে নাশতা শেষ করেছে। জিল্লা টেবিল পরিষ্কার করছে। জোসেফ তার মালিককে একটা খোঁড়া ঘোড়া সম্পর্কে কিছু একটা বোঝাচ্ছে। আর হেয়ারটন তৈরি হচ্ছে মাঠে যাওয়ার জন্যে।

'আহ, নেলি!' আমাকে দেখেই উৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো হীথক্লিফ। 'তুমিই নিয়ে এসেছো? আমি তো ভাবছিলাম আমাকেই যেতে হবে আমার সম্পত্তি বুঝে আনার জন্যে। দেখি, দেখি, কেমন জিনিসটা।'

উঠে দরজার কাছে গেল ও। পেছন পেছন হেয়ারটন আর জোসেফ। তিনজনকে দেখেই ভয় ফুটে উঠলো লিনটনের দৃষ্টিতে।

'নিশ্চয়ই মিস্টার লিনটন আপনার ছেলের বদলে তার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে,' বললো জোসেফ।

তাচ্ছিল্যের সাথে হাসলো হীথক্লিফ।

'ও ঈশ্বর! কী সুন্দর!' বললো সে। 'ওরা কি শুধু দুধ খাইয়ে মানুষ করেছে একে, এলেন? যা আশা করেছিলাম তারচেয়ে দেখি দুরবস্থা এর—শয়তান জানে সামান্যই আশা করেছিলাম আমি।'

ভীত, উৎকণ্ঠিত ছেলেটাকে ঘোড়া থেকে নেমে ঘরের ভেতর ঢুকতে বললাম। ভয়ে ভয়ে আমার কথা মতো কাজ করলো ও। হীথক্লিফকে দেখিয়ে বললাম ওটা তার বাবা। শুনে ওর চেহারা যা হলো, দেখে বুঝলাম কথাটা ও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। দাঁড়িয়ে রইলো আমার গায়ের সাথে সেঁটে।

হীথক্লিফ হ্যাঁচকা এক টানে আমার কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে নিলো ছেলেকে।

'আমাকে চেনো?' জিজ্ঞেস করলো সে।
'না,' ভয়ার্ত স্বরে জবাব দিলো লিনটন।
'না! কী আশ্চর্য! তোমার মা আমার কথা কোনোদিন বলেনি তোমাকে? খুবই খারাপ কথা, বাপ সম্পর্কে কিছুই জানায়নি ছেলেকে! আরে, এত লাল হচ্ছো কেন? কাঁদছো! কান্নার কী আছে? আমরা তোমাকে মারতে যাচ্ছি না।'
'মিস্টার হীথক্লিফ, ছেলেটার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কোরো, নাহলে বেশিদিন ওকে রাখতে পারবে না নিজের কাছে। একটা কথা মনে রেখো, ও তোমার একমাত্র আত্মীয় এ পৃথিবীতে।'
'ভয় পেও না, এলেন, আমি খুবই ভালো ব্যবহার করবো ওর সাথে,' হেসে জবাব দিলো সে। 'এখনই তার প্রমাণ দিচ্ছি দেখ। জোসেফ, কিছু খেতে দাও তো আমার ছেলেকে। এই, হেয়ারটন, উজবুকের বাচ্চা, কাজে যাচ্ছিস না কেন তুই?'
হেয়ারটন বেরিয়ে গেল। জোসেফ গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে।
'বুঝলে, নেলি,' বলে চললো হীথক্লিফ, 'ছেলেকে নিয়ে অনেক আশা, অনেক পরিকল্পনা আমার। গ্র্যাঞ্জের পরবর্তী মালিক হবে ও। আমার এই আশা পূরণ হওয়ার আগে ওকে মরতে দিতে পারি না আমি। এর মধ্যেই একজন শিক্ষক ঠিক ক'রে ফেলেছি। সপ্তায় তিন দিন এসে পড়াবে। আর হেয়ারটনকেও বলে দিয়েছি, সব সময় যেন মেনে চলে ওকে।'
জোসেফ এক বাটি পরিজ নিয়ে এসে রাখলো লিনটনের সামনে। পরিজ দেখেই নাক কুঁচকে উঠলো ছেলেটার।
'আমি খাই না এ জিনিস,' বললো সে।
জোসেফ কটমটিয়ে তাকালো ওর দিকে। 'খাই না!' সবিস্ময়ে বলে ঝাঁই ক'রে বাটিটা তুলে নিয়ে ধরলো হীথক্লিফের নাকের নিচে। প্রশ্ন করলো, 'কেন? কী দোষ হয়েছে এতে?'
'আমি তো কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না,' পরিজটা একটু শুঁকে বললো হীথক্লিফ। 'যাক গে, পরিজ যখন পছন্দ নয় অন্য কিছু এনে দাও। কী খায় ও সাধারণত, এলেন?'
'গরম দুধ বা চা,' আমি বললাম।
জিল্লাকে ডেকে নির্দেশ দিলো হীথক্লিফ চা বা দুধের ব্যবস্থা করতে। এই সময় লিনটন একবার অন্য দিকে তাকাতেই আমি বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। দরজা যখন বন্ধ করছি শুনতে পেলাম ওর চিৎকার:
'যেও না। যেও না আমাকে রেখে! আমি এখানে থাকতে পারবো না!'
ক্যাথির টাট্টুর পিঠে চেপে গ্র্যাঞ্জের পথে রওনা হলাম আমি।
বাড়ি ফিরেই পড়ে গেলাম ক্যাথির সামনে। ঘুম থেকে উঠে খুশিতে টগবগ করতে করতে নিচে নেমে এসেছিলো ও। এসেই শোনে ফুপাতো ভাই চলে গেছে। তখন থেকেই কাঁদছে। সারাদিন কী কষ্টটা যে গেল আমাদের বুঝিয়ে

শুনিয়ে ওকে শান্ত করতে তা আর বলবার নয়।

দিন গড়িয়ে চললো। গিমারটনে গেলে মাঝে মাঝে দেখা হয় জিল্লার সাথে। প্রতিবারই আমি জানতে চাই লিনটন কেমন আছে, প্রতিবারই জবাব পাই ভালো না। কাশি বা ঠাণ্ডা বা কোনো না কোনো ধরনের ব্যথা বেদনা লেগেই আছে ওর। মিস্টার হীথক্লিফ সামান্যই পছন্দ করে ওকে, যদিও এটা গোপন রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে।

দিন গড়িয়ে চললো গ্র্যাঞ্জেও। অবশেষে ষোল বছর পূর্ণ হলো ক্যাথির।

দিনটা আমরা কখনোই পালন করি না। কারণ এটা ক্যাথির জন্মদিন যেমন তেমনি ওর মায়ের মৃত্যুদিনও। ওর বাবা দিনটা একা একা লাইব্রেরীতে কাটায়, বিকেলে একাই হাঁটতে হাঁটতে যায় গিমারটনের গোরস্থানে।

ওর ষোল বছরের জন্মদিনটা পড়লো চমৎকার এক রোদ ঝলমলে দিনে। বাইরে যাওয়ার কাপড় পরে নিচে নেমে এলো ক্যাথি। বললো, বাবাকে ও জিজ্ঞেস করেছিলো আমার সাথে মুর-এ বেড়াতে যেতে পারবে কিনা। মিস্টার লিনটন অনুমতি দিয়েছে, তবে এই শর্তে যে এক ঘণ্টার বেশি বাইরে থাকবো না, আর বেশি দূরে যাবো না আমরা।

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওকে নিয়ে। দুনিয়ার কোনো দুশ্চিন্তা নেই মাথায়। ক্যাথি চঞ্চল হরিণীর মতো ছুটে চললো আমার আগে আগে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেলাম আমরা। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলাম আমি। ভাবলাম, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ফিরতে হয়। ক্যাথি অনেকটা এগিয়ে গেছে আমাকে ছেড়ে। চিৎকার ক'রে ডাকলাম ওকে। কিন্তু আমার ডাক শুনতে পেলো না বলেই হোক বা থামতে চাইলো না বলেই হোক ও থামলো না, ছুটেই চললো। অগত্যা আমাকেও এগোতে হলো পেছন পেছন। তারপর হঠাৎ এক ঢালের ওপাশে হারিয়ে গেল ক্যাথি। এগোতে এগোতে আবার যখন ওকে দেখতে পেলাম তখন ওয়াদারিং হাইটসের কাছাকাছি পৌছে গেছে ও এবং কথা বলছে দু'জন মানুষের সাথে। দু'জনের একজন হীথক্লিফ।

আমি পড়ি মরি ক'রে ছুটলাম। ওদের কাছে যখন পৌছুলাম তখন ক্যাথি হীথক্লিফকে জিজ্ঞেস করছে, 'কে আপনি? আপনার সাথের ওকে আগে দেখেছি আমি। আপনার ছেলে?'

'মিস ক্যাথি,' আমি বললাম, 'এক ঘন্টার জায়গায় তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। এবার ফিরতে হবে না, হলে তোমার বাবা—'

'না, এ আমার ছেলে নয়,' আমাকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো হীথক্লিফ। 'তবে আমার একটা ছেলে আছে। তাকে তুমি দেখেছোও আগে। আমার মনে হয় অনেক দূর হেঁটে ক্লান্ত তোমরা। এসো না, আমার বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাবে—বেশি দূরে নয় আমার বাড়ি।'

আমি তাড়াতাড়ি ক্যাথির কাছে গিয়ে কানে কানে বললাম, 'ওর কথা শুনো না, মিস। এক্ষুণি আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে।'

'কেন?' সশব্দে প্রশ্ন করলো ক্যাথি। 'উনি ঠিকই বলেছেন, এতক্ষণ দৌড়ে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখানকার মাটি কেমন ভেজা দেখ, এখানে বসা যাবে না। ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিলে ক্ষতি কী? তা ছাড়া উনি বলছেন ওঁর ছেলেকে আগে দেখেছি আমি। কে ও দেখে আসি। আমার মনে হয় সেবার সেই যে খামার বাড়িটায় আমি গিয়েছিলাম একা একা, তুমি এসে আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে, সেই বাড়িতে থাকেন উনি।'

'হ্যাঁ, ওটাই আমার বাড়ি,' বললো হীথক্লিফ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, 'চুপ ক'রে থাকো, এলেন ডীন, মেয়েটার বিশ্রাম দরকার। হেয়ারটন, তুই ওর সাথে যা। এলেন, তুমি আমার সাথে চলো।'

ক্যাথি ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে। হীথক্লিফের নির্দেশ পেয়ে হেয়ারটনও ছুটলো পেছন পেছন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওরা হারিয়ে গেল একটা টিলার ওপাশে।

'খুবই খারাপ কাজ করলে তুমি, মিস্টার হীথক্লিফ,' আমি বললাম। 'ওখানে ও লিনটনকে দেখবে এবং বাড়ি ফিরে সব বলবে বাপকে। মিস্টার লিনটন তখন এসবের জন্যে আমাকেই দায়ী করবেন।'

'আমি চাই ও লিনটনকে দেখুক,' বললো হীথক্লিফ। 'তুমি চিন্তা কোরো না, ওকে বলে দেবো বাপকে যেন না বলে এখানে এসেছিলো। তুমি এত ঘাবড়াচ্ছো কেন? আমার উদ্দেশ্য মোটেই খারাপ নয়, বরং বলতে পারো মহৎ। আমার ইচ্ছা ওরা দুই ফুপাতো মামাতো ভাই বোন প্রেমে পড়ুক এবং বিয়ে করুক। তোমার মনিবের প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করছি না আমি? ও মারা গেলে ওর এই মেয়েটার কী দশা হবে ভাবো। বিষয় সম্পত্তি কিছু পাবে না। তার চেয়ে আমার লিনটনকে বিয়ে ক'রে আমার সব সম্পত্তির যৌথ উত্তরাধিকারী হতে পারে লিনটনের সঙ্গে।'

'কেন ও বিষয় সম্পত্তি পাবে না? মিস্টার লিনটন মারা গেলে ক্যাথরিনই সব সম্পত্তির মালিক হবে।'

'না,' বললো হীথক্লিফ, 'আইন এ ব্যাপারে অন্য কথা বলে। এডগার মারা গেলে ওর সম্পত্তি পাবে ওর বোনের স্বামী মানে আমি। যাকগে, কী হবে না হবে সে তর্কে কাজ নেই, আমি চাই আমার ছেলের সাথে ওর মেয়ের বিয়ে হোক। এটা যাতে হয় তা আমি দেখবো।'

'আর আমি দেখবো আর কখনো যেন ক্যাথি তোমার বাড়ির ত্রিসীমানায় না আসতে পারে।'

'ঠিক আছে দেখো, এখন চুপ করো!'

ক্যাথি আর হেয়ারটন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললো হীথক্লিফ। ঘরে ঢুকে দেখলাম লিনটন দাঁড়িয়ে আছে

আগুনের সামনে। এখনো ষোল হয়নি ওর বয়েস এরই মধ্যে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে, যদিও চওড়া হয়নি সেই অনুপাতে।

'কে এটা বলো তো?' ওকে দেখিয়ে ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করলো হীথক্লিফ।

'আপনার ছেলে?' সন্দেহের সুরে পাল্টা প্রশ্ন করলো ক্যাথি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু এই প্রথম তুমি দেখছো ওকে? ভেবে দেখ তো আগে কখনো দেখেছো কিনা?'

'তাই তো! এ দেখছি লিনটন!' খুশিতে চিৎকার করে উঠলো ক্যাথি। 'সত্যিই লিনটন! আমার চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে!'

লিনটন এগিয়ে এলো। ওর গালে চুমু খেলো ক্যাথি। হীথক্লিফ দেখছে ওকে। অদ্ভুত রহস্যময় এক হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে।

'মানে—মানে আপনি আমার ফুপা?' ওর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো ক্যাথি। 'আপনাকে বেশ ভালো লেগেছে আমার, অবশ্য প্রথম দিকে লাগেনি রাগ রাগ ভাব দেখিয়েছিলেন বলে। লিনটনকে নিয়ে আসেন না কেন আমাদের বাড়িতে?'

'সত্যি কথাটা তাহলে বলি তোমাকে,' শান্তকণ্ঠে বললো হীথক্লিফ। 'তোমার বাবা আমাকে পছন্দ করে না। অনেক দিন আগে—তোমার জন্মেরও আগে ওর সাথে ভীষণ এক ঝগড়া হয়েছিলো আমার। সেই থেকে ওবাড়িতে আর যাই না আমি। তার আগে যেতাম মাঝে মাঝে। আজ যে তুমি এসেছো একথা যদি বলো তোমার বাবাকে তাহলে আর কখনো তোমাকে আসতে দেবে না এখানে।'

ক্যাথির মুখটা ঝুলে পড়লো। 'কেন আপনারা ঝগড়া করেছিলেন?'

'তোমার বাবা ভাবতো আমি তার বোনকে বিয়ে করার যোগ্য নই। যখন আমরা বিয়েটা ক'রে ফেললাম ভয়ানক আঘাত লাগলো ওর অহঙ্কারে। এজন্যে ও কোনো দিনই ক্ষমা করবে না আমাকে।'

'কোনো মানে হয় এসবের!' বললো ক্যাথি। 'এক দিন আমি বাবাকে বলবো একথা। যাহোক, ঝগড়া আমার বাবার সাথে আপনার, আমার সাথে লিনটনের নয়। বাবা যদি একান্তই আমাকে আসতে না দেয় লিনটন যাবে আমাদের বাড়িতে।'

'আমি পারবো না অতদূর যেতে,' বললো লিনটন। 'চার মাইল হেঁটে যাওয়া আসা—মরেই যাবো আমি। না, মিস ক্যাথরিন, তুমিই এসো। রোজ না পারো মাঝে মাঝে এসো, সপ্তায় এক বা দু'দিন।'

বিরক্ত হয়ে ছেলের দিকে তাকালো হীথক্লিফ।

'আমার সব স্বপ্ন, সব পরিশ্রম বানচাল ক'রে দেবে ছোকরা,' আমার উদ্দেশ্যে ফিস ফিস করলো সে। 'মেয়েটা এক্ষুণি টের পেয়ে যাবে ওর দাম কতটুকু। দেখ, মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছেও না! হেয়ারটনটা যে কেন আমার ছেলে হলো না! লিনটন!'

'জি, বাবা?'

'মামাতো বোনকে কিছু দেখানোর নেই তোমার? একটা খরগোশও না, পাখির বাসাও না?'

'জি—'

'তাহলে যাচ্ছো না কেন? যাও ওকে বাগানে নিয়ে যাও, একটু বেড়িয়ে এসো। আস্তাবলে গিয়ে তোমার ঘোড়াটাও দেখিও ওকে।'

'তার চেয়ে এখানে বসে গল্প করা ভালো না?' ক্যাথির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো লিনটন।

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' বললো বটে ক্যাথি, তবে এমন ভাবে তাকালো দরজার দিকে যে বুঝতে কারোই অসুবিধা হলো না, ও বসে থাকার চেয়ে বাইরে যেতেই বেশি আগ্রহী।

কিন্তু লিনটন বুঝতেই পারলো না ওর আগ্রহটা। চেয়ারে বসে আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। হীথক্লিফ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে হেয়ারটনকে ডেকে নিয়ে এলো বাইরে থেকে। ক্যাথি এবার হীথক্লিফের কানে কানে কিছু বললো। হেসে উঠলো হীথক্লিফ। অমনি রাগে মুখ লাল হয়ে উঠলো হেয়ারটনের। ওকে নিয়ে কেউ হাসাহাসি করবে এটা অসহ্য ওর পক্ষে। কিন্তু হীথক্লিফের পরবর্তী কথা শুনে ওর ভ্রূকুটি দূর হয়ে গেল।

'আমাদের সবার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিস তুই, হেয়ারটন,' বললো হীথক্লিফ। 'মিস ক্যাথরিন সুন্দর একটা কথা বলেছে তোর সম্পর্কে। যা, ওকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন বাড়ির চারপাশটা। কিন্তু সাবধান, ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করবি। কোনো খারাপ কথা যেন না বেরোয় মুখ দিয়ে। হাতগুলো বের কর পকেট থেকে। দেখিস, ওর যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয়।'

বেরিয়ে গেল দু'জন।

'একটা কথাও বলবে না ছোঁড়া, দেখো,' আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো হীথক্লিফ। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে, 'যাও, আলসে ছেলে, ওদের সাথে গিয়ে ঘুরে এসো।'

অগত্যা উঠতে হলো লিনটনকে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

'হেয়ারটন ছেলেটা দারুণ আনন্দ দেয় আমাকে,' বলে চললো হীথক্লিফ। 'আমার আশা পুরোপুরি মিটিয়েছে ও। ও যদি নির্বোধ হতো তাহলে বোধ হয় এত আনন্দ আমি পেতাম না। ও কেমন মনোকষ্টে ভোগে আমি বুঝতে পারি, এবং বুঝতে পেরেই আরো বেশি আনন্দ পাই। ওর বাপ আমাকে যে ফাঁদে আটকেছিলো সেই একই ফাঁদে ওকে আটকেছি আমি। পার্থক্যটা হচ্ছে আমি ফাঁদ থেকে যে ভাবেই হোক বেরোতে পেরেছিলাম, ও পারবে না। তোমার কী মনে হয় হিণ্ডলে বেঁচে থাকলে ছেলেকে দেখে ওর বুক এখন গর্বে দশ হাত হয়ে উঠতো না, যেমন আমার বুক হয়ে ওঠে আমার ছেলেকে দেখে? হা-হা-হা। কিন্তু একটা পার্থক্য আছে। আমার ছেলের গুণ বলতে কিছু নেই, তবু ও অনেক দূর যাবে।

হিণ্ডলের ছেলের অনেক গুণ ছিলো, কিন্তু সেগুলো সব লুপ্ত হয়ে গেছে। ও এখন একটা নিরেট মূর্খ। আমিই বানিয়েছি ওকে এমন। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, হেয়ারটন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে আমাকে! হা-হা-হা!'

দুপুরের পর পর্যন্ত থাকলাম আমরা ওখানে। তার আগে শত চেষ্টায়ও আসতে রাজি করাতে পারলাম না ক্যাথিকে। বাড়ি ফেরার পথে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আসলে কেমন খারাপ মানুষ মিস্টার হীথক্লিফ। কিন্তু ক্যাথি বিশ্বাস করলো না আমার কথা।

'সব ব্যাপারে তুমি বাবার পক্ষ নাও, এলেন,' বললো সে। 'যত যা-ই হোক, উনি আমার ফুপা। বাবাকে আমি বকবো, কেন ঝগড়া করেছে ওঁর সাথে!'

দুরু দুরু বুকে বাড়ি ঢুকলাম আমি। এবং পরম স্বস্তির সঙ্গে শুনলাম, তখনো লাইব্রেরী থেকে বের হয়নি মনিব। তারমানে জানতে পারেনি আমাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কথা।

সেদিন আর ক্যাথি বাবাকে বললো না যে ওয়াদারিং হাইটসে গিয়েছিলো। —আসলে বলতে পারলো না, কারণ রাতে শোয়ার আগে একবারের জন্যেও সে দেখা পেলো না বাবার। বললো সকালে নাশতার সময়।

'বাবা,' শুরু করলো ও, 'কখনো বলোনি কেন লিনটন এত কাছে থাকে আমাদের? তুমি মিস্টার হীথক্লিফকে পছন্দ করো না তাই বলোনি?'

হঠাৎ ক'রে মেয়ের মুখে একথা শুনে খুবই বিচলিত হলো এডগার। তবে রাগলো না সে। শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, 'হীথক্লিফই আমাকে পছন্দ করে না। এ প্রশ্ন কেন, মা?'

এবার ক্যাথি বাপকে শোনালো গতকালের কথা। কোনো লুকোচুরি না ক'রে সব বললো। শুনে এডগার বললো, 'আর কখনো তুমি ওখানে যাবে না, মা। হীথক্লিফের মতো বদলোক হয় না পৃথিবীতে। যাকে ঘৃণা করে তার ক্ষতি করার জন্যে যে-কোনো কিছু করতে পারে ও।'

সবজান্তা ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো ক্যাথি। কিন্তু আমি ওর চোখ দেখে স্পষ্ট বুঝলাম বাপের কথা একটুও বিশ্বাস করেনি ও।

'কাল কিন্তু খুব ভালো ব্যবহার করেছেন আমাদের সাথে,' বললো ক্যাথি। 'বললেন যখন খুশি আমি যেতে পারি তাঁর বাড়িতে। উনি চাইছেন আমি আর লিনটন বন্ধু হই—কিন্তু তুমি চাইছো না।'

এডগার বুঝলো মেয়ের মাথা থেকে ওয়াদারিং হাইটস, হীথক্লিফ, লিনটনের ভূত নামানো সহজ কাজ হবে না। তখন সে সংক্ষেপে বললো হীথক্লিফ ইসাবেলার সাথে কেমন ব্যবহার করেছে এবং কী ক'রে ওয়াদারিং হাইটস তার সম্পত্তি হয়েছে।

এবার মনে হলো ক্যাথি বুঝলো। কোনো কথা বলতে পারলো না সে।

'এখন বুঝতে পারছো তো, মা, কেন আমি চাই না তুমি হীথক্লিফের বাড়িতে যাও!' প্রশ্ন করলো এডগার। 'ওদের কথা আর ভেবো না, কেমন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো ক্যাথি। বাবাকে চুমু খেয়ে উঠে গেল।

দিনটা কাটলো ভালোই। সন্ধ্যায় ওর ঘরে গিয়ে দেখি বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে ও।

'কী হয়েছে?' উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বেচারি লিনটন!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো ক্যাথি। 'দু'জন মানুষ ষোল বছরেরও বেশি আগে কী না কী নিয়ে ঝগড়া করেছে আর সেজন্যে ও কাল দেখতে পাবে না আমাকে! কত আশা ক'রে বসে থাকবে—'

'যতসব আজগুবী কথা,' বিরক্ত কণ্ঠে আমি বললাম। 'তুমি কি মনে করছো তুমি ওকে নিয়ে যতটা ভাবছো ও-ও তোমাকে নিয়ে ততটা ভাবছে? মোটেই তা নয় বুঝলে। জেনে রেখো, তুমি চলে আসার পর ও একবারও ভাবেনি তোমার কথা। ছি! জীবনে দুই বারের বেশি দেখা হয়নি যার সাথে তার কথা ভেবে কেউ কাঁদে? তুমি যাওনি দেখেই লিনটন বুঝতে পারবে কী হয়েছে, এবং আর মাথা ঘামাবে না তোমাকে নিয়ে।'

'কিন্তু একটা চিঠি পাঠাতে পারি না আমি?—ছোট্ট একটা চিঠি কেন আসতে পারছি না লিখে?'

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে আমি বললাম।

'কি হবে লিখলে?—ছোট্ট একটা চিঠি—'

'না! চুপ ক'রে শুয়ে পড়ো। এ নিয়ে আর একটা কথাও আমি শুনতে চাই না।'

তীব্র বিদ্বেষের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো ক্যাথি। আমি ওর সে দৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে বেরিয়ে এলাম ওকে চুমু না খেয়ে, গুড-নাইট না জানিয়ে।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আস্তে আস্তে ক্যাথির মেজাজ আবার আগের মতো হয়ে উঠলো, আমার সাথে সম্পর্কও স্বাভাবিক হয়ে এলো। তবে খেয়াল করলাম, আজকাল যেন ও একা একা ঘরের কোণে কাটাতেই বেশি পছন্দ করে। আর, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে নিচে নেমে আসে, রান্নাঘরের আশপাশে ঘুরঘুর করে, যেন অপেক্ষা করছে কিছুর জন্যে। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। লাইব্রেরীতে একটা আলমারির দেরাজ ও দখল করেছে। প্রতিদিন বেশ কিছুটা সময় ঐ দেরাজের জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কাটায়। লাইব্রেরী থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন দেরাজটায় তালা মেরে চাবি নিয়ে আসে সঙ্গে ক'রে।

একদিন আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখলাম ভাঁজ করা একটা কাগজ রাখছে ও দেরাজে। দেখেই সন্দেহ হলো আমার। সে রাতেই ও আর ওর বাবা ওপরে যার যার ঘরে শুয়ে পড়ার পর বাড়ির সব চাবি নিয়ে আমি ঢুকলাম লাইব্রেরীতে। একটা একটা ক'রে চাবি লাগিয়ে দেখতে লাগলাম দেরাজের তালায়।

অবশেষে লেগে গেল একটা। তালা খুলে গেল দেরাজের। ঝটপট ওটার ভেতর যা যা ছিলো সব অ্যাপ্রনে ঢেলে দেরাজে আবার তালা লাগিয়ে গিয়ে ঢুকলাম নিজের ঘরে। বিছানার ওপর ঢেলে দিলাম অ্যাপ্রনের জিনিসগুলো।

জিনিস বলতে এক গাদা ভাঁজ করা কাগজ। খুলে পড়তে লাগলাম একটা একটা ক'রে। লিনটন হীথক্লিফের লেখা প্রেমপত্র সব। ক্যাথির চিঠির জবাবে লেখা। তারিখ মিলিয়ে দেখলাম, ক্যাথি আর আমি যেদিন ওয়াদারিং হাইটস থেকে ঘুরে এসেছি তার দু'দিন পর থেকে প্রায় প্রতিদিন লেখা হয়েছে একটা ক'রে। প্রথম দিকেরগুলো ছোট—পড়লেই বোঝা যায় ইতস্তত করতে করতে লেখা। আস্তে আস্তে দীর্ঘ হয়েছে চিঠি, ভাষা হয়ে উঠেছে আবেগময়। একটা রুমালে সবগুলো চিঠি বেঁধে রেখে দিলাম আমি।

পরদিন যথারীতি খুব ভোরে নিচে নেমে এলো ক্যাথি। ঘুর ঘুর করতে লাগলো রান্নাঘরে। ওকে কিছু টের পেতে না দিয়ে আমি চোখ রাখলাম ওর দিকে। কিছুক্ষণ পর দুধঅলার ছেলেটা আসতেই বাইরে চলে গেল ক্যাথি। আমি দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম দুধঅলার ছেলেটা দ্রুত পকেট থেকে কিছু একটা বের ক'রে ক্যাথির হাতে দিলো, আরো দ্রুত ক্যাথির হাত থেকে কিছু একটা নিয়ে পকেটে ভরলো।

অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বাগানের কোণে। দুধঅলার ছেলেটা আসতেই ভয় দেখিয়ে নিয়ে নিলাম ক্যাথির চিঠি।

দুপুরে লাঞ্চের সামান্য আগে ক্যাথি ঢুকলো লাইব্রেরীতে। আমিও কিছু একটা কাজের ছুতোয় ঢুকলাম পেছন পেছন। দেরাজটার সামনে গিয়ে বসলো ক্যাথি। তালা খুললো। তারপরেই ভয়ার্ত এক চিৎকার।

'কী হয়েছে, মা?' বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো এডগার লিনটন। 'ব্যথা পেলে কিছুতে?'

'না, বাবা,' ঢোক গিলে জবাব দিলো ক্যাথি। 'এলেন, ওপরে এসো—আমার শরীরটা বেশি ভালো লাগছে না।'

ক্যাথির সাথে গেলাম ওর ঘরে।

'এলেন!' রুদ্ধশ্বাসে ক্যাথি বললো, 'তুমি নিয়েছো ওগুলো—আমি জানি তুমিই নিয়েছো! ফিরিয়ে দাও, এলেন; আমি আর কক্ষনো করবো না এ কাজ।'

'লজ্জা হওয়া উচিত তোমার, মিস,' আমি বললাম। 'কী সব ছাইপাঁশ লিখেছে ছেলেটা! তুমিই ওকে সাহস যুগিয়েছো লিখতে—'

'না, এলেন!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো ক্যাথি, 'আমি চাইনি লিখতে! আমি ওকে ভালোবাসার কথা ভাবিওনি যেদিন—'

'ভালোবাসা! সারাজীবনে দুইবার চার ঘণ্টার বেশি তুমি দেখনি ছেলেটাকে, আর বলছো তুমি তাকে ভালোবাসো! দেখি তোমার বাবাকে বলে, কিভাবে নেন তিনি এমন ভালোবাসাকে।'

'না, এলেন!' প্রায় আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠলো ক্যাথি। 'বাবাকে বোলো না। বোলো না! তারচেয়ে ওগুলো পুড়িয়ে ফেল, এলেন!'

আমিও তাই চাই। বললাম, 'পুড়িয়ে ফেললে তুমি কথা দেবে আর কক্ষনো লিখবে না লিনটনকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওগুলো তুমি পুড়িয়ে ফেল! এক্ষুণি পুড়িয়ে ফেল, এলেন।'

আমার ঘর থেকে নিয়ে এলাম চিঠিগুলো। একটা একটা ক'রে ছুঁড়ে দিতে লাগলাম ফায়ারপ্লেসে।

'একটা আমাকে রাখতে দাও, এলেন,' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ক্যাথি।

'তাহলে সেই একটা আমি দেখাবো তোমার বাবাকে,' গম্ভীর কণ্ঠে আমি বললাম।

'না, এলেন, না!'

'তাহলে সবগুলো পোড়াতে হবে।'

আর কিছু বললো না ক্যাথি। সবগুলো চিঠি ছাই হয়ে যাওয়ার পর আমি ওকে একা রেখে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

দুপুরে খেতে নামলো না ক্যাথি। তবে চায়ের সময় নামলো। মুখ ফ্যাকাসে, চোখ লাল।

পরদিন সকালে দুধঅলার ছেলেটা এলে তার কাছ থেকে লিনটনের শেষ চিঠিটা নিয়ে তারই উল্টো পিঠে জবাব লিখে দিলাম আমি:

'মাস্টার লিনটন হীথক্লিফের কাছে অনুরোধ, আর কোনো চিঠি লিখবেন না মিস লিনটনের কাছে। কারণ, আপনার চিঠি আর ও গ্রহণ করবে না।'

এর পর থেকে দুধঅলার ছেলেটা আসতে লাগলো শূন্য পকেটে।

পনেরো

গ্রীষ্ম শেষ প্রায়। এক বিকেলে ক্যাথির সাথে বাইরে হাঁটছি আমি। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাস একটু ভেজা ভেজা, তবে পরিষ্কার একেবারে। হাঁটতে বেশ ভালো লাগছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম ক্যাথির চোখে পানি। কারণটা বুঝতে পারলাম। কিছুদিন ধরে অসুখ ওর বাবার। ঠাণ্ডা লেগে একসাথে সর্দি, কাশি, জ্বর। ডাক্তার কেনেথ দেখছেন। কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না। ফলে বাইরে বেরোনো একদম বারন এডগারের।

'ছি, মিস ক্যাথি,' আমি বললাম, 'সামান্য একটু ঠাণ্ডা লেগেছে তোমার বাবার, সেজন্যে কাঁদতে হয়? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও, আরো খারাপ কিছু হয়নি।'

'আরো খারাপ কিছু যে না জোর ক'রে বলছো কী ক'রে?' কান্না থামানোর কোনোরকম চেষ্টা না ক'রে বললো ক্যাথি। 'খারাপ কিছু যদি না-ই হবে ভালো

হচ্ছে না কেন, বাবা? কত দিন হয়ে গেল এই অসুখ! তুমি আর বাবা চলে গেলে আমি কী করবো?'

'শোনো, মিস, কেউ বলতে পারে না কে কখন যাবে। তুমি আমাদের সবার ছোট, তুমি যে সবার আগে চলে যাবে না কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে? পারে না। সেজন্যে এসব নিয়ে ভাবা মোটেই উচিত নয়। আমরা শুধু আশা করবো আমরা সবাই আরো অনেক অনেক বছর বাঁচবো। তোমার বাবা এখনো প্রায় যুবক। আমিও শক্ত সমর্থই আছি—বয়েস হয়েছে মোটে পঁয়তাল্লিশ। আমার মা আশি বছর বেঁচেছিলো, জানো?'

'কিন্তু ইসাবেলা ফুপু তো বাবার চেয়ে ছোট। বাবার আগে চলে গেলেন না উনি?'

'ইসাবেলা ফুপুর পাশে তো তুমি আর আমি ছিলাম না সেবা করার জন্যে,' আমি বললাম। 'তোমার যেটা করতে হবে, বাবাকে দেখে শুনে রাখবে। সব সময় যেন তিনি হাসি খুশি থাকেন এটা দেখবে। ওঁকে হাসিখুশি রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে তোমার নিজের হাসিখুশি থাকা। কোনো ভাবেই তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলবে না কখনো, বুঝেছো?'

মাথা ঝাঁকালো ক্যাথি। 'কক্ষনো বাবার মনে কষ্ট দেবো না আমি, এলেন। আমার নিজের চেয়েও আমি বাবাকে বেশি ভালোবাসি।'

কথা বলতে বলতে আমরা পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট একটা দরজার কাছে এসেছি। দরজার ওপাশে রাস্তা। ক্যাথির মনটা একটু ভালো হয়েছে মনে হলো। এখানে এসেই ও পাঁচিলে চড়ে বসলো, ওপাশে পথের কিনারের বুনো গোলাপ গাছ থেকে ফুল তুলবে। কিন্তু যেই ঝুঁকে হাত বাড়িয়েছে অমনি ওর হ্যাটটা খুলে পড়ে গেল মাথা থেকে। ছোট দরজাটা ছিলো তালা মারা, ফলে হ্যাট তোলার জন্যে নেমে পড়লো ও পাঁচিলের ওপাশে। কিন্তু উঠতে আর পারলো না। কারণ পাঁচিলের বাইরের দিকটা মসৃণ, কাছাকাছি কোনো শক্ত গাছও নেই যা বেয়ে ও উঠতে পারে।

'এলেন, বাড়ি গিয়ে চাবি নিয়ে এসো,' চিৎকার ক'রে বললো ক্যাথি, 'নইলে বড় ফটক পর্যন্ত পুরো পথ আমাকে দৌড়াতে হবে।'

আমি রওনা হতে যাচ্ছি, এই সময় রাস্তায় শুনতে পেলাম ঘোড়ার খুরের শব্দ। এগিয়ে আসছে এদিকে। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম:

'কে, মিস ক্যাথি?'

ক্যাথি জবাব দেয়ার আগেই শুনতে পেলাম ভারি গম্ভীর একটা গলা:

'আহ, মিস লিনটন, ভালোই হলো—তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল। না, না, পালিও না। একটা প্রশ্ন করার আছে আমার তোমাকে। প্রশ্নটার জবাব চাই আমি।'

'আপনার সাথে কথা বলবো না আমি, মিস্টার হীথক্লিফ,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো

ক্যাথি। 'বাবা বলেছে আপনি খারাপ লোক, এলেনও তা-ই বলে।'

'মিথ্যে কথা বলে ওরা,' বললো হীথক্লিফ। 'দু'তিন মাস আগে তুমি নিয়মিত চিঠি লিখতে আমার ছেলে লিনটনকে—প্রেমের চিঠি। আমার মনে হয় সত্যিকারের প্রেম নয়, প্রেমের খেলা খেলছিলে তুমি। কিছু দিন খেলার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, তাই না? কিন্তু তোমার এই খেলার পরিণামে আমার ছেলেটা যে মরতে বসেছে, তা জানো? তোমার চিঠি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ও অসুস্থ। দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখন তুমি যদি কিছু না করো আমার মনে হয় পরের গ্রীষ্ম আসার আগেই ও মারা যাবে।'

'বাচ্চা মেয়েটার কাছে এসব মিথ্যে কথা বলছো কী ক'রে তুমি?' দেয়ালের এপাশ থেকে আমি চিৎকার করলাম। 'ছেড়ে দাও ওকে, মিস্টার হীথক্লিফ। যেখানে যাচ্ছিলে যাও তুমি। ক্যাথি, ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না!'

'এখানে আর কেউ আছে বুঝতে পারিনি তো,' বললো হীথক্লিফ। 'নেলি, আমি তোমাকে পছন্দ করি, কিন্তু এখন আমাদের কথায় নাক না গলালেই আমি খুশি হবো। ক্যাথরিন, মা, সামনের পুরো সপ্তাহটা আমি বাড়িতে থাকবো না। এর ভেতর তুমি নিজে ওয়াদারিং হাইটসে গিয়ে একদিন দেখে এসো না কেন আমি সত্যি বলছি কিনা। বিশ্বাস করো ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, এখন একমাত্র তুমিই পারো ওকে বাঁচাতে! দিন রাত ও তোমার স্বপ্ন দেখছে। আর ভাবছে তুমি ওকে ঘৃণা করো, নইলে চিঠি লেখা বন্ধ করলে কেন?'

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। একটা বড় পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ঘা মেরে ভেঙে ফেললাম দরজার তালা। চলে গেলাম পাঁচিলের অন্য পাশে, রাস্তায়।

'নেলি,' আমাকে দেখেই বলে উঠলো হীথক্লিফ, 'ওকে যেতে দিতে না চাও দিও না; কিন্তু তুমি অন্তত গিয়ে দেখে এসো একবার—'

'চলে এসো,' ক্যাথির হাত ধরে টানলাম আমি। কিন্তু ও আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলো ওর হাত।

'মিস ক্যাথরিন,' বলে চললো হীথক্লিফ, 'আমার ধৈর্য খুব কম। হেয়ারটন আর জোসেফের আরো কম। তাহলে বোঝো কী পরিবেশে আছে অসুস্থ ছেলেটা। ওর একটু আদর দরকার, মিস ক্যাথরিন; তোমার আদর ক'রে বলা একটা কথা ওর জন্যে সবচেয়ে ভালো ওষুধ হতে পারে।'

আমি আর দেরি করলাম না, ক্যাথিকে ধরে টেনে নিয়ে ঢুকে পড়লাম পাঁচিলের ভেতর। দরজা বন্ধ ক'রে দ্রুত হেঁটে চললাম বাড়ির দিকে। ক্যাথির মুখটা গম্ভীর। স্পষ্টতই হীথক্লিফের কথায় বিচলিত ও।

বাড়ি ফিরে দেখলাম মিস্টার লিনটন ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্যাথি আর আমি একা একা চা খেলাম। পুরোটা সময় ক্যাথি বিষণ্ন মুখে চুপ ক'রে রইলো। আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, হীথক্লিফ তার ছেলে সম্পর্কে যা যা বলেছে সম্ভবত সব মিথ্যা। ক্যাথি আমার কথা বিশ্বাস করলো বলে মনে হলো না। আমার সব কথা

শুনলো ও নীরবে। তারপর বললো: 'হয় তো তোমার ধারণা ঠিক, এলেন, কিন্তু আমি নিজে না দেখলে বিশ্বাস করবো না। আসল ব্যাপারটা কী না দেখা পর্যন্ত আমি স্বস্তিও পাবো না। যেভাবেই হোক লিনটনকে আমার বুঝিয়ে বলতে হবে, ওর কাছে আর যে লিখি না এটা আমার দোষ নয়। এলেন, মিস্টার হীথক্লিফ তো বললেন উনি এক সপ্তাহ বাড়িতে থাকবেন না; এর ভেতর আমরা একবার যেতে পারি না ওয়াদারিং হাইটসে?'

ওর বিষণ্ণ, করুণ মুখটা দেখে এত মায়া হলো আমার যে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হলাম: 'ঠিক আছে, কাল সকালে যাবো।'

আমার আশা ছিলো লিনটন নিজেই প্রমাণ দেবে, ওর বাবা সত্যি কথা বলেনি।

পরদিন সকালে ওয়াদারিং হাইটসে পৌঁছে প্রথম রান্নাঘরে ঢুকলাম হীথক্লিফ সত্যিই বাইরে কিনা নিশ্চিত হয়ে নেয়ার জন্যে। আগুনের সামনে বসে আছে জোসেফ। আয়েশ ক'রে পাইপ টানতে টানতে চা খাচ্ছে। ভেতরের ঘর থেকে লিনটনের দুর্বল কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো এসময়: 'জোসেফ, কতবার ডাকতে হবে তোমাকে? তাড়াতাড়ি এসে আগুনটা ঠিক ক'রে দাও!'

জোসেফ চেয়ার ছেড়ে ওঠার আগেই আমরা দরজা পেরিয়ে ঢুকলাম পাশের ঘরে। বিরাট একটা চেয়ারে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে লিনটন। ক্যাথি ছুটে গেল ওর কাছে।

'মিস লিনটন! সত্যি তুমি!' কোনোরকমে মাথাটা একটু তুলে বললো লিনটন। 'বাবা বলছিলো তুমি আসবে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবে দয়া ক'রে? বাবা চলে যাওয়ার পর ওরা আর ঠিক মতো আগুন জ্বালে না আমার ঘরে। এত ঠাণ্ডা এখানে!'

আমি নিজে বাইরে গিয়ে কয়েক টুকরো কাঠ এনে গুঁজে দিলাম আগুনে।

'তারপর, লিনটন, আমাকে দেখে খুশি হয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথি।

'আরো আগে কেন আসোনি তুমি?' জিজ্ঞেস করলো লিনটন। 'লেখার বদলে তোমার আসা উচিত ছিলো। ঐ সব লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে কেমন যে হাঁপিয়ে যেতাম আমি! চাকরটা যে কোথায় গেল! কেউ আমার কথা ভাবে না। একটু পানি খাবো, কিন্তু ডেকে কাউকে পাওয়া যাবে না। বদমাশ হেয়ারটনটা তো সব সময় হাসাহাসি করে আমাকে নিয়ে—'

ঘরের ভেতর তাকিয়ে একটা টেবিলের ওপর এক জগ পানি দেখতে পেলো ক্যাথি। এগিয়ে গেল ও সেদিকে।

'তোমার বাবা ঠিক মতো তোমার যত্ন নেয়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বলতে পারো নেয়। আর কিছু না হোক চাকর বাকররা যাতে নেয় সেটা দেখে বাবা।'

একটা গ্লাস ভরে এনে দিলো ক্যাথি লিনটনকে। আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে

খানিকটা পানি খেলো ও।

'আমাকে দেখে খুশি হওনি তুমি?' আবার জিজ্ঞেস করলো ক্যাথি।

'হ্যাঁ,' বললো লিনটন। 'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি; কী যে ভালো লাগছে! এতদিন আসোনি কেন তুমি? বাবা বলছিলো তুমি নাকি আমাকে আর পছন্দ করো না। করো না, মিস—?'

'আমাকে ক্যাথরিন বা শুধু ক্যাথি বলে ডেকো। পছন্দ করি কি না? নিশ্চয়ই করি! বাবা আর এলেনের পর তোমাকেই আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। যদিও তোমার বাবাকে আমার পছন্দ নয়। উনি থাকলে আমার সাহস হয় না এখানে আসতে। গেছেন কোথায় উনি?'

'মুর-এ। শিকারের সময় শুরু হয়েছে তো। এ সময় বাবা প্রায়ই চলে যায় শিকার করতে। কয়েকদিন একটানা বাইরে কাটিয়ে ফেরে। বাবা যখন থাকে না তখন তো তুমি আসতে পারো।'

'পারি, কিন্তু বাবা যে আসতে দেয় না। তুমি আমার ভাই হলে বেশ হতো।'

'তাহলে তোমার বাবার মতো ভালোবাসতে আমকে? কিন্তু বাবা বলে তুমি আমার বউ হলে সবচেয়ে ভালো হবে। আমারও তাই মনে হয়।'

'না,' বললো ক্যাথি, 'অনেক সময় বউদেরও মানুষ ঘৃণা করে।'

'কী বলছো! এ হতেই পারে না।'

'পারে,' বললো ক্যাথি। 'তোমার বাবা বিয়ের পরপরই আমার ইসাবেলা ফুপুকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলো।'

রাগে ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো লিনটনের মুখ। 'কে বলেছে একথা?'

'বাবা,' বললো ক্যাথি। 'বাবা কখনো মিথ্যে বলে না।'

'আমার বাবা কিন্তু উল্টো কথা বলে,' তীব্র বিদ্বেষের সঙ্গে বললো লিনটন। 'বাবা বলে, তোমার বাবা একটা হাঁদা। চালাক চালাক ভাব করে, আসলে বোকার হদ্দ। মানুষের নামে আজেবাজে কথা বানিয়ে বলতেও বাধে না তার।'

এবার জ্বলে ওঠার পালা ক্যাথির।

'আর তোমার বাপ হচ্ছে বদের ধাড়ি!' চিৎকার করলো ও। 'এমন বদ যে তোমার জন্মের আগেই তোমার মাকে পালাতে হয় তাকে ছেড়ে!'

ওদের এই ঝগড়ায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ করলাম না আমি। বেশ স্বস্তি পাচ্ছি ঝগড়াটা শুরু হওয়ায়। এই ঝগড়ার পর আশাকরি লিনটনের প্রতি প্রেমে উবে যাবে ক্যাথির মন থেকে।

'তাহলে শোনো,' দাঁতে দাঁত চেপে বললো লিনটন, 'কথাটা বলবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলে পারছি না। তোমার মা তোমার বাবাকে ঘৃণা করতো— ভালোবাসতো বাবাকে!'

'মিথ্যেবাদী!' চিৎকার করলো ক্যাথি। 'আমি তোমাকে— তোমাকে ঘৃণা করি!'

'আমাকে তুমি যা-ই করো না কেন, তোমার মা আমার বাবাকে ভালোবাসতো, এটাই হচ্ছে সত্যি কথা!'

'চুপ করো!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'এ সম্পর্কে কী জানো তুমি?' যা জেনেছো তা তোমার বাবার বানানো গল্প।'

'তুমি চুপ করো, বেটি!' পাল্টা চেঁচালো লিনটন। 'সত্যিই, ক্যাথি, তোমার মা আমার বাবাকে ভালোবাসতো!'

রাগে দিশা হারিয়ে ক্যাথি লিনটনের চেয়ারটায় একটা ধাক্কা লাগালো জোরে। কাত হয়ে পড়তে পড়তে কোনোমতে বেঁচে গেল লিনটন। তারপরই কাশতে শুরু করলো ভীষণভাবে। কাশির দমকে ওর মুখ ল্যাল হয়ে গেল, চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো। দু'হাতে বুক চেপে ধরে কেশেই চললো সে। ভয়ার্ত চাউনি ফুটে উঠলো ক্যাথির চোখে। কেঁদে ফেললো ও।

এত দীর্ঘ সময় ধরে কাশলো লিনটন যে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। অবশেষে থামলো সে। মাথাটা এলিয়ে দিলো চেয়ারের পেছনে।

'এখন কেমন বোধ করছো, মাস্টার লিনটন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ক্রুদ্ধ চোখে ক্যাথির দিকে তাকালো ও। সকোপে বললো: 'আমার মত ওরও হলে ভালো হতো। ওহ, এমন নিষ্ঠুর মেয়ে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ গোঙালো লিনটন, আমার মনে হলো ক্যাথিকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যেই।

'আমি—আমি দুঃখিত, লিনটন,' শেষ পর্যন্ত বলতে পারলো ক্যাথি, 'তোমাকে কষ্ট দিয়েছি।'

'তোমার সাথে কথা বলতে চাই না আমি,' আগের মতোই রোষপূর্ণ কণ্ঠে বললো লিনটন। 'এই কাশির জন্যে আজ সারারাত জেগে কাটাতে হবে আমাকে!'

আবার গোঙালো কিছুক্ষণ ও। আমি ক্যাথির দিকে ফিরলাম।

'আমাদের বোধহয় এখন চলে যাওয়াই ভালো, মিস। আমরা চলে গেলে ও ভালো বোধ করবে।'

দরজার দিকে এগোলাম আমি ক্যাথির হাত ধরে। লিনটন মুখ তুললো না, কিছু বললোও না। দরজার কাছে পৌঁছে গেছি আমরা, পেছনে তীক্ষ্ণ এক চিৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, লিনটন মেঝেতে নেমে পড়ে ক্রুদ্ধ শিশুর মতো হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাচ্ছে।

সে এক ভয়ানক দৃশ্য। ক্যাথি আতঙ্কিত হয়ে ছুটে গিয়ে বসে পড়লো ওর পাশে, আমি বাধা দেয়ার সময়টুকুও পেলাম না। অগত্যা আমাকেও এগোতে হলো। দু'জনে মিলে ধাড়ি ছোঁড়াটাকে তুলে বসালাম আবার চেয়ারে। ক্যাথি ওর মাথার পেছনে একটা গদি বসিয়ে দিয়ে ওর হাত ধরে আমাকে বললো কিছুক্ষণ থেকে লিনটনের একটু শুশ্রূষা ক'রে যেতে। আমি বারণ করলাম, কিন্তু ক্যাথি শুনলো না। লিনটনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো ও।

'ক্যাথি, কাল আসবে আবার তুমি?' অবশেষে একটু শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো লিনটন।

'না,' জবাব দিলাম আমি। 'কাল কেন, পরশুও আসবে না!'

অনুনয়ের দৃষ্টিতে ক্যাথির দিকে তাকালো লিনটন। ক্যাথি ঝুঁকে ওর কানে কানে কিছু বললো। অমনি মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো লিনটনের। ক্যাথি কী বলেছে বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার। বললাম: 'আমি চোখ রাখবো তোমার ওপর, ক্যাথি। পাঁচিলের দরজার ভাঙা তালাটা মেরামত করিয়ে লাগিয়ে রাখবো যাতে তুমি বাড়ি থেকে বেরোতে না পারো।'

হাসলো ক্যাথি। 'পাঁচিল টপকে বেরিয়ে আসবো। আমার বয়েস সতের হওয়ার পথে, এলেন। আমি বড় হয়ে গেছি।'

আমার মুখে আর কথা যোগালো না। ক্যাথরিনকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ওয়াদারিং হাইটস থেকে।

'লিনটনকে তুমি পছন্দ করো না, এলেন?' পথে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলো ক্যাথি।

'প্রশ্নই ওঠে না। আজ যা করেছে তোমার সাথে তারপরও পছন্দ করবো! বাপের মতোই বাজে বদমেজাজী ও। তবে ভাগ্য ভালো, হীথক্লিফের কথা মনে হয় সত্যি হবে—বিশ পুরো হওয়ার আগেই ও মারা যাবে। সত্যি কথা বলতে কি সামনের বসন্ত দেখার জন্যে ও বেঁচে থাকবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। তুমি যা-ই ভাবো না কেন, মিস ক্যাথরিন, ওকে স্বামী হিশেবে পাওয়ার সুযোগ তোমার হবে না।'

আমার কথায় খুব আহত হলো ক্যাথি। বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর বললো: 'ভালো মেজাজে থাকলে সত্যিই ওকে বেশ লাগে। ও যদি কখনো আমার হয় আমি সব সময় ওর সাথে ভালো ব্যবহার করবো, তাহলে ওর মেজাজও ভালো থাকবে। আমরা কখনো ঝগড়া করবো না।'

'ঠিক আছে, মিস,' আমি বললাম, 'যদি কখনো তোমার হয় তখন যা করবার কোরো। এখন এ নিয়ে আর কিছু শুনতে চাই না আমি। তবে, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনো যদি তুমি আমাকে নিয়ে বা আমাকে ছাড়া ওয়াদারিং হাইটসে যেতে চাও আমি কিন্তু আমার কথা রাখবো, জানাবো মিস্টার লিনটনকে।'

খাওয়ার সময় পৌঁছুলাম আমরা বাড়িতে। কোনোরকম বেকায়দা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো না। এডগার নিজের ঘরেই কাটিয়েছে এতক্ষণ, ফলে টের পায়নি আমরা যে বাড়িতে ছিলাম না।

ঘরে ঢুকেই আমি আমার ভেজা মোজা জুতা ছাড়তে লাগলাম। যাওয়ার পথেই ওগুলো ভিজে একসা হয়েছিলো। তার পর অতটা সময় কাটিয়েছি হাইটসে এবং ফিরেছি গ্র্যাঞ্জে। ভয় হতে লাগলো, ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

পরদিনই আশঙ্কা সত্যি হলো। জ্বরে বিছানা নিতে হলো আমাকে। তিন সপ্তার ভেতর আর উঠতে পারলাম না।

এই তিন সপ্তায় আমার খুদে মনিবানী রীতিমতো দেবদূতীর মতো ব্যবহার করলো। সারাদিন একাধারে বাবার এবং আমার সেবা শুশ্রূষা করলো সে। কেবলমাত্র সন্ধ্যাটা রাখলো নিজের জন্যে। এসময় আমি একদিনও জিজ্ঞেস করিনি চায়ের পর ও একা একা কী ক'রে সময় কাটায়।

তিন সপ্তাহ পর যেদিন আমি ঘর ছেড়ে বেরোতে পারলাম সেদিনই চায়ের পর ক্যাথিকে বললাম একটা বই পড়ে শোনাতে। এখনও আমি নিজে নিজে বই পড়বার মতো অতটা সুস্থ হইনি। একটু যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো ক্যাথি। এবং এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই বই বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লো সোফায়।

'ওহ্, এলেন, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে,' হাই তুলতে তুলতে বললো ও।

'তাহলে আর পড়ে কাজ নেই, এসো গল্প করি,' আমি বললাম।

এব্যাপারটা আরো ক্লান্তিকর হলো। ক্যাথি কথা যেটুকু বললো তারচেয়ে অনেক বেশি করলো উসখুস, তুললো হাই, ফেললো দীর্ঘশ্বাস আর তাকালো ঘড়ির দিকে। এভাবে চললো আটটা পর্যন্ত। তারপর 'ঘুম আসছে' বলে ও উঠে চলে গেল।

পরদিন চায়ের পর আবার বই পড়ে শোনাতে বললাম। এদিন আরো বেশি আপত্তি জানালো এবং উসখুস করলো ক্যাথি। তৃতীয় দিন একই অনুরোধের জবাবে ও 'মাথা ধরেছে, আজ পড়তে পারবো না' বলে চলে গেল চায়ের পর পরই।

ক্যাথির এ দিনের আচরণ খুবই অস্বাভাবিক মনে হলো আমার। কিছুক্ষণ পর গেলাম ওর ঘরে মাথা ধরা কমেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি ও নেই। সারা বাড়ি খুঁজেও পেলাম না। তখন আবার ক্যাথির ঘরে ঢুকে বাতি নিভিয়ে দিয়ে এসে চুপচাপ বসে রইলাম বসার ঘরে জানালার সামনে।

চাঁদের আলোয় প্লাবিত গ্র্যাঞ্জের চারপাশের মুর। এখানে ওখানে জমে আছে তুষারের হালকা আস্তরণ। বসে বসে দেখছি আমি। ধীরে ধীরে শীত বাড়ছে। কিন্তু দেখা নেই ক্যাথির। দুশ্চিন্তা হতে লাগলো আমার।

অবশেষে অনেক রাতে দেখতে পেলাম আমাদের এক ছোকরা সহিস গ্র্যাঞ্জ এলাকার পথ ধরে টেনে নিয়ে আসছে ক্যাথির টাট্টুটাকে। ওদের পাশে পাশে আসছে ক্যাথি। ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে চলে গেল ছেলেটা, নিঃশব্দে দরজা খুলে ক্যাথি ঢুকলো বসার ঘরে।

'কোথায় ছিলে, মিস ক্যাথরিন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বা-বাগানে।'

'আর কোথাও না?'

'না।'

'তুমি ভালো ক'রেই জানো, মিস তুমি সত্যি কথা বলছো না। বাগানে

বেড়াতে ঘোড়া লাগে?'

এবার ক্যাথি ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

'ওয়াদারিং হাইটসে গেছিলাম আমি, এলেন,' বললো ও। 'রোজ যাই। তোমার অসুখ হওয়ার পর থেকে একদিনও বাদ দেইনি। আস্তাবলের যে ছেলেটাকে দেখেছো ওকে বই, ছবি এসব দিয়ে হাত করেছি, যাতে রোজ যাওয়ার সময় ও আমার ঘোড়াটা সাজিয়ে দেয়, এবং ফিরে আসার পর আবার ওটাকে আস্তাবলে নিয়ে রাখে। ওর কোনো দোষ নেই, এলেন। ওকে বোকো না তুমি। আমার আনন্দের জন্যে আমি যাই না হাইটসে, এলেন, অসুস্থ লিনটনের কথা ভেবেই যাই। আমি গেলে যা খুশি হয় ও! খুশি হয় কিন্তু আবার ঝগড়াও করে। অসুখের জন্যে সবসময় ওর মেজাজ খচে থাকে। তবু আমি গেলে ওর যে আনন্দটুকু হয় তা থেকে ওকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছে করে না আমার। মনে হয় অসুখ সেরে উঠলেই ওর মন মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্বাস করো, এলেন, মাত্র দুই কি তিন দিন আমরা প্রথম দিনের মতো ভালো ভাবে সময় কাটিয়েছি। আমি গেলেই মিস্টার হীথক্লিফ বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। আমার মনে হয় উনি ভাবেন আমি যাওয়ার পরও উনি যদি বাড়িতে থাকেন তাহলে হয়তো আমি যাওয়া ছেড়ে দেবো।

'সব তো তোমাকে বললাম, এলেন। এখন বলো, এসব কথা বলবে বাবাকে? তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারবে না, আমি জানি।'

'রাতটা ভাববো আমি,' বললাম, 'কাল সকালে ঠিক করবো তোমার বাবাকে বলবো কি বলবো না। এখন যাও, শোওগে তুমি।'

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সাহস আমার হলো না। কে জানে, তার মধ্যে যদি মন ঘুরে যায় আমার। ক্যাথি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই আমি ঢুকলাম ওর বাবার ঘরে। গড় গড় ক'রে বলে গেলাম তার মেয়ে যা যা জানিয়েছে আমাকে সব। শুনে একেবারে মুষড়ে পড়লো এডগার। রাতে আর কিছু বললো না সে। সকালে ডেকে পাঠালো মেয়েকে। সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো এই গোপন অভিসার ক্যাথিকে বন্ধ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ওর আর যাওয়া চলবে না ওয়াদারিং হাইটসে। বৃথাই কেঁদে আকুল হলো ক্যাথি, দয়া করতে বললো লিনটনকে। এডগার লিনটনের মন নরম হলো না একটুও। তবে কান্নাকাটি ক'রে ক্যাথি এই প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারলো যে, লিনটনকে চিঠি লিখবে এডগার এবং গ্র্যাঞ্জে আসার অনুমতি দেবে ওকে।

ষোলো

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলো আমার মনিব। কিন্তু অনুমতি পেয়েও লিনটন এলো না। কোনো চিঠিও লিখলো না। আমি মনিবকে বোঝালাম, লিনটন আসেনি কারণ

আসার মতো অবস্থা নয় ওর দেহের। চিঠিও লেখেনি সম্ভবত একই কারণে। এডগার মেনে নিলো আমার ব্যাখ্যা।

১৮০৭ সালের বসন্ত এসে গেল কিন্তু আমার মনিব তার হারানো শক্তি আর ফিরে পেলো না। একটু সুস্থ সে এখন। মেয়ের সঙ্গে বাগানে বেড়াতে যেতে পারে। ক্যাথি ভাবলো এটা তার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার পূর্বলক্ষণ। কিন্তু আমি তা ভাবতে পারলাম না। কারণ মেয়ের সপ্তদশ জন্মদিনে স্ত্রীর কবরটা পর্যন্ত সে দেখতে যেতে পারলো না শক্তির অভাবে।

এর কিছু দিন পর এক সকালে আমাকে ডেকে পাঠালো মনিব। ঘরে ঢুকে লক্ষ করলাম ভীষণ ফ্যাকাসে আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'এলেন,' বললো সে, 'ভেবেছিলাম চিঠি পেয়ে আমার ভাগে আসবে—না আসতে পারলেও অন্তত চিঠি লিখবে। কিন্তু কোনোটাই করলো না। ওকে কেমন মনে হয় তোমার, এলেন?'

'স্বাস্থ্যের কথা যদি বলেন,' আমি বললাম, 'খুব দুর্বল ও। আর স্বভাবের দিক থেকে—বাপের মতো নয় খুব একটা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো এডগার। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বাইরে তাকিয়ে থেকে ঘুরলো আমার দিকে। 'ক্যাথির জন্যে কী করবো আমি বলো তো, এলেন? আমার মনে হয় ও ভালোবাসে লিনটনকে। তুমি তো জনো, এলেন, আমার মৃত্যুর পর গ্র্যাঞ্জের মালিক হবে লিনটন—কারণ তখন ও-ই থাকবে একমাত্র জীবিত পুরুষ লিনটন। ক্যাথি পাবে ওর নিজের অংশ। কিন্তু আমি না থাকলে ওর দেখাশোনা করবে কে? আমি থাকতে থাকতেই ও যেন ভালো থাকে সুখে থাকে সে ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া উচিত না?'

'আমি ঠিক জানি না, স্যার,' জবাব দিলাম আমি, 'তবে এটুকু জানি মিস ক্যাথি খুব ভালো মেয়ে, আর, যারা ভালো তারা তাদের ভালোত্বের পুরস্কার পায়।'

বসন্তের দিন গড়িয়ে চললো একটা দুটো ক'রে। কিন্তু এডগারের শরীর ভালো হলো না। অবশেষে আবার সে চিঠি লিখলো লিনটনকে গ্র্যাঞ্জে আসার অনুরোধ জানিয়ে। এবার জবাব দিলো লিনটন। লিখলো:

'আমার খুবই ইচ্ছে করে গ্র্যাঞ্জে যেতে কিন্তু বাবা যেতে দেয় না। তাছাড়া অতদূরের পথ যাওয়া সম্ভবও নয় আমার পক্ষে। আপনি যদি ক্যাথিকে আমাদের এখানে আসার অনুমতি দেন তাহলে ভালো হয়। ওকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে আমার। আপনাকেও দেখতে ইচ্ছে করে। আপনি যদি ওর সঙ্গে এসে হাইটসের কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করেন আমি গিয়ে দেখা করে আসতে পারি। আমার মনে হয় এটুকু ধকল সইতে পারবে আমার শরীর...'

এচিঠি পেয়ে খুবই মর্মাহত হলো এডগার ছেলেটার দুরবস্থা কল্পনা ক'রে; কিন্তু ওর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলো না। কারণ তার নিজের শরীরও অতদূর যাওয়ার ধকল সইবার মতো শক্ত নয় এখন। তবে ক্যাথরিনকে সে অনুমতি দিলো লিনটনের সাথে দেখা করার; কিন্তু সপ্তাহে একবারের বেশি নয় এবং ওয়াদারিং হাইটসে নয়।

হাইটসের সিকি মাইল মতো দূরে মুরের ভেতর একটা জায়গা ঠিক করা হলো দেখা করার জন্যে।

এই ব্যবস্থামতো প্রথম যেদিন রওনা হলাম আমি আর ক্যাথি সেদিন খুব গরম পড়েছে। জায়গামতো পৌঁছে দেখি লিনটন শুয়ে আছে একটা ঝোপের ছায়ায়। আমরা একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত উঠলো না ও। ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখটা। কাঁপছে একটু একটু, আর হাঁপাচ্ছে—সম্ভবত গরমে।

'এ কেমন চেহারা হয়েছে তোমার, মাস্টার হীথক্লিফ!' ব্যস্ত হয়ে আমি বললাম। 'অসুস্থ মনে হচ্ছে তোমাকে। এই শরীরে বাড়ি থেকে না বেরোলেই তো পারতে!'

'না—না, আমি ভালো আছি—ভালো আছি—' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। ক্যাথির হাত ধরলো। আমার মনে হলো সোজা হয়ে বসে থাকার জন্য হাতটা ধরার প্রয়োজন হলো ওর।

ক্যাথি বসলো ওর পাশে। এবার যেন একটু ভালো বোধ করতে লাগলো লিনটন।

'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে,' বললো ও। 'কেমন গরম পড়েছে আজ! এই গরমে এত দূর হেঁটে আসা! ওহ! সকালবেলায় এমনিতেই আমার একটু অসুস্থ লাগে।'

'না এলেই পারতে,' ক্যাথি বললো।

'না এলে যে তোমাকে দেখতে পেতাম না,' জবাব দিলো লিনটন। 'তুমি বসে থাকো আমার পাশে, আমি একটু শুই।'

শুয়ে পড়লো লিনটন এবং ঘুমিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। যখন উঠলো তখন আমাদের ফেরার সময় হয়ে গেছে। আগামী বৃহস্পতিবার বিকেলে আবার আসবো বলে আমরা বিদায় নিলাম।

পরের সাত দিনে দ্রুত অবনতি হলো এডগারের স্বাস্থ্যের। এতদিন বাড়ির ভেতর হাঁটা চলা করতে পারছিলো এবার তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে ওঠার অবস্থাও রইলো না তার। আমি তো বটেই ক্যাথিও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো। এবার যেন ও বুঝতে পারছে যা ও চিন্তা করতেও ভয় পায় তা-ই ঘটতে চলেছে—মারা যাচ্ছে ওর বাবা। পরের বৃহস্পতিবার যখন এলো, ও ঠিক করতে পারলো না কী করবে—বাবার কাছে থাকবে না দেখা করতে যাবে লিনটনের সাথে। শেষ পর্যন্ত বিকেল যখন হয়ে এলো অনেক ভেবেচিন্তে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলো ক্যাথি।

এদিন জায়গামতো পৌঁছে দেখি গত দিনের চেয়েও খারাপ অবস্থা লিনটনের।

অথচ আমরা ভেবেছিলাম আজ যখন বিকেলে যাচ্ছি, ওকে ভালো দেখবো অনেকটা। আমি কিছুটা দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ক্যাথি ছুটে গেল লিনটনের কাছে।

'ওহ, ক্যাথি, এসেছো!' ও পৌছুতেই ফিস ফিস ক'রে বলে উঠলো লিনটন। 'আমার ভীষণ ভয় করছে! বাবা বলেছে আজ যদি—আজ যদি—'

আর বলতে পারলো না লিনটন, কেঁদে ফেললো ক্যাথিকে জড়িয়ে ধরে। লক্ষ করলাম কাঁদতে কাঁদতেই ও ভয়ার্ত মুখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। ব্যাপার কী আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম এগিয়ে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। পেছনে একটু দূরে খড়মড় শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে হীথক্লিফ। সোজা আমার কাছে এলো সে। হালকা সুরে বললো, 'আহ, নেলি, যা খুশি লাগছে তোমাকে দেখে! কেমন আছো? গ্র্যাঞ্জের খবর কী?' এরপর ক্যাথির দিকে একবার তাকিয়ে একটু হেসে নিচু গলায় যোগ করলো, 'শুনলাম এডগার লিনটন নাকি মরতে বসেছে?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'এবং ব্যাপারটা মোটেই আনন্দের নয় আমাদের জন্যে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আনন্দের নয়,' আগের মতোই হালকা এবং নিচু গলায় বললো হীথক্লিফ। 'কিন্তু আর ক'দিন ও টিকবে বলে মনে করো তুমি? এদিকে আমার এই ছেলেটা তো প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছে মামার আগেই সে মরবে যে করেই হোক। তাতে যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না বুঝতে চাইছে না কিছুতেই। মিস লিনটনের সাথে কেমন ভাবসাব হলো আমার ছেলের?'

'আবার ভাবসাব,' আমি বললাম, 'উঠে বসতেই পারে না! ক্যাথি দেখা করতে আসে আর ও ঘুমায়। সত্যিই খুব খারাপ অবস্থা তোমার ছেলের। ডাক্তার দেখাচ্ছো না কেন?'

'দেখাবো; দু'একদিনের মধ্যে দেখাবো। কিন্তু তার আগে—' বিড় বিড় করলো হীথক্লিফ। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'লিনটন! এই লিনটন! ওঠো! উঠে দাঁড়াও! এক্ষুণি!'

একবার নয়, পর পর কয়েকবার চেষ্টা করলো লিনটন বাবার আদেশ পালন করার। কিন্তু পারলো না।

'আমাকে একটু ধরে ওঠাবে, ক্যাথরিন?' অবশেষে বললো সে।

'আমার হাত ধরে ওঠো, উজবুক,' এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো হীথক্লিফ।

'না!' চিৎকার করলো লিনটন। 'তুমি—তুমি যাও! নইলে—নইলে আমি জ্ঞান হারাবো! ক্যাথরিন! আমার কাছে থাকো, ক্যাথরিন! তোমার হাতটা দাও!'

'দাও, মিস লিনটন,' ব্যঙ্গের সুরে বললো হীথক্লিফ, 'হাতটা দাও তোমার। আর দয়া ক'রে যদি ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দাও আমি বেঁচে যাই। আমার স্পর্শটাও ও সহ্য করতে পারে না আজকাল। কী ক'রে এখন ওকে বাড়ি নেবো?'

'না লিনটন,' ফিস ফিস ক'রে বললো ক্যাথি, 'ওয়াদারিং হাইটসে যেতে পারবো না আমি। বাবা বারণ করেছে। তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন, লিনটন? নিশ্চয়ই তোমার বাবা তোমাকে মারবে না।'

'তোমাকে ছাড়া আমি যাবো না!' জবাব দিলো লিনটন।

'এলেন,' চিৎকার করলো হীথক্লিফ, 'তুমি একটু ধরে ওকে পৌঁছে দেবে হাইটসে?'

'না,' আমি বললাম, 'তোমার ছেলের দেখাশোনা করা আমার দায়িত্ব নয়।'

কাঁধ ঝাঁকালো হীথক্লিফ। ছেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ওঠো তাহলে, বীরপুরুষ, আমার সঙ্গেই যেতে হবে তোমাকে।'

কিন্তু লিনটন ওর বাড়ানো হাত ধরার বদলে পিছিয়ে সেঁটে গেল ক্যাথির গায়ের সঙ্গে। বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো, 'চলো তুমি! চলো তুমি! তোমাকে ছাড়া আমি যাবো না।'

এমন আতঙ্কিত অবস্থা ছেলেটার যে ক্যাথিকে ওর কাছ থেকে টেনে সরিয়ে আনবো সে সাহসটাও আমার হলো না। কে জানে জোরাজুরি করতে গিয়ে আরো খারাপ কিছু যদি হয়ে যায়। কিন্তু কেন ও এতটা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

ক্যাথি আরো কিছুক্ষণ চেষ্টা করলো লিনটনকে বোঝানোর যে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় ওয়াদারিং হাইটসে। কিন্তু লাভ হলো না। লিনটন ঐ এক কথা আউড়ে চললো, 'তোমাকে ছাড়া আমি যাবো না!' অগত্যা যাবে বলে ঠিক করলো ক্যাথি। কিছুতেই সেটা উচিত হবে না, বাবার আদেশ অমান্য করলে বাবা দুঃখ পাবে, ইত্যাদি বলে আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না।

'তাহলে কি এই মুরের ভেতর ফেলে রেখে যাবো আমরা লিনটনকে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

শেষ পর্যন্ত রওনা হলাম আমরা হাইটসের দিকে। একেবারে সামনে, অনেকটা এগিয়ে হীথক্লিফ; তারপর ক্যাথির কাঁধে ভর দিয়ে লিনটন; সব শেষে আমি।

হাইটসে পৌঁছে লিনটনকে নিয়ে ক্যাথি ভেতরে চলে গেল; আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম দরজার মুখে। আমার ইচ্ছা ক্যাথি লিনটনকে শুইয়ে বা বসিয়ে দিয়ে যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ বাইরেই অপেক্ষা করবো। কিন্তু হীথক্লিফ আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো ভেতরে।

'আমার বাড়িতে প্লেগ লাগেনি, নেলি,' বললো সে। 'ভেতরে ঢুকে বসো, দরজাটা লাগাই আমি।'

আমাকে ধরে থেকেই দরজা বন্ধ করলো হীথক্লিফ। তারপর ছেড়ে দিলো আমার হাত। ঘুরে তাকিয়ে আমি দেখলাম তালা মেরে দরজা থেকে চাবি খুলে নিচ্ছে সে।

আকস্মিক এক আতঙ্কে শিউরে উঠলাম আমি।

আমার দিকে তাকালো হীথক্লিফ। বিজয়ীর হাসি মুখে।

'আমার সাথে চা খাবে তোমরা,' বললো সে। 'মিস লিনটন, বসো আমার ছেলের পাশে। আর ওভাবে তাকাচ্ছে কেন মেয়েটা? এলেন, বলে দাও তো ওকে, আমি চাইলেই ওকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে পারি—বেশি না মোটে এক সন্ধ্যার আনন্দের জন্যে!' হঠাৎ ক'রেই ওর চেহারা বদলে গেল। হাসির জায়গা নিলো বিকৃত ক্রোধ। টেবিলে জোরে এক ঘুসি মেরে চিৎকার করলো, 'তোমাদের ফন্দিবাজ লিনটনদের আমি ঘৃণা করি!'

ক্যাথরিন এগিয়ে এলো লিনটনকে ছেড়ে। আগুনের মতো জ্বলছে ওর চোখ দুটো।

'আমি আপনাকে ভয় করি না,' চিৎকার করলো ও। 'চাবিটা দিন, আমি বাড়ি যাবো। আপনার সাথে চা খাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই!'

বলতে বলতে লাফ দিয়ে গিয়ে হীথক্লিফের হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো ক্যাথি। ঝটকা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিলো হীথক্লিফ।

'সাবধান, ক্যাথরিন লিনটন,' চিৎকার করলো সে, 'সরো, নইলে পিটুনি লাগাবো তোমাকে!'

এই সাবধান বাণী গ্রাহ্যই করলো না ক্যাথি। আবার ধরলো হীথক্লিফের হাত। কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো চাবিটা। আরো একবার ঝটকা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিতে চাইলো হীথক্লিফ। না পেরে শেষে ছেড়ে দিলো চাবিটা। ঠং ক'রে মাটিতে পড়লো ওটা। পর মুহূর্তে ঠাস ঠাস ক'রে দুটো চড় কষালো সে ক্যাথির দু'গালে। রাগে দিশেহারা হয়ে আমি ছুটে গিয়ে ধরে বসলাম দানবটার হাত। চিৎকার করলাম, 'বদমাশের বাচ্চা!'

কিন্তু আমার গায়ে আর শক্তি কতটুকু? এক ধাক্কায় ও আমাকে ফেলে দিলো মাটিতে। তারপর ফিরলো ক্যাথির দিকে। ও তখন দু'গালে হাত দিয়ে কাঁপছে থর থর ক'রে।

'অবাধ্য ছেলেমেয়েদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি,' গর্জন করলো হীথক্লিফ। 'যাও লিনটনের পাশে গিয়ে বসো।'

কিন্তু ক্যাথি লিনটনের দিকে তাকালোও না। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। ভেঙে পড়লো কান্নায়। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

হীথক্লিফ আর কিছু না বলে গিয়ে চা বানালো। কাপ তস্তরী টেবিলে সাজানোই ছিলো। চা ঢেলে একটা কাপ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। আমি কোনো আগ্রহ দেখালাম না চায়ের প্রতি।

'খাও!' ধমকের সুরে বললো হীথক্লিফ। 'বিষ মেশানো নেই এতে।'

ভয়ে ভয়ে নিলাম আমি কাপটা, পাছে না নিলে আবার ও কিছু একটা উন্মাদ-কাণ্ড ক'রে বসে। এরপর হীথক্লিফ নিজে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর

থেকে।

ও চলে যাওয়ার পর আমার প্রথম চিন্তা হলো, বেরোনোর চেষ্টা করতে হবে। একে একে পরীক্ষা করলাম দরজাগুলো। সব তালা মারা বাইরে থেকে। আর জানালার গরাদগুলো এত ঘন যে তাদের ফাঁক গলে আমি দূরের কথা, ক্যাথির মতো হালকা পাতলা মেয়েরও বেরোনো সম্ভব নয়। বুঝতে অসুবিধে হলো না, আমরা বন্দী।

'মাস্টার লিনটন,' অস্থির কণ্ঠে আমি বললাম, 'তোমার বাবার মতলব কী তুমি জানো নিশ্চয়ই। বলো, কী? বলো! না হলে শয়তানটা আমার ক্যাথিকে যেমন মেরেছে তারচেয়ে জোরে আমি মারবো তোমাকে!'

'হ্যাঁ, লিনটন,' বললো ক্যাথি, 'বলতে হবে তোমাকে। তুমি পীড়াপীড়ি করেছো বলেই আমি এসেছি!'

'আমাকে একটু চা দাও, ভীষণ পিপাসা পেয়েছে আমার,' জবাব দিলো শয়তানের বাচ্চা।

ছেলেটার প্রতি তীব্র ঘৃণায় বিষিয়ে গেছে আমার মন! ভুল ভেবেছিলাম আমি। হীথক্লিফের বাচ্চা হীথক্লিফের চেয়ে ভালো হবে কী ক'রে? ও নিজের কথা ভাবেনি, কারো কথাই ভাবেনি। স্রেফ বাপ যা শিখিয়ে দিয়েছে তা-ই করেছে ক্যাথিকে আর আমাকে হাইটসে টেনে আনার জন্যে।

ক্যাথি বা আমি নড়লাম না দেখে ও নিজেই নিজের চা ঢেলে নিলো। কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে চললো, 'বাবা চায় আমাদের বিয়ে হোক। কিন্তু তার ধারণা আমি বেশিদিন বাঁচবো না, তাই এখনই কাজটা সেরে ফেলতে চায়। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাল সকালে বিয়ে হবে। আজ রাতটা তোমাদের এখানেই থাকতে হবে। বাবার মত মতো যদি চলো তাহলে কাল বা পরশু তোমরা বাড়ি ফিরতে পারবে, আমাকেও নিয়ে যেতে পারবে সঙ্গে।'

'এখানে থাকবো সারারাত?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো ক্যাথি। 'না! এলেন, বেরোনোর জন্যে দরকার হলে ঐ দরজা আমি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবো।'

কাজটা ও শুরু করতে গেল তক্ষুণি। কিন্তু বাধা দিলো লিনটন। আবার আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর চেহারায়।

'না, ক্যাথরিন!' ভয়ার্ত স্বরে বললো ও। 'আমাকে বিয়ে করবে তুমি—করতেই হবে, ক্যাথরিন। বাবার কথা মতো না চললে—'

'আমি শুধু আমার কথামতো চলবো,' ওকে শেষ করতে না দিয়ে চিৎকার করলো ক্যাথি। 'চুপ ক'রে থাকো, লিনটন! তোমার কোনো বিপদ হবে না। কিন্তু আমাকে যদি বাধা দেয়ার চেষ্টা—'

শেষ করতে পারলো না ক্যাথিও। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো হীথক্লিফ। চোখ ঘুরিয়ে আমাদের সবাইকে দেখলো সে একবার। তারপর লিনটনকে পাঠিয়ে দিলো শুতে।

লিনটন বেরিয়ে যাওয়ার পর রান্নাঘরের ভেতর দিকের দরজাটায় তালা মেরে আগুনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো হীথক্লিফ। জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাথি। ওর সে দৃষ্টি এক পলক দেখে বললো হীথক্লিফ, 'এখনো মেজাজ ঠাণ্ডা হয়নি তোমার? আমাকে ভয় পাচ্ছো না?'

'পাচ্ছি,' তাড়াতাড়ি নরম হয়ে জবাব দিলো ক্যাথি। 'ভয় পাচ্ছি আমি—আমাকে যদি আটকে রাখেন দুশ্চিন্তা করতে করতে মরেই যাবে বাবা। এমনিতেই বাবার শরীর ভালো নয়। মিস্টার হীথক্লিফ, আমাকে ছেড়ে দিন! কথা দিচ্ছি আমি লিনটনকে বিয়ে—'

'তুমি কথা দিলে কি না দিলে তাতে কিছু আসে যায় না আমার। লিনটনকে যাতে তুমি বিয়ে করো, সেটা আমি দেখবো। আর বিয়েটা হওয়ার আগে এখান থেকে কোথাও যাচ্ছো না তুমি। তোমার বাপ মরে যাবে? মরুক। তাতে আমি খুশিই হবো। কষ্ট পাবে? পাক! ও কষ্ট পাচ্ছে কল্পনা ক'রে আমি আনন্দ পাবো।'

'দয়া করুন। দয়া করুন আমাকে!' আকুলকণ্ঠে বললো ক্যাথি। 'অমন নিষ্ঠুর হবেন না! যেতে দিন আমাকে!'

বলতে বলতে ক্যাথি গিয়ে হাত ধরলো হীথক্লিফের। ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো হীথক্লিফ।

'ছাড়ো আমাকে।' চেঁচালো সে। 'ছাড়ো! সরো—না হলে লাথি মেরে সরাবো! সাপের স্পর্শও আমি সহ্য করতে রাজি, কিন্তু কোনো লিনটনের নয়! অসম্ভব! আমি ঘৃণা করি তোমাদের।'

'তাহলে এলেনকে যেতে দিন,' কাঁদতে কাঁদতে বললো ক্যাথি। 'বাবা অন্তত জানুক আমি নিরাপদে আছি।'

'চুপ! আর একটা কথাও শুনতে চাই না তোমাদের কারো কাছ থেকে।'

একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। ক্যাথি কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'কাঁদো যত পারো,' বিদ্রূপের সুরে বললো হীথক্লিফ। 'এখন থেকে আমার আনন্দের প্রধান উৎস হবে তোমার এই কান্না।'

সতেরো

সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসার ঠিক পরপরই বাগানের ফটকে মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম। হীথক্লিফ ঝটিতি উঠে বেরিয়ে গেল। দু'তিন মিনিট কথা বললো বাইরের মানুষগুলোর সঙ্গে। ফিরে এসে বললো, 'তোমাদের গ্র্যাঞ্জ থেকে এসেছিলো।' দেঁতো হাসি হাসলো সে। 'তিনজন। তোমাদের খোঁজ করছিলো। এখন যাও তোমরা দু'জনই, ওপরে চলে যাও, আমার পরিচারিকার ঘরে থাকবে।

আজও তোমরা ফিরবে না।'

ওপরে গেলে কোনো জানালা বা ছাদের স্কাইলাইট গলে পালানোর একটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে ভেবে ক্যাথির কানে কানে বললাম ওর কথা মতো কাজ করতে। কিন্তু হতাশ হতে হলো আমাকে। শুধু আমরা নই, হীথক্লিফও এলো পেছন পেছন। আমাদের দু'জনকে জিল্লার ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলো ও বাইরে থেকে। জানালার কাছে গিয়ে লাভ নেই। হাইটসে যখন ছিলাম এঘরেই থাকতাম আমি। জানি নিচের মতোই এঘরের জানালাগুলোরও গরাদ খুব ঘন।

রাতে আমি বা ক্যাথি কেউই ঘুমাতে পারলাম না একবিন্দু। সকালের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম বসে বসে। আশা করতে লাগলাম নতুন দিন নতুন আশা নিয়ে আসবে।

ভোরে—প্রায় সাতটা বাজে তখন—হীথক্লিফ এসে ডাকলো ক্যাথিকে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে।

'আসছি।' দরজার কাছে ছুটে গেল ক্যাথি।

দরজা খুললো হীথক্লিফ। 'এসো আমার সাথে,' বলে ক্যাথিকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেল সে। আমিও এগোলাম বেরোনোর জন্যে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌছুনোর আগেই হীথক্লিফ আবার বন্ধ ক'রে দিলো দরজা। তালা লাগানোর শব্দ শুনে কপাটে দুমদাম কিল মেরে চিৎকার করতে লাগলাম, 'আমাকেও নিয়ে যাও! বেরোতে দাও আমাকে!'

'চুপ ক'রে বসে থাকো,' পাল্টা চিৎকার করলো হীথক্লিফ। 'দু'এক মিনিটের মধ্যেই তোমার নাশতা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

দরজায় কিল মারতে আর চিৎকার করতে থাকলাম আমি। কিন্তু লাভ হলো না কোনো। অবশেষে ক্লান্তি আর হতাশায় বসে পড়লাম আস্তে আস্তে।

দু'একমিনিট নয়। দু'তিন ঘন্টা পর দরজা খুললো আবার। ঘরে ঢুকলো হেয়ারটন। হাতে আমি সারাদিনেও খেয়ে শেষ করতে পারবো না এত খাবার ভর্তি এক ট্রে। ট্রেটা আমার সামনে ঠেলে দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ালো চলে যাওয়ার জন্যে।

'এক মিনিট দাঁড়াও,' আমি শুরু করলাম।

'না,' বলে বেরিয়ে গেল হেয়ারটন।

পুরো চারদিন এবং পাঁচরাত ঐ ঘরে বন্দী রইলাম আমি। এর ভেতর হেয়ারটন ছাড়া আর কারো মুখ দেখলাম না একবারের জন্যেও। রোজ সকালে এসে ও আমার খাবার দিয়ে যায়, কিন্তু কোনো কথা বলে না; সাহায্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

পঞ্চম দিন বিকেলে জিল্লা এসে দরজা খুললো। কী ঘটেছে এদিকে সে সম্পর্কে কিছু জানে বলে মনে হলো না ওর কথা শুনে।

'ও ঈশ্বর, মিসেস ডীন!' দরজা খুলে আমাকে দেখেই চিৎকার ক'রে উঠলো

জিল্লা, 'গিমারটনে কী হৈ-চৈ তোমাদের নিয়ে! সবাই ভাবছিলো তোমরা কোনো খানায় পড়ে ডুবে গেছ। পরে শুনি আমার মনিব তোমাদের উদ্ধার ক'রে এখানে আশ্রয় দিয়েছেন। সত্যিই উনি উদ্ধার করেছেন তোমাদের, মিসেস ডীন?'

'তোমার মনিব একটা দুর্বৃত্ত!' আমি চেঁচালাম। 'কিন্তু ভেবো না ও রেহাই পাবে। যা ও করেছে তার মূল্য ওকে দিতে হবে!'

'কী হয়েছে, মিসেস ডীন, তুমি এভাবে কথা বলছো কেন? আমি আসতেই মনিব চাবি দিয়ে বললো তুমি এঘরে আছো। অসুস্থ হয়ে উল্টোপাল্টা শুরু করেছিলে বলে তালা মেরে রাখতে হয়েছে, তবে এখন নাকি তুমি সুস্থ, ফিরে যেতে পারো গ্র্যাঞ্জে। মনিব আরো বলেছেন শিগগিরই তোমার মনিবের মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন যাতে মিস্টার লিনটনের শেষকৃত্যে ও যোগ দিতে পারে।'

'মিস্টার এডগার এখনো মারা যায়নি তাহলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না,' বললো জিল্লা, 'তবে আসার পথে ডাক্তার কেনেথের সাথে দেখা হয়েছিলো, বললেন খুব বেশি হলে আর একদিন বাঁচবেন মিস্টার লিনটন।'

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালাম না আমি। দুদ্দাড় ক'রে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম নিচে। মুক্তি পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছি আমি তখন। নিচে নেমে দেখলাম সামনের দরজা খোলা। পার্লারে সোফায় শুয়ে আছে লিনটন। ক্যাথরিনের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

'মিস ক্যাথি কোথায়?' আমি জানতে চাইলাম।

গর্দভের মতো একটু হাসল লিনটন।

'ও এখন আমার বউ,' বললো সে। 'ওপরে একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে ওকে। বাবা বলেছে এখনো বাড়ি যাওয়ার সময় হয়নি ওর।'

'বোকার মতো কথা বোলো না,' ঝাঁঝের সাথে আমি বললাম, 'কোন্ ঘরে আছে ও দেখিয়ে দাও!'

'না,' বললো গর্দভটা। 'দেখালেও কোনো লাভ হতো না তোমার। তালা মারা ও ঘরে, চাবি বাবার কাছে।'

'তুমি ইচ্ছে করলেই চাবিটা নিয়ে রাখতে পারতে!'

'পারতাম, কিন্তু রাখিনি। বাবা বলেছে, এখন আমাকে শক্ত হতে হবে, মোটেই দয়া দেখানো চলবে না ক্যাথরিনকে। ও আমাকে ঘৃণা করে, আমার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে। আমি মরলেই আমার সব সম্পত্তি দখল করবে।'

অপদার্থটার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওর সঙ্গে কথা বলে আর সময় নষ্ট করলাম না। লোকজন নিয়ে এসে উদ্ধার করবো ক্যাথিকে ভেবে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম গ্র্যাঞ্জের দিকে।

বাড়ি পৌঁছাতেই আর সব চাকর বাকররা ছুটে এলো। গিমারটনের ওদের মতো ওরাও ভেবেছিলো ক্যাথি আর আমি মারা গেছি মুরের কোনো পাঁক ভর্তি খানায় পড়ে। একই সঙ্গে স্বস্তি আর উদ্বেগ ফুটে উঠেছে সবার চেহারায়। স্বস্তি

আমি ফিরে এসেছি বলে, উদ্বেগ ক্যাথি আসেনি বলে। ক্যাথি কোথায় জিজ্ঞেস করতে লাগলো ওরা। আমি কারো কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকলাম মনিবের ঘরে।

ক'দিনের মধ্যে কী চেহারা হয়েছে এডগারের! বিছানার সঙ্গে একেবারে লেগে গেছে যেন। মুখটা বিবর্ণ। চুপ চাপ চোখ বুজে শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ক্যাথি আসছে, চিন্তা করবেন না! ও বেঁচে আছে, ভালো আছে—শিগগিরই আসবে বাড়িতে।' এরপর সেদিন আমরা ওয়াদারিং হাইটসে যাওয়ার পর যা যা ঘটেছে সব খুলে বলে আমি অনুমতি চাইলাম ক্যাথিকে উদ্ধার ক'রে আনার জন্যে চার জন লোক পাঠানোর।

'পাঠাও,' ক্ষীণকণ্ঠে বললো এডগার।

সঙ্গে সঙ্গে আমি নিচে নেমে কাজের লোকদের চারজনকে পাঠিয়ে দিলাম ওয়াদারিং হাইটসে। বলে দিলাম যা-ই ঘটুক না কেন, ক্যাথিকে না নিয়ে যেন না ফেরে ওরা।

দীর্ঘ সময় পরে ফিরে এলো হাঁদাগুলো। ক্যাথিকে ছাড়াই। বললো, মিস ক্যাথি ভয়ানক অসুস্থ, ঘর ছেড়ে বেরোনোর মতো অবস্থা নয়, সেজন্য মিস্টার হীথক্লিফ ওর সাথে দেখা করতে দেয়নি ওদের।

যা মুখে এলো তাই বলে গালাগাল করলাম উজবুকগুলোকে। ঠিক করলাম, কাল সকালে বাড়িতে যে ক'জন লোক আছে সবাইকে নিয়ে গিয়ে আমি নিজেই চড়াও হবো হাইটসে। প্রয়োজন হলে বাড়ি ভাংচুর ক'রে বের ক'রে আনবো ক্যাথিকে।

রাতে ঘুমোলাম না আমি। মনিবের ঘরে বসে তার শুশ্রূষা করতে লাগলাম। ভোর রাত তিনটের দিকে পানির জগটা ভরে নেয়ার জন্যে নিচে নেমেছি। হঠাৎ শুনি তীক্ষ্ণ টোকার শব্দ সামনের দরজায়। চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম আমি। কোনো সন্দেহ নেই ক্যাথির টোকা। ছুটে গিয়ে দরজা খুললাম। বাড়ির বাইরেটা ধুয়ে যাচ্ছে ঝকঝকে জ্যোৎস্নায়। ক্যাথি দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে। লাফ দিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। ভেঙে পড়লো অদম্য কান্নায়।

'এলেন!' রুদ্ধশ্বাসে বললো ও। 'বাবা আছে এখনো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু পালালে কী ক'রে ও বাড়ি থেকে?'

'বাবার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় এমন পাগলের মতো করতে শুরু করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে লিনটন পালাতে সাহায্য করেছে। বাবা কই?'

'ওপরে।'

ক্যাথি তক্ষুণি ছুটতে চাইলো বাবার ঘরের দিকে। আমি থামালাম ওকে। ফ্যাকাসে মুখটা ধুইয়ে একটু পানি খাওয়ালাম। তারপর আস্তে আস্তে নিয়ে গেলাম মনিবের ঘরে। বাপ মেয়ের এই শেষ সাক্ষাতের দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব

ছিলো না। তার বাবার বিছানার পাশে ক্যাথিকে বসিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম বাইরে। অনেক—অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার যখন ঢুকলাম তখন মেয়ের হাত ধরে শুয়ে আছে আমার মনিব। মুখে পরিতৃপ্তির ভঙ্গি। আর ক্যাথরিনের চেহারায় নীরব হতাশা। মেয়ের মুখটা টেনে নামিয়ে চুমু খেয়ে জীবনের শেষ কথা ক'টা উচ্চারণ করলো এডগার লিনটন:

'তোমার মার সাথে মিলিত হতে চললাম, মা! সময় হলে তুমিও এসো আমাদের কাছে।'

ব্যস। আর নড়লো না সে, কথাও বললো না কোনো।

যতক্ষণ না কাঁদার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল ততক্ষণ কাঁদলো ক্যাথরিন। তারপর থেকে বসে রইলো বাবার পাশে নীরব, পাষাণ প্রতিমার মতো। পরদিন দুপুরের আগে ওকে নড়াতে পারলাম না ওখান থেকে।

এডগার লিনটন মারা যাওয়ার পরদিন সন্ধ্যায় গিমারটন থেকে উকিল মিস্টার গ্রীন এলেন। জানালেন, আইনত এখন থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জের মালিক মিস্টার লিনটন হীথক্লিফ। কিন্তু যেহেতু লিনটন অসুস্থ, নড়াচড়া করতে অক্ষম সেহেতু তার পক্ষ থেকে তার বাবা মিস্টার হীথক্লিফ দখল নেবে গ্র্যাঞ্জের। মিস্টার গ্রীন আরো জানালেন, ইতিমধ্যে হীথক্লিফ তাকে নির্দেশ দিয়েছে যেন আমাকে ছাড়া বাড়ির আর সব চাকর বাকরদের বিদায় ক'রে দেন। আর বলেছে খুব শিগগিরই সে আসবে গ্র্যাঞ্জের দখল নিতে।

মিস্টার গ্রীনের বক্তব্য নীরবে শুনলাম। এছাড়া আর কীই বা করার ছিলো আমার?

দ্রুত সেরে ফেলা হলো এডগারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বাবাকে চির শয়ানে শায়িত করা পর্যন্ত ক্যাথিকে থাকতে দেয়া হলো নিজের বাড়িতে।

অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান যেদিন হলো সেদিনই সন্ধ্যায় ক্যাথি আর আমি বসে আছি লাইব্রেরীতে। এই সময় এলো হীথক্লিফ। আইনত সে এখন গ্র্যাঞ্জের মালিক। মালিকের মতোই এলো সে। কোনোরকম সাড়াশব্দ না দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। আঠারো বছর আগে আমার প্রয়াত মনিব এবং মনিব গিন্নীর অতিথি হিশেবে যে ঘরে ঢুকেছিলো সেই একই ঘরে ঢুকলো আজ মালিক হিশেবে। এই দীর্ঘ সময়ে সামান্যই পরিবর্তন এসেছে ওর চেহারায়। মুখের চামড়া হয়তো একটু কুঁচকেছে, দৈহিক ওজন হয়তো একটু বেড়েছে—এছাড়া সময় তার ওপর আর কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি।

ওকে দেখেই চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো ক্যাথি। অমনি হীথক্লিফ ধরে ফেললো ওর হাত।

'দাঁড়াও!' বজ্রকঠিন স্বরে বললো সে। 'যাচ্ছো কোথায়? তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আশা করি এখন থেকে তুমি পতিব্রতা স্ত্রী

হবে, এবং আমার ছেলেকে আর কখনো বাপের অবাধ্য হতে প্ররোচিত করবে না। তোমার স্বামীকে তুমি পছন্দ করো আর না-ই করো ও এখন তোমার মাথাব্যথা। ওর দেখাশোনা তোমাকেই করতে হবে।'

'এখানেই ও থাকুক না কেন,' আমি বললাম। 'লিনটনকেও পাঠিয়ে দিও।'

শীতল চোখে আমার দিকে তাকালো হীথক্লিফ। আরো শীতল গলায় বললো, 'এ বাড়ি আমি ভাড়া দিয়ে দেবো। তাছাড়া আমার ছেলে মেয়েদের আমি আমার পাশে দেখতে চাই। কই, ক্যাথরিন, তৈরি হও।'

'হ্যাঁ, হচ্ছি,' সরোষে জবাব দিলো ক্যাথি। 'এই পৃথিবীতে একমাত্র লিনটনই আমার ভালোবাসার মানুষ; এবং জানি, ও-ও আমাকে ভালোবাসে। তোমাকে কেউ ভালোবাসে না—তুমি যখন মরবে কেউ তোমার জন্যে দু'ফোঁটা চোখের পানিও ফেলবে না, বুঝলে!'

'আর এক মিনিটও যদি দাঁড়িয়ে থাকো তোমার কপালে দুঃখ আছে!' গর্জে উঠলো ক্যাথির শ্বশুর। 'যাও তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এসো!'

বেরিয়ে গেল ক্যাথি।

'ক্যাথির সঙ্গে আমিও যাই—' অনুনয়ের সুরে শুরু করলাম আমি। ধমকে থামিয়ে দিলো আমাকে হীথক্লিফ।

দেয়ালে পাশাপাশি দুটো ছবি ঝুলছে। একটা ক্যাথরিনের—প্রথম ক্যাথরিনের, আরেকটা এডগারের। ক্যাথরিনের ছবিটা নীরবে দেখলো অনেকক্ষণ সে। তারপর বললো:

'এটা আমি হাইটসে নিয়ে যাবো। ভেবো না ওর কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে এটা দরকার আমার—'

থেমে গেল হীথক্লিফ। ঘুরে তাকিয়ে রইলো আগুনের দিকে। হঠাৎ ক'রেই আবার ফিরলো আমার দিকে।

'কাল রাতে আমি কী করেছি, এলেন, শুনবে? কবর খোঁড়ার লোকটাকে ধরেছিলাম—এডগারের কবর খুঁড়ছিলো ক্যাথির পাশে। লোকটাকে কিছু টাকা দিতেই সে ক্যাথির কবরটাও খুঁড়ে দিলো। বুঝলে, এলেন, কফিনটা খুলেছিলাম আমি। কী দেখেছি জানো? এখনো অবিকল আছে ক্যাথির চেহারা। কী ক'রে এটা সম্ভব হলো জিজ্ঞেস করতে লোকটা বললো, বাতাস লাগেনি বলে এমন হয়েছে। বাতাস লাগলে এত দিনে বিকৃত হয়ে যেতো মুখটা। একথা শুনে কফিনের একটা পাশ আলগা করে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছি আমি —এডগারকে যে পাশে শোয়ানো হয়েছে সে পাশ নয়, অন্য পাশ। কবর খোঁড়ার লোকটাকে আরো টাকা দিয়ে বলেছি, আমি মরার পর ঐ পাশে যেন আমার কবর খোঁড়ে আর ওর কফিনের আলগা পাশটা খুলে শুইয়ে দেয় মাটিতে, আর আমার কফিনের ওপাশটাও যেন খুলে শুইয়ে দেয়। চিরদিনের জন্যে আমরা এক হয়ে যাবো, বুঝলে, এলেন।'

আতঙ্কিত হয়ে আমি শুনছিলাম ওর কথা। ও থামতেই বললাম, 'মৃতদের বিরক্ত

করা খুবই খারাপ কাজ, মিস্টার হীথক্লিফ।'

'আমি কাউকে বিরক্ত করিনি,' রুক্ষ কণ্ঠে বললো সে। 'ও-ই আমাকে বিরক্ত করছে আঠারো বছর ধরে—দিনে রাতে এক মুহূর্ত রেহাই দেয়নি। ও আমার কাছে আসে, এলেন। আমি বুঝতে পারি। দেখতে না পেলেও মাঝে মাঝে পরিষ্কার অনুভব করি ও এসেছে। বেঁচে থেকে যেমন আমাকে কষ্ট দিয়েছে মরে গিয়েও তেমন কষ্ট দিচ্ছে ও আমাকে।'

শান্ত ভাবে কপালের ঘাম মুছলো হীথক্লিফ। আমি ভয়ে চোখ সরিয়ে নিলাম ওর ওপর থেকে। একটু পরে আবার যখন তাকালাম তখন দেখি ক্যাথরিনের ছবিটা যত্নের সঙ্গে নামাচ্ছে ও দেয়াল থেকে।

ক্যাথি ফিরে এলো ছোট্ট একটা পোঁটলায় ওর একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে। আমাকে চুমু খেলো। ওর ঠোঁট দুটো মনে হলো বরফের মতো ঠাণ্ডা।

'আসি, এলেন,' ফিসফিস ক'রে বললো ক্যাথি। 'মাঝে মাঝে এসে দেখে যেও আমাকে।'

'না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো হীথক্লিফ। 'ও কাজটি কক্ষনো করবে না, এলেন। এখানে ভাড়াটেদের দেখাশোনা করবে তুমি। তোমার সাথে কথা বলার ইচ্ছে হলে আমিই আসবো এখানে।'

ক্যাথিকে রওনা হওয়ার ইশারা করলো হীথক্লিফ। এগোলো ক্যাথি দরজার দিকে। ওর পেছন পেছন রওনা হলো ভয়ঙ্কর, দানবীয় মানুষটা।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। যতক্ষণ না গাছ-পালার আড়ালে হারিয়ে গেল দু'জন তাকিয়ে রইলাম এক দৃষ্টিতে।

পরের অনেক—অনেকগুলো মাসের মধ্যে আর আমি দেখিনি আমার ক্যাথিকে। দেখবার আশায় একবার গিয়েছিলাম হাইটসে। কিন্তু জোসেফ ঢুকতে দেয়নি আমাকে। খবরাখবর কালেভদ্রে যা পেতাম গিমারটনে জিল্লার সাথে সাক্ষাৎ হলে ওর কাছ থেকে।

এমনি এক সাক্ষাতে জিল্লার কাছে জানতে পারি, তার ক'দিন আগে মারা গেছে লিনটন। জানতাম ও মারা যাবে; তাই খুব একটা অবাক হইনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী ক'রে মারা গেল?'

'সন্ধ্যার সময় হঠাৎ মিসেস হীথক্লিফ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আমার ঘরে এসে বললো, "তোমার মনিবকে গিয়ে বলো তার ছেলে মারা যাচ্ছে। জলদি যাও!"

'আমি দৌড়ে গিয়ে মিস্টার হীথক্লিফকে জানালাম খবরটা। তারপর দু'জনই ছুটে গেলাম লিনটনের ঘরে। দেখলাম, মিসেস হীথক্লিফ বসে আছে চুপচাপ, হাতদুটো ভাঁজ ক'রে রাখা হাঁটুর ওপর। ওর শ্বশুর এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলো লিনটনের বুকে। কোনো সাড়া পেলো না।

' "এবার, ক্যাথরিন, কেমন লাগছে?" জিজ্ঞেস করলো মনিব।

'নীরব মিসেস হীথক্লিফ।

' "কেমন লাগছে এখন, ক্যাথরিন?' আবার জিজ্ঞেস করলো সে।

' "ও মুক্তি পেয়ে গেছে, আমিও মুক্ত এখন," বললো ক্যাথি। "এখন শায়েস্তা করার জন্যে আমাকেই শুধু পাবে হাতের কাছে।'

' "হ্যাঁ," বললো আমার মনিব। পরদিন ওকে লিনটনের উইল দেখালো সে। লিনটন তার সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান ক'রে গেছে বাবাকে। ক্যাথিকে যেদিন পালাতে সাহায্য করেছিলো সেদিনই হীথক্লিফ ওকে দিয়ে জোর ক'রে লিখিয়ে নিয়েছিলো এ উইল। ক্যাথি এখন কপর্দকশূন্য, পুরোপুরি নির্ভরশীল শ্বশুরের দয়ার ওপর।'

ক্যাথির সংক্ষিপ্ত, অসুখী বিবাহিত জীবন সম্পর্কে এটুকুই জানতে পেরেছিলাম আমি। এখন এই দুনিয়ায় ওর শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

আঠারো

মিসেস ডীনের গল্প শেষ হলো। সেলাইয়ের জিনিসপত্র নিয়ে উঠে গেল সে। আমি উইলিয়াম লকউড বসে রইলাম নির্বাক। যে গল্প মাত্র শুনে শেষ করেছি তার প্রতিক্রিয়া হজম ক'রে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়!

গল্প বলার ক্ষমতা অসাধারণ এলেন ডীনের। এ কাহিনীর অনেক পাত্রপাত্রীকেই আমি দেখিনি, আমি এখানে আসার বহুদিন আগে তারা মারা গেছে। তবু তাদেরকে একেবারে জীবন্ত ক'রে আমার মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছে মহিলা। যেন ইয়র্কশায়ার মুরের সেই বিষণ্ণ চরিত্রগুলো, তাদের জীবন, তাদের আচার আচরণ, চলাফেরা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এমন কি তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পেয়েছি।

ক্যাথরিন আর্নশকে আমি দেখিনি, দেখিনি এডগার লিনটনকে, ইসাবেলা লিনটন বা লিনটন হীথক্লিফকেও দেখিনি; কিন্তু ক্যাথরিন আর এডগারের মেয়েকে আমি দেখেছি, ওর সাথে কথা বলেছি; কথা বলেছি হীথক্লিফের সাথেও! পাঠক, কল্পনা করুন, হেয়ারটন আর্নশর সঙ্গে একই টেবিলে বসে খেয়েছি আমি সেই পুরনো ধূসর বাড়িতে, যে বাড়ির পটভূমিতে ঘটেছে এই চমকপ্রদ গল্পের ঘটনারাশি।

কিন্তু এ গল্পের শেষ কোথায়? মিসেস ডীনের জবানীতে এতক্ষণ যা আপনাদের শুনিয়েছি এর অতিরিক্ত কি কিছু নেই?

আছে। সব গল্পের মতো এ গল্পেরও শেষ আছে। এবং অদ্ভুত হলেও সত্যি, এই শেষটা মিলনান্তক। শুনুন তাহলে:

পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে থাকতে এসেছিলাম ১৮০১ সালের শীতকালে। ইচ্ছা ছিলো দু'বছর থাকবো ওখানে। কিন্তু শীত শেষ হওয়ার আগেই এমন এক জরুরি কাজ পড়লো যে ইয়র্কশায়ারের মুর এলাকা থেকে বসত গুটিয়ে আমাকে চলে যেতে হলো লণ্ডনে। পরের বছর অর্থাৎ ১৮০২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রইলাম সেখানে। ইয়র্কশায়ারে ফেরার ফুরসত আর হলো না। এই সময় হঠাৎ ক'রেই এক বন্ধুর আমন্ত্রণে লণ্ডন ছেড়ে যেতে হলো উত্তরে।

বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার পথে একদিন নিজের অজান্তেই পৌঁছে গেলাম গিমারটনের পনর মাইলের মধ্যে। পথপাশের এক সরাইখানার সহিস বালতিতে ক'রে পানি খাওয়াচ্ছিলো আমার ঘোড়াটাকে। কাছেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আমি। হঠাৎ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটা শস্য বোঝাই টানা গাড়ি দেখিয়ে মন্তব্য করলো সহিস:

'গিমারটনে যাচ্ছে। ওরা সব সময় তিন সপ্তাহ দেরি করে ফসল কাটতে।'

চমকে উঠলাম আমি। 'গিমারটন! কতদূর এখান থেকে?'

'ঐ পাহাড়ের ও পাশে। চোদ্দ মাইল মতো এখান থেকে।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক এক আবেগ ভর করলো আমার ওপর—গ্র্যাঞ্জে যাবো। এখনো আমি ভাড়াটে ওবাড়ির, সুতরাং যেতে অসুবিধা নেই কোনো। আসছে রাতটা সরাইখানায় না কাটিয়ে নিজের বাসায় কাটাবো ভেবে তক্ষুণি রওনা হলাম।

ঘণ্টা তিনেকের মাথায় পৌঁছে গেলাম গ্র্যাঞ্জে। করাঘাত করলাম সামনের দরজায়। কেউ এলো না দরজা খুলতে। বাড়িতে যে কেউ আছে তেমনও মনে হলো না, যদিও দেখতে পাচ্ছি রান্নাঘরের চিমনি থেকে নীলচে ধোঁয়ার সরু একটা রেখা পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে আকাশে। ঘোড়ায় চেপে বাড়ির পেছন দিককার উঠানে গেলাম। এক বৃদ্ধাকে দেখলাম বসে আছে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে।

'মিসেস ডীন আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। ও তো এখন হাইটসে থাকে। আমিই আপাতত দেখাশোনা করি এবাড়ির।'

'ও। আমি মিস্টার লকউড—ভাড়াটে এবাড়ির। আজ রাতটা থাকবো আমি এখানে।'

বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকালো মহিলা।

'আপনি আসছেন জানতাম না তো, স্যার,' ঢোক গিলে বললো সে। 'আসুন, ভেতরে আসুন; আমি আপনার ঘর গোছগাছ ক'রে দিচ্ছি।'

তড়বড়িয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো সে। আমি এগোলাম পেছন পেছন। বসার ঘরে গিয়ে বসলাম কিছুক্ষণ। তারপর মনে হলো, খাবার তৈরি করতে তো কিছুক্ষণ লাগবে, এই ফাঁকে ওয়াদারিং হাইটসে গিয়ে এলেন ডীনের সাথে দেখা

ক'রে আসি না কেন।

যখন রওনা হলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আর ক্যাথরিন আর্নশকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সেই গোরস্থানের কাছে যখন পৌঁছুলাম তখন চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। গির্জার কাছেই রাস্তার ওপর দেখলাম একটা ছোট ছেলে ভয়ার্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। একটা ভেড়া আর দুটো ভেড়ার বাচ্চা তারই মতো ভয়ার্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তার গা ঘেঁষে।

'কী হয়েছে, খোকা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হীথক্লিফ আর এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে,' কান্না না থামিয়েই বললো ছেলেটা। 'ঐ যে ওখানে। ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে সাহস হচ্ছে না আমার।'

চারদিকে তাকিয়ে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। কী দেখে ছেলেটা এত ভয় পেয়েছে তা-ও বুঝতে পারলাম না। ছেলেটাকে রাস্তার নিচে নেমে ঘুরে যেতে বলে নিজের পথে রওনা হয়ে গেলাম আমি।

হাইটসে যখন পৌঁছুলাম তখন চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সবকিছু। ফটক টপকানোর বা ধাক্কা দেয়ার কোনো প্রয়োজন পড়লো না। ফুলের মৃদু সৌরভে সুবাসিত বাগানের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম বাড়ির দিকে।

সব দরজা এবং জানালা খোলা হাট ক'রে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে শুনতে পেলাম দুটো গলা। একজন বলছে: 'কন-ট্রা-রি!' রুপোর ঘণ্টার মতো মিষ্টি টুংটুঙে গলাটা। 'এভাবে উচ্চারণ করতে হবে। আর কিন্তু আমি বলতে পারবো না, মনে থাকে যেন—নইলে আমি তোমার চুল টেনে দেবো!'

'কন-ট্রা-রি,' জবাব দিলো অন্য একটা গলা—এটা পুরুষের। 'ঠিক হয়েছে না? তাহলে চুমু খাও আমাকে। কী সুন্দর মনে রেখেছি!'

মনে হচ্ছে আমার এই ক'মাসের অনুপস্থিতিতে নাটকীয় কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে ওয়াদারিং হাইটসে। একটা খোলা জানালার সামনে গিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। এক তরুণ—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুদর্শন সুবেশী—বসে আছে টেবিলে, সামনে বই। হেয়ারটন আর্নশকে চিনতে পেরে চমকে উঠলাম আমি। ওর পাশে ওর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। ক্যাথরিন—ছোট ক্যাথরিন। ওর মুখে রুক্ষতার লেশমাত্র নেই এখন। চেহারাও অনেক সুন্দর মনে হচ্ছে। হেয়ারটনকে পড়তে শেখাচ্ছে সে। এবং, দেখেই বুঝলাম দু'জন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দু'জনের। এখানে আর না দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দরজার দিকে এগোলাম আমি।

বাইরে চাঁদের আলোয় বসে আছে এলেন ডীন। আনমনে গান গাইছে গুনগুন ক'রে। আমাকে দেখেই চিনতে পারলো সে। উঠে দাঁড়ালো লাফ দিয়ে।

'মিস্টার লকউড!' চিৎকার ক'রে উঠলো মহিলা। 'আগে থাকতে জানাননি, কেন আপনি আসছেন?'

'আসছি এটা যে নিজেও জানতাম না,' আমি বললাম। 'কেমন আছো, মিসেস ডীন? আর কী আশ্চর্য, দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে!'

'আপনি লণ্ডন চলে যাওয়ার ক'দিন পরেই হীথক্লিফ জিল্লাকে বিদায় ক'রে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালো। ক্যাথির কথা ভেবে আপত্তি করিনি আসতে।'

'তোমার মনিবের সাথে দেখা করতে চাই আমি। কাজ আছে।'

'কী কাজ?' আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলো মিসেস ডীন।

'গ্র্যাঞ্জের ভাড়ার ব্যাপারটা ফয়সালা ক'রে ফেলতে চাই।'

'সেটা আমার সাথেই করতে পারবেন। মিসেস হীথক্লিফের বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেক কাজ আমিই করে থাকি আজকাল।'

চোখ বড় বড় ক'রে তাকালাম আমি তার দিকে। বলে কী মহিলা!

'বুঝেছি!' আমার বিস্মিত চাউনি দেখে বললো মিসেস ডীন, 'হীথক্লিফের মারা যাওয়ার খবর আপনি শোনেননি!'

ঢোক গিললাম আমি। মনে পড়ে গেল গির্জার পাশে দেখা ছেলেটার কথা, যে বলছিলো হীথক্লিফ আর এক মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে…

শীতল এক কাঁপুনি নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'হীথক্লিফ মারা গেছে! কতদিন আগে?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

'তিন মাস। আপনি বসুন, বলছি কী ঘটেছিলো। সন্ধ্যায় কিছু খেয়েছেন, মিস্টার লকউড?'

'দরকার নেই খাওয়ার,' অস্থিরভাবে বললাম আমি, 'বাসায় রাঁধতে বলে এসেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি ও এত তাড়াতাড়ি মারা যাবে। বলো তো, কী ঘটেছিলো।'

সোফায় বসলো এলেন ডীন। শোনাতে শুরু করলো গল্পের শেষটা।

উনিশ

বড় শোচনীয়ভাবে মারা গেছে হীথক্লিফ।

আপনি তো লণ্ডন চলে গেলেন। ক'দিন পরেই এক লোককে পাঠালো সে গ্র্যাঞ্জে আমাকে হাইটসে আসার নির্দেশ দিয়ে। খুশিমনেই আমি পালন করলাম এ নির্দেশ—আর কিছু না, শুধু ক্যাথির কথা ভেবে। আমার উপস্থিতি ক্যাথির মনটাকে যদি একটুও ভালো ক'রে তোলে সে-ও কম নয় আমার জন্যে। সেদিনই চলে এলাম আমি। আমার ব্যাপারে কেন মত বদলেছে, সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দিলো না হীথক্লিফ। শুধু বললো, ওর মনে হয়েছে আমার এখন হাইটসে আসা দরকার, তাই ডেকে পাঠিয়েছে। সারাদিন ক্যাথরিনের কাজ করা দেখতে দেখতে

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। আরো বললো, লিনটন যখন চলে গেছে তখন জিন্নার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

ক্যাথি খুবই খুশি হলো আমাকে পেয়ে। আস্তে আস্তে আমি ওর সব প্রিয় বই আর অন্যান্য জিনিসপত্র হীথক্লিফের চোখ এড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা করলাম গ্র্যাঞ্জ থেকে।

এই সব পুরনো বন্ধুদের পেয়ে প্রথম কিছু দিন বেশ আনন্দেই কাটলো ক্যাথির। তারপর আবার আগের মতো—একঘেয়েমীতে, নিঃসঙ্গতায়, অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করলো। বাড়ির বাইরে একমাত্র বাগানে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিলো ওর; আর কোথাও নয়। আর আমাকে বেশিরভাগ সময়ই ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো (আসলে কোনো না কোনো ভাবে আমাকে ব্যস্ত রাখতো হীথক্লিফ) বলে আমি ওকে বিশেষ সঙ্গও দিতে পারতাম না।

কিছু দিন পর লক্ষ করলাম ক্যাথি যেন একটু একটু হেয়ারটনের দিকে ঝুঁকছে, আগ্রহ দেখাচ্ছে ওর প্রতি।

'আমি রান্নাঘরে থাকলে কেন হেয়ারটন একটাও কথা বলে না আমি বুঝতে পেরেছি,' একদিন বললো ক্যাথি।

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ও ভাবে ওর বিচ্ছিরি কথা শুনে হেসে উঠবো আমি। ঠিক বলেছি না, এলেন? একবার ও নিজে নিজে পড়া শেখার চেষ্টা করেছিলো—তুমি তখনও আসোনি। আমি দেখে ফেলে এমন হাসা হেসেছিলাম যে ও অপমানে তক্ষুণি বই পুড়িয়ে ফেলেছিলো। বোকা ছাড়া কেউ অমন করে?'

'বুঝলাম, ও বোকার মতো কাজ করেছিলো,' বললাম আমি, 'কিন্তু তোমার কাজটা কেমন হয়েছিলো? ভদ্রলোকের মতো যে হয়নি তা বুঝতে পারছো?'

'পা—পারছি,' আমতা আমতা করে বললো ক্যাথি।

'ও তোমার মামার ছেলে। ওর সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত তোমার। ও অশিক্ষিত, গোঁয়ার এটা ওর জন্যে যেমন লজ্জার তোমার জন্যেও তেমনি লজ্জার।'

'হয়েছে, এলেন, আর বোকো না; এখন থেকে আমি ভালো ব্যবহার করবো ওর সাথে।'

এতদিন হেয়ারটনকে সহ্যই করতে পারতো না ক্যাথি ওর নোংরা চেহারা, গোঁয়ারের মতো ভাবভঙ্গি আর হীথক্লিফের প্রতি পরম বিশ্বস্ততার কারণে। সম্ভবত নিঃসঙ্গতাই ছেলেটার প্রতি আগ্রহী ক'রে তুলেছে ক্যাথিকে। আমার মনে হলো, দু'জনের যদি ভাব হয় ব্যাপারটা খারাপ হবে না ওদের জন্যে। হীথক্লিফের রূঢ় আচরণের বিপরীতে ওদের কিছুটা হলেও শান্তির উৎস থাকবে। ঠিক করলাম দু'জনের মধ্যে যাতে সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সে চেষ্টা করবো আমি।

ক'দিন পরে ইস্টার সোমবার। বিকেলে কয়েকটা গরু নিয়ে গিমারটনের

মেলায় গেছে জোসেফ। হীথক্লিফও বাইরে। আমরা বাকিরা রয়েছি বাড়িতে। হেয়ারটন যথারীতি বসার ঘরে চিমনির কোণে বসে আছে চুপচাপ। ক্যাথি মনের আনন্দে জানালার কাচে ছবি আঁকছে আঙুল দিয়ে। আর আমি কাজ করছি রান্নাঘরে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকাচ্ছি দু'জনের দিকে।

অবশেষে শুনলাম ক্যাথি কথা বলছে হেয়ারটনের সাথে।

'হেয়ারটন,' বললো ও, 'ভেবে চিন্তে দেখলাম—আমি আসলে তোমাকে পছন্দই করি।'

হেয়ারটন কিছু বললো না, তাকালোও না ক্যাথির দিকে।

'শুনতে পাচ্ছো আমার কথা, হেয়ারটন?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাথি।

এবার আর নির্বিকার রইলো না হেয়ারটন। হিংস্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জাহান্নামে যাও! ভাগো আমার সামনে থেকে! মস্করা করার আর লোক পাচ্ছো না?'

'না,' নরম ক'রে বললো ক্যাথি। 'না, হেয়ারটন, মস্করা করছি না। আগে হয় তো করেছি, কিন্তু আর কখনো করবো না। তুমি জানো তুমি আমার মামাতো ভাই। আমাদের ভেতর ভালো সম্পর্ক থাকা উচিত।'

'তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আমি রাখতেই চাই না!' আবার চেঁচালো হেয়ারটন।

আমার মনে হলো এবার আমার নাক গলানো উচিত। রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে বললাম, 'ক্যাথি তোমার ফুপাতো বোন, মিস্টার হেয়ারটন। ওর সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত তোমার। ওকে বন্ধু হিশেবে পেলে তোমার জীবনটাই পাল্টে যাবে!'

'বন্ধু হিশেবে পেলে!' পাল্টা চিৎকার করলো হেয়ারটন। 'চেষ্টা করিনি ভেবেছো? ওর সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করতে গিয়ে কতবার যে হীথক্লিফের ধমক খেয়েছি! আর ও কী করেছে?—শুধু বিদ্রূপ করেছে আর মেজাজ দেখিয়েছে!'

'মাফ ক'রে দাও আমাকে, হেয়ারটন,' নরম ক'রে বললো ক্যাথি। 'তোমার সাথে অমন করেছি বলে সত্যিই এখন আমার দুঃখ হয়, লজ্জা হয়।'

দরজা দিয়ে উঁকি মেরে আমি দেখলাম পায়ে পায়ে হেয়ারটনের কাছে এগিয়ে গেল ক্যাথি। হাত রাখলো ওর কাঁধে। ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিলো হেয়ারটন। কিন্তু রেগে গেল না ক্যাথি। আবার ও হাত রাখলো হেয়ারটনের কাঁধে। এবার আর কিছু বললো না ছেলেটা।

এক ঘণ্টা পরে আবার যখন আমি তাকালাম, তখন ওরা পাশাপাশি বসে, সামনে বই। হেয়ারটনকে পড়াচ্ছে ক্যাথি।

সে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর যখন ক্যাথিকে নিয়ে ওপরে যাচ্ছি, শুনলাম নিজের মনে গান গাইছে ও গুন গুন ক'রে।

*

পরদিন সকালে আমার আগেই নিচে নামলো ক্যাথি। সোজা চলে গেল বাগানে। আমি নাশতা তৈরি ক'রে ওদের ডাকতে গিয়ে দেখি বিরাট একটা জায়গা ক্যাথির নির্দেশ মতো পরিষ্কার করছে হেয়ারটন। কারান্ট্-ঝোপ (আঙুর জাতীয় ফল) ছিল ওখানে। সেগুলো উপড়ে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলছে হেয়ারটন। আর মগ্ন হয়ে আলাপ করছে ক্যাথির সাথে ওদের নতুন ফুলবাগানটা কেমন ভাবে সাজাবে তা নিয়ে।

মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ওরা যা করেছে, দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। কারান্ট্-ঝোপগুলো জোসেফের একাধারে অহঙ্কার এবং আনন্দ। আর কিনা তারই মাঝখানে ফুলবাগান করার ইচ্ছা হয়েছে ক্যাথির! আমি হাঁ হাঁ করতে করতে ছুটে গিয়ে চিৎকার করলাম, 'করেছো কী, হেয়ারটন! জোসেফ টের পাওয়া মাত্র তো মনিবকে ডেকে দেখাবে তোমার কীর্তি। কী কৈফিয়ত দেবে তুমি তখন? আ-হা! তোমার জন্যে আমরা সবাই শাস্তি পাবো! ক্যাথি বললো, আর তুমি একাজ করলে?'

'একদম মনে ছিলো না এগুলো জোসেফের,' হাসতে হাসতে বললো হেয়ারটন। 'যাক, কী আর করা; যা ক'রে ফেলেছি ক'রে ফেলেছি। যদি নালিশ দেয় তো বলবো বুদ্ধিটা আমার।'

ওরা ঘরে এসে নাশতা ক'রে নিলো। দুপুর পর্যন্ত কিছু ঘটলো না। তখন এবাড়ির নিয়ম ছিলো দুপুরে সবাই হীথক্লিফের সঙ্গে এক সাথে বসে খেতাম। আমিও বসতাম টেবিলে। ক্যাথি সাধারণত আমার পাশে বসতো। কিন্তু এদিন ও বসলো হেয়ারটনের পাশে।

হীথক্লিফ আসার পর সবাই নীরবে খাওয়া শুরু করলাম।

হীথক্লিফের সামনে ক্যাথির সঙ্গে কথা বলার সাহস পেলো না হেয়ারটন। সচরাচর ক্যাথি কোনো কথা বলে না এসময়। আজও বললো না। তবে দৃষ্টি দিয়ে, নাক কুঁচকে, মুখ ভেঙচে ও হাসানোর চেষ্টা করতে লাগলো হেয়ারটনকে। হেয়ারটন গম্ভীর থাকার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও শেষ পর্যন্ত আর পারলো না। হেসে ফেললো শব্দ ক'রে। বিজয়ের আনন্দে হেসে ফেললো ক্যাথিও। মুখ তুললো হীথক্লিফ। আগুন ঝরা চোখে তাকাতে লাগলো একবার ক্যাথির দিকে একবার হেয়ারটনের দিকে।

'কপাল ভালো আমার হাতের বাইরে রয়েছো তুমি,' অবশেষে ক্যাথির উদ্দেশ্যে বললো সে। 'অমন ক'রে তাকিয়ে আছো কেন আমার দিকে? নামাও চোখ। ভেবেছিলাম চিরতরে তোমার মুখের হাসি আমি নিভিয়ে দিতে পেরেছি!'

'দোষটা আমার,' বিড় বিড় ক'রে বললো হেয়ারটন।

'কী বললি?' গর্জে উঠলো হীথক্লিফ।

হেয়ারটন আর কিছু বললো না। মুখ নিচু ক'রে থালার দিকে তাকালো।

খাওয়া প্রায় শেষ আমাদের। এই সময় দরজায় ঝড়ের মতো উদয় হলো

জোসেফ। রাগে লাল ওর মুখ।

'আমার দেনা পাওনা সব চুকিয়ে দিন, আমি আর থাকবো না এখানে!' ফেটে পড়লো সে। 'ষাট বছর ধরে কাজ করছি এবাড়িতে, চেয়েছিলাম মরবোও এখানে। কিন্তু তা আর বোধহয় হলো না। ভেবেছিলাম আমার বইপত্র সব আমার ঘরে নিয়ে যাবো, রান্নাঘরটা ছেড়ে দেবো ওদের—এটুকু করতেও কম কষ্ট হতো না আমার। সন্ধ্যাটা এখানে আগুনের সামনে বসে কাটাতে ভালো লাগে আমার। তবু ওদের কথা ভেবে কষ্টটুকু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও আমার বাগানটাও নিয়ে নেবে! এটা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বললো হীথক্লিফ, 'থামো! হয়েছে কী? তোমার আর নেলির কোনো ঝগড়ায় আমি নাক গলাবো ভেবে থাকলে ভুল করেছো।'

'নেলির কথা বলছি না,' জবাব দিলো জোসেফ। 'বলছি ঐ খুদে শয়তানীটার কথা। মার মতোই বদ। আমাদের ছেলেটাকে জাদু করেছে ও। ওর সুন্দর চোখ দেখিয়ে আর সুন্দর সুন্দর কথা বলে ভুলিয়েছে ওকে, ওর প্রেমে পড়তে বাধ্য করেছে। আমি যে এতকিছু করলাম সব ভুলে ঐ মেয়ের কথায় ছোঁড়া আমার বাগানের কারান্ট্-ঝোপের পুরো একটা সারি উপড়ে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে!'

'বুড়ো হাবড়াটা মদ খেয়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো হীথক্লিফ। 'হেয়ারটনের দোষ ধরছে! কী করেছিস, হেয়ারটন?'

'ওর দু'তিনটে ঝোপ তুলে ফেলেছি। আবার লাগিয়ে দেবো—'

'কেন তুলেছিস?' জানতে চাইলো হীথক্লিফ।

'আমি বলেছি তুলতে,' বলে উঠলো ক্যাথি। 'ওখানে আমরা ফুলগাছ লাগাবো।'

'আচ্ছা!' সক্রোধে বললো হীথক্লিফ। 'তা এ কাজের অনুমতি কে দিয়েছে তোমাকে? আর—,' হেয়ারটনের দিকে ফিরলো সে, 'তোকেই বা ওর কথা শুনতে বলেছে কে?'

'ফুলগাছ লাগানোর জন্যে মোটে কয়েক গজ জমি নিয়েছি তাতেই এই অবস্থা তোমার?' হীথক্লিফের অগ্নিদৃষ্টি তাকেই ফিরিয়ে দিলো ক্যাথি। 'আর তুমি যে আমার সব জমি কেড়ে নিয়েছো!'

'তোর জমি! ডাইনী! তোর কোনো জমি কোনোদিন ছিলো না! ছিলো তোর বাপের, পরে তোর স্বামীর!'

'শুধু জমি নয়, আমার সব টাকাও তুমি নিয়েছো,' বললো ক্যাথি।

'চুপ!' গর্জে উঠলো হীথক্লিফ। 'দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে!'

'হেয়ারটনের জমি আর টাকাও নিয়েছো,' বলে চললো বেপরোয়া হয়ে ওঠা মেয়েটা। 'হেয়ারটন আর আমি এখন বন্ধু। তোমার সব কুকীর্তির কথা ওকে আমি বলবো!'

আর সহ্য করতে পারলো না হীথক্লিফ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চুলের মুঠি ধরলো ক্যাথির। লাফ দিলো হেয়ারটনও। হীথক্লিফের হাত থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো ক্যাথিকে।

'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও ওকে!' মিনতি ভরা কণ্ঠে বলতে লাগলো সে।

হীথক্লিফের কালো চোখ দুটো জ্বলছে প্রচণ্ড আক্রোশে। ভয় পেয়ে গেলাম আমি, ক্যাথিকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে দানবটা! চুল ছেড়ে ক্যাথির হাত ধরলো হীথক্লিফ। এই সময় ক্যাথির মুখের দিকে চোখ পড়লো ওর। তারপরই ঘটলো আশ্চর্য ঘটনাটা! সভয়ে ক্যাথির হাত ছেড়ে দিয়ে চোখ ঢাকলো হীথক্লিফ।

বেশ কিছুক্ষণ লাগলো ওর নিজেকে সামলাতে, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সুস্থির হতে। তারপর আবার ফিরলো ক্যাথির দিকে। জোর ক'রে গলায় শান্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে বললো, 'আর কখনো আমাকে রাগাবে না এমন। রাগালে সত্যিই বলছি একদিন তোমাকে খুন করবো আমি। যাও! দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। আর হেয়ারটনকে যদি কখনো দেখি তোমার কথা শুনতে সঙ্গে সঙ্গে ওকে আমি দূর ক'রে দেবো এবাড়ি থেকে। তোমার ভালোবাসা ওকে ভিখিরি ক'রে ছাড়বে—যাতে ছাড়ে সেটা আমি দেখবো। নেলি, ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে। তোমরা সবাই যাও!'

ক্যাথিকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। হেয়ারটনও এলো পেছনে পেছন। বাকি দিনটা থমথমে হয়ে রইলো সারাবাড়ি। সন্ধ্যায় খাওয়ার সময়ও এক অবস্থা। চুপচাপ খেয়ে গেল সবাই, কেউ কোনো কথা বললো না। খাওয়ার পরপরই বেরিয়ে গেল হীথক্লিফ।

দুই নতুন বন্ধু—হেয়ারটন আর ক্যাথি বসলো আগুনের সামনে। ক্যাথি হেয়ারটনকে বলতে চাইলো কী ক'রে হীথক্লিফ ওর বাবাকে নিঃস্ব করেছে। হেয়ারটন শুনতে রাজি হলো না। রেগে গেল ক্যাথি। হেয়ারটন বোঝানোর চেষ্টা করলো কেন ও শুনতে চায় না ওসব কথা। বললো; 'আমি যদি তোমার বাবার নামে তোমার সামনে আজেবাজে কথা বলি কেমন লাগবে তোমার?'

এবার বুঝতে পারলো ক্যাথি, হীথক্লিফকে হেয়ারটন বাবার মতো দেখে। ওর এই অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার কোনো অধিকার নেই তার।

এই সামান্য কথা কাটাকাটি শেষে আবার দু'জন বন্ধু হয়ে গেল। হেয়ারটনকে পড়াতে শুরু করলো ক্যাথি। আমি হাতের কাজ শেষ ক'রে গিয়ে বসলাম ওদের কাছে। ওদেরকে আমারই সন্তান মনে হতে লাগলো। ক্যাথি আমার অনেক দিনের গর্ব। আজকের যে ক্যাথি সে তো আমারই সৃষ্টি। ওর মা ওকে জন্ম দিয়েছে বটে, কিন্তু ওকে মানুষ করেছি আমি। আর হেয়ারটনও যে শিগগিরই গর্ব করার মতো একজন হয়ে উঠবে অন্তত সন্দেহ নেই। যে হেয়ারটন আমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো বা ক'দিন আগে যে হেয়ারটনকে এই টেবিলেই বসে থাকতে দেখেছি তার সঙ্গে আজকের হেয়ারটনের পার্থক্য অনেক।

আচমকা ঘরে ঢুকলো হীথক্লিফ। দু'বন্ধু এক সাথে মুখ তুললো। দু'জনের চোখের দিকে তাকালাম আমি। আশ্চর্য! হুবহু এক দু'জোড়া চোখ এবং হুবহু ক্যাথরিন আর্নশর চোখ দুটোর মতো। আমার মনে হয় এই সত্যটাই বিচলিত ক'রে তুলেছে হীথক্লিফকে! ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। হেয়ারটনের সামনে থেকে বইটা তুলে নিয়ে দেখলো। কোনো কথা না বলে নামিয়ে রাখলো আবার যেখানে ছিলো সেখানে। তারপর বেরিয়ে যেতে বললো দু'জনকেই। আমিও উঠলাম ওদের পেছন পেছন চলে যাওয়ার জন্যে।

'তুমি থাকো, নেলি,' বললো হীথক্লিফ।

বসলাম আমি আবার।

'শেষটা বড় করুণ তাই না, নেলি?' বলে চললো সে। 'আমার সব চেষ্টার এই করুণ পরিণতি হবে ভাবতে পারিনি। আমার সব পুরনো শত্রুরা আমাকে প্রায় শেষ ক'রে দিয়েছে। তবে আমি ঘাবড়াইনি। এখনও আমি পারি ওদের শেষ ক'রে দিতে। পারি, সত্যি বলছি পারি। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু কী লাভ? আমার আর ইচ্ছে ক'রে না। ধ্বংস দেখে আনন্দ পাওয়ার সে ক্ষমতা আমি হারিয়েছি। অকারণে ধ্বংস করতে আর ইচ্ছে ক'রে না আমার।

'নেলি, আমি টের পাচ্ছি, অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটছে আমার ভেতর। পৃথিবীর কোনো কিছুর কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাই না। খাওয়া ঘুমানোর কথা মনে পড়ে কি পড়ে না। ঐ দু'জন সারাক্ষণ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েটার কথা বলতে চাই না। ওর কথা ভাবতেও চাই না আমি। কিন্তু ছেলেটা—আমার ক্যাথির সঙ্গে ওর চেহারার মিল সব সময় আমাকে ক্যাথির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ বাড়ির যে কোনো জিনিসের দিকে তাকাই না কেন ক্যাথির মুখ ছাড়া কিছু দেখতে পাই না আমি। ও যেন ঘিরে রেখেছে আমাকে। যেখানে যাই, যেদিকে তাকাই সব খানেই ওর স্মৃতি, সব যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে ও এখানে ছিলো, আমি হারিয়েছি ওকে। হেয়ারটনের মুখটা আমার ক্যাথির প্রেতাত্মা!'

'তোমার কি শরীর খারাপ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, নেলি, না। এ অন্য ব্যাপার।'

'মৃত্যুর কথা ভেবে ভয় পাচ্ছো?'

'ভয়!' হা-হা ক'রে হাসলো সে। 'না, নেলি, আমি কামনা করছি মৃত্যুকে। দীর্ঘদিন ধরে আমি কামনা করছি মৃত্যুকে—ও মারা যাওয়ার পর থেকেই। ওহ, এজীবন যদি এখনই শেষ হয়ে যেতো, ওর কাছে চলে যেতে পারতাম!'

চুপ হয়ে গেল হীথক্লিফ। পায়চারি করতে লাগলো ঘরের এমাথা ওমাথা। আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কিন্তু ও আর কিছু বললো না। পায়চারি করে চললো। আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

এরপর বেশ কিছু দিন খাওয়ার সময়গুলোতে হীথক্লিফকে দেখলাম না আমরা।

বিশ

এক রাতে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর শব্দ শুনে বুঝলাম ও বেরিয়ে গেল। সারা রাতে ফিরলো না। সকালে নিচে নেমে দেখি তখনো ফেরেনি।

তখন এপ্রিল মাস। আবহাওয়া চমৎকার উষ্ণ। সকালে নাশতার পর ক্যাথির পীড়াপীড়িতে আমি গিয়ে বসেছি বাগানের প্রান্তে এক গাছের ছায়ায়। হেয়ারটন মাটি কোপাচ্ছে ওদের নতুন বাগানের। আর ক্যাথি ফটকের ওদিকে গেছে কিছু প্রিমরোজের শিকড় আনতে। হঠাৎ দেখি ছুটতে ছুটতে আসছে ও।

'কী হয়েছে, ক্যাথি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হীথক্লিফ আসছে। আমাকে দেখেই বললো সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে। বেশ উত্তেজিত মনে হলো ওকে।'

'রাতে বেড়িয়ে বোধ হয় মন ভালো হয়েছে।'

বলে আমি উঠে ঘরে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই দরজায় এসে দাঁড়ালো সে।

'নাশতা দেবো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মাথা নাড়লো হীথক্লিফ। 'আমার খিদে লাগেনি।'

আমার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে। আমার পাশ কাটাচ্ছে যখন তখন লক্ষ করলাম অত্যন্ত দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে ওর।

'নির্ঘাৎ অসুস্থ,' ভাবলাম আমি। 'এখনো যদি না হয়ে থাকে শিগগিরই হবে। কোথায়, কী করছিলো ও?'

সেদিন দুপুরে আমাদের সঙ্গে খেতে বসলো হীথক্লিফ। চামচ কাঁটা তুলে নিয়ে খাবারের দিকে তাকালো। পর মুহূর্তে জমে গেল যেন। কয়েক সেকেণ্ড এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো খাবারের দিকে। তারপর চামচ কাঁটা নামিয়ে রেখে উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। জানালা দিয়ে দেখলাম পায়চারি করছে বাগানে।

ঘণ্টা দুয়েক পর আবার ভেতরে এলো হীথক্লিফ।

'ব্যাপার কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? দুপুরে তো না খেয়েই উঠে গেলে। এখন খাবে?'

'না, রাতে দেখবো।'

'কাল রাতে কোথায় ছিলে? নিছক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করছি না। তোমাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে—'

'নিছক কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞেস করছো তুমি,' আমাকে শেষ করতে না দিয়ে হেসে উঠে সে বললো। 'তবু বলছি; কাল রাতে আমি নরকের একেবারে প্রান্তে পৌঁছে গেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের দেখা পাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি

আমি। খুব কাছে। তুমি যাও। হেয়ারটন আর ঐ মেয়েটাকে বলে দিও যেন আমার সামনে না আসে। আমাকে যদি বিরক্ত না করো ভয় পাওয়ার মতো কিছু দেখবে না বা শুনবে না তোমরা আমার কাছ থেকে।'

ভেতরের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো সে। সারা দিনে একবারও বেরোলো না ওখান থেকে।

সেদিনই রাত আটটার দিকে বাতি জ্বেলে নিয়ে আমি ঢুকলাম সেই ঘরে।

খোলা একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। দৃষ্টি প্রসারিত বাইরে অন্ধকারের দিকে। আমি ঢুকেছি এটা যে টের পেয়েছে এমন কোনো লক্ষণ দেখলাম না তার ভাবভঙ্গিতে।

'জানালাটা বন্ধ ক'রে দেবো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ঘুরে দাঁড়ালো হীথক্লিফ। আলো পড়লো ওর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে চমকে উঠলাম আমি। অদ্ভুত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখটা। ক্রূর এক হাসি ধরা সে মুখে। কালো চোখ জোড়ায় জান্তব দৃষ্টি। এক মুহূর্ত আমার মনে হলো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ও হীথক্লিফ নয়, কোনো প্রেতাত্মা!

আমাকে দেখে ওর দৃষ্টি নরম হয়ে এলো। আস্তে আস্তে বললো, 'ঠিক আছে, দাও বন্ধ ক'রে। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। সকালের আগে কিছু খাবো না।'

পরদিন সকালে যথারীতি আমি নাশতা তৈরি করলাম। হেয়ারটন আর ক্যাথরিন বাগানে গাছতলায় খাবে ঠিক করেছে, তাই ছোট একটা টেবিলে ওদের নাশতা সাজিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ফিরে দেখি হীথক্লিফ দাঁড়িয়ে কথা বলছে জোসেফের সঙ্গে। চাষবাসের ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দিয়ে ও বসলো। এক কাপ কফি এগিয়ে দিলাম আমি। ও দেখতেই পেলো না। উল্টোদিকের দেয়ালে কী যেন খুঁজছে ওর অস্থির চোখ জোড়া।

'কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে,' আমি বললাম।

আমার কথা যেন শুনতেই পেলো না ও।

'মিস্টার হীথক্লিফ, ওভাবে তাকিয়ে থেকো না!' আমি চিৎকার করলাম।

'চেঁচিও না,' হীথক্লিফ বললো। 'ঘরে আমরাই শুধু আছি তো?'

'হ্যাঁ।'

এবার ও টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসলো। খেয়াল করলাম দেয়ালের দিকে আর তাকাচ্ছে না এখন। তাকিয়ে আছে ওর কয়েক গজ সামনে শূন্যের দিকে।

আমি আরো কয়েক বার খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করলাম। ও কোনো জবাব দিলো না। শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরলো মাঝরাতে। উপরে নিজের ঘরে না গিয়ে নিচের একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

কাপড় পরে নিচে নেমে এলাম আমি। দরজায় কান লাগিয়ে শুনলাম, পায়চারি

করছে ও। আর বিড় বিড় ক'রে বলছে কী যেন। একটা শব্দই আমি তার বুঝতে পারলাম—*ক্যাথরিন*। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনলাম ওর বিলাপ, পায়চারির শব্দ। তারপর আস্তে দরজা খুললাম। ও টের পেলো।

'এসো, নেলি। সকাল হয়েছে?'

'প্রায়। চারটে বাজে। বাতি জ্বেলে আনি, ওপরে চলে যেতে—'

'না, ওপরে যাবো না আমি,' বাধা দিয়ে ও বললো। 'এখানেই আগুন জ্বেলে দাও।'

পায়চারি ক'রে চললো হীথক্লিফ।

'বিশ্রাম দরকার তোমার,' আগুন জ্বালানোর পর আমি বললাম। 'আর দরকার খাওয়া। দুর্বল হয়ে পড়ছো তুমি।'

'কী করবো?—খাবার নামে না আমার গলা দিয়ে, শুতে পারি না!'

'এভাবে চললে মারা যাবে তো তুমি।'

বাড়ির আর সবার জেগে ওঠার শব্দ পেয়ে ও চলে গেল নিজের ঘরে। আমি একটু স্বস্তি বোধ ক'রে কাজে মন দিলাম।

বিকেলে আবার এলো ও রান্নাঘরে। অনেক ক'রে বললাম কিছু অন্তত মুখে দিতে। ও কানে তুললো না আমার কথা। একটু পরেই আবার গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। তার পর থেকেই শুরু হলো বিড় বিড় বিলাপ ধ্বনি আর মৃদু আর্তনাদ, যেন অসাধারণ সহ্যশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষ অসম্ভব কষ্ট সহ্য করছে। ব্যাপার কী জানার জন্যে হেয়ারটন ঢুকতে চাইলো ওর ঘরে, কিন্তু দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। চিৎকার ক'রে বললো দরজা খুলতে। পাল্টা চিৎকার ক'রে ওকে চলে যেতে বললো হীথক্লিফ। তারপর আবার শুরু হলো বিলাপ, আর্তনাদ।

এমনি চললো সারারাত এবং পরদিন সকালে বেশ বেলা হওয়া পর্যন্ত। তারপর সব চুপচাপ। সারাদিনে ঘর থেকে বেরুলো না ও।

সেদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামলো মুষলধারে। সারারাত চললো তা এবং পরদিন সকালেও চলতে লাগলো। সকালে বৃষ্টির ভেতরেই আমি বেরিয়েছি বাড়ির চারপাশে একটা চক্কর দিতে। হঠাৎ খেয়াল করলাম হীথক্লিফের ঘরের জানালাটা খোলা, বৃষ্টির ছাঁট ঢুকছে সেখান দিয়ে।

নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই ও, ভাবলাম আমি। জানালাটা বিছানার পাশেই। যেভাবে পানি ঢুকছে তাতে ঘুমোতে পারার কথা নয়। হয় বসে আছে চুপচাপ নয় তো বাইরে গেছে। জানালাটা বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্যে ওপরে উঠে ওর ঘরের দরজায় দাঁড়ালাম। ভেতর থেকে তালা মারা তখনো দরজাটা। অন্য একটা চাবি এনে দরজা খুলে ঢুকলাম আমি।

ঘরেই আছে হীথক্লিফ। খোলা জানালাটার নিচে বিছানায় শুয়ে। ওর মুখ, গলা, বিছানার চাদর ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ধারায়। এগিয়ে গেলাম আমি পায়ে পায়ে। চোখ

খুলে শুয়ে আছে ও। চোখাচোখি হলো আমার সাথে। কোনো ভাব ফুটলো না ওর মুখে, শরীরটা একটু নড়লোও না।

হীথক্লিফ মারা গেছে আমি ভাবতে পারলাম না। জানালা বন্ধ ক'রে ওর মাথায় হাত রাখলাম আলতো ক'রে। শীতল স্পর্শে শিউরে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। খোলা চোখজোড়া বন্ধ ক'রে দেয়ার চেষ্টা করলাম হাত দিয়ে। কিন্তু যেমন ছিলো তেমনি রইলো চোখ দুটো, বন্ধ হলো না। হঠাৎ ক'রে অপার্থিব এক আতঙ্ক ভর করলো আমার ওপর। চিৎকার ক'রে ডাকলাম জোসেফকে। জোসেফ এলো সঙ্গে সঙ্গে। এক পলক দেখেই সে বুঝে নিলো ব্যাপারটা।

'শয়তান তাহলে নিয়ে গেছে ওর আত্মা!' বিদ্রূপ করলো জোসেফ। 'দেখ কেমন বিকটভাবে তাকিয়ে আছে, যেন ভেংচি কাটছে মৃত্যুকে।'

ডাক্তার কেনেথকে ডাকা হলো। কিন্তু তিনি বলতে পারলেন না ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে হীথক্লিফের। সাত দিনেরও বেশি ও কিছু যে খায়নি কথাটা গোপন রাখলাম আমি। ভাবলাম কথাটা জানাজানি হলে হয় তো ঝামেলা হবে।

ওর ইচ্ছা মতোই ওকে কবর দেয়া হলো ক্যাথরিন লিনটনের পাশে।

আমার মনে হয় ও শান্তিতেই আছে। কিন্তু গ্রামের লোকদের যদি জিজ্ঞেস করেন দেখবেন শপথ ক'রে বলবে সবাই, ও মুরের ভেতর হেঁটে বেড়ায় সন্ধ্যার পর। যত্ত সব গাঁজাখুরি গল্প।

সামনের নববর্ষে হেয়ারটন আর ক্যাথির বিয়ে হবে। তারপর ওরা উঠে যাবে গ্র্যাঞ্জে। আমিও যাবো ওদের সঙ্গে। ওয়াদারিং হাইটসের দেখাশোনা করবে জোসেফ।

এলেন ডীনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্র্যাঞ্জের পথে রওনা হলাম আমি। গির্জার কাছে পৌঁছে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম গোরস্থানের দিকে। গোরস্থান যেখানে শেষ হয়ে মুর এলাকা শুরু হয়েছে সেখানে প্রাচীরের প্রায় সঙ্গেই পাশাপাশি তিনটে সমাধি প্রস্তর খাড়া। মাঝখানেরটা ধূসর, প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ঘাসে। ডান পাশেরটা এডগার লিনটনের। গোড়ার দিকে কিছু দূর পর্যন্ত ঘাস উঠেছে ওটার। আর হীথক্লিফেরটা এখনো ঘাসশূন্য। কিন্তু তিনটেই কেমন নিথর, নিস্পন্দ! ঐ শান্ত পাথরের নিচে শুয়ে ওরা কেমন অশান্ত ঘুম ঘুমাচ্ছে কেউ কল্পনা করতে পারবে?

***